লাহা মেডিকেল কলেজে কোর্থ ইয়ারে পড়ে, স্ত্রীর অসুখের সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছে। শরৎ বিশেষ যত্ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিল। সে এখনও ব্যবসাদার হইয়া দাঁড়ায় নাই ; শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মানব-স্বভাব-সূচক কোমলতা তাহার হৃদয়ে এখন প্রবল। শিবানী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিপন্ন রোগীর সেবা করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরী প্রথমে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে চাহিলেও শেষটা আর তাহা পারিলেন না। রোগী জীবন-মৃত্যুর মহাসমরে শেষে জয়লাভ করিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে যে গৃহে স্থান দিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি শরতের কাছে শুনিলেন, তাঁহাদের রোগী প্রলাপের মধ্যে যেরূপ বড় বড় ইংরাজি কথা বলিতেছে, তাহাতে সে নিঃসন্দেহ বি এ, এম এ ক্লাশের ছাত্র। এবং সে যে অসামান্য ঘরের সন্তান, তাহার প্রমাণ, তাহার অঙ্গুলিস্থিত একটি অঙ্গুরী !

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিবসের শেষ আলোকটুকু শ্রান্ত ভাবে মিলাইয়া পড়িলে, রোগী তাহার রোগশয্যা ছাড়িয়া বাহিরের অঙ্গনে শিবানী-দত্ত পিঁড়ির উপর বসিয়াছিল। শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল রোগীর রক্তহীন পাণ্ডু মুখকে পাণ্ডুরতর করিয়া তুলিয়াছিল। মৃদু বাতাসে নিমগাছের শাখা অল্প অল্প দুলিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী পায়ের কাপড় একটু গুটাইয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আজ কেমন আছ, গা ?"

"ভাল আছি" বলিয়া অতিথি তাঁহার দিকে চাহিল। সিদ্ধেশ্বরী সাবধানে সেইখানে বসিলেন, একটু থামিয়া ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভাল হয়েছ, তাই ভাল, বাছা। যে দায়ে

ফেলেছিলে—ভয়ে আর বাঁচিনে! বলি, কোথা থেকে আমার এ গেরো জুটলো! যদি কিছু ভাল-মন্দ হয়, তা হলে আমি কার সাহায্য নিয়ে কি করবো! যাহোক গে, টাকার ঘণ্ট করে, গতরের শ্রাদ্ধ করে এখন যে তোমায় বাঁচিয়ে তুলেছি, তাই আমার ভাগ্যি। তা তোমার বাড়ি কোথা গা! একলা এমন করে পথে পথে ঘুরছিলে কেন? তোমার কে আছে?"

অতিথি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, "আমার? কে আর আছে? আমি পশ্চিম বেড়াতে এসেছিলুম।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "আহা!" শব্দটা সহানুভূতির, কিন্তু স্বরটা আগ্রহের! একটা বড় লোককে যে হাতের মুঠায় রাখিতে পারিবেন ইহাই গৌরবের বিষয়। "তা বলে কি এমন টো টো করে ফিরতে হয়! তোমরা ব্রাহ্মণ তো বটে! তা তোমার নামটী কি?"

অতিথি একটু ভাবিয়া বলিল, "আমার নাম নীরদকুমার চৌধুরী"।

"চৌধুরী! তোমরা রাঢ়ী না বারেন্দ্র?"

"বারেন্দ্র!" শুনিয়া আনন্দে সিদ্ধেশ্বরীর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "তা বাছা, তুমি কেন আমার বাড়িতেই থাক না! আমারও ত আর ঐ একটি মেয়ে বই আর কেউ নেই। আর তুমি তো শিবুকেও দেখেছো, সে কিছু আর অপছন্দ করবার মত মেয়েও নয়। দেখলে ত, শুধু শুধু তোমার কি সেবাটাই না করলে! এমন লক্ষ্মী মেয়ে, বাছা, আর তুমি কোথাও পাবে না, তা আমি জাঁক করে বলতে পারি। বিদেশ-বিভুঁয়ে তিন পুরুষ আমরা দেশ-ছাড়া; কে খোঁজে, দেখে,

তাই একটি ঘর-জামাই চাইছি। নৈলে আমার মেয়ে এমন কিছু ফেল্না নয় যে, যাকে তাকে ধরে দিই। সেদিন পেসন্ন দিদি দেশ থেকে এসেছিল, সে বল্লে, চাঁদপাড়ার বাবুরা শিবুকে দেখে গিয়েছিল, তাদের ভারি সাধ, ওকে বউ করে, আমি বাপু তাতে রাজি হলাম না। বাপরে! আমার ঐ একটি মেয়ে, ওখানে হলে ত আমি তাকে আর দেখতে পাবো না, কাজ নেই আমার অমন রাজ্যিভোগে।" শুনিয়া নীরদকুমার হাঁ না ভাল-মন্দ কিছুই বলিল না।

পরদিন সিদ্ধেশ্বরী পুষ্পহীন সাজি হস্তে, নামাবলি গায় মাথায় জড়াইয়া, অনুচ্চ কণ্ঠে "জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর, কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর" শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিলেন, "শিবি, সাজিটা নে। বেগুন ফুলের ভাজের ব্যারাম হয়েছে, আমি একবার তাকে দেখে আসি।"

সিদ্ধেশ্বরী বাহির হইবার পূর্ব্বে নীরদকুমার রোয়াকের উপর হইতে নামিয়া আসিল, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, "মা আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে ইচ্ছে করি না। আজ আমায় আপনারা বিদায় দিন।" একটু কুণ্ঠিতভাবে আংটিটা দিয়া বলিলেন, "এটা পূর্ব্বে বহুমূল্য ছিল, এখনও এর বোধ হয়, কিছু মূল্য আছে। এটা বিক্রি করে ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধ-পত্রের দাম চুকিয়ে দেবেন।"

সিদ্ধেশ্বরী আংটিটার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাহার মূল্য-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দিহান হইলেন না। তিনি এই গৃহহীন যুবককে পূর্ব্ব হইতে কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলেন।

এমন সস্তা দরে এমন জিনিষ খরিদ করিবার সুযোগ দুইবার মিলে না। মনটা চটিয়া উঠিল, মুখভার করিয়া বলিলেন, "আমরা কি বাছা, তোমার আংটির লোভেই এতটা সেবা-যত্ন করলাম? না হয়, শ দুই টাকাই আমার গেল, তাতে আমার ক্ষতি হবে না, হরি হে, তোমারই ইচ্ছা! এ কলিকাল কি না, হাজার কর, কেউ বোঝে না"!

নীরদ ব্যস্ত হইয়া বলিল "সে কি আপনারা আমার জন্য কেন এত খরচ করবেন! আমি আপনাদের কে?"

"তাই ত, বলছি বাছা, আপনার কেন হও না? শিবু ত তোমার অযুগ্যি নয়।"

নীরদের পাণ্ডুমুখ হঠাৎ লাল উঠিল। সে রাগ করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইয়া উঠিল না। এই সময় শিবানী মিক্সচারের শিশি ও একটা রেকাবে করিয়া চারিটি ভিজা ছোলা এবং নুন ও আদার কুচি আনিয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছোট একটা পাথর বাটিতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া তাহার অচঞ্চল চোখের দুইটি কালো তারা তাহার মুখে স্থাপিত করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এটা খেয়ে নিন।" নীরদকুমার একটু অপ্রতিভভাবে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল,—সে মুখখানা সকল সময়ই এক-রকম, পাথরের খোদাই করা মুখের মত, তাহাতে কোন কালেই যেন বড় একটা ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। নীরদকুমারের ঔষধ খাওয়া হইলে পাত্র হস্তে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নীরদকুমার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। প্রকাশ্যে সিদ্ধেশ্বরীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমি ও বেলা আপনাকে ঠিক করে বলব।"

সেদিন নীরদের সমস্ত দিনটা অস্থিরভাবে কাটিল। তাহার নিকট শিবানী লোভনীয়া নহে! এ বিবাহ তাহার পক্ষে সুখের নহে, বরং বিশেষ করিয়াই দুঃখের! সর্ব্বনাশ! যে ভয়ে সে সর্ব্বস্বান্ত হইল, সব খোয়াইল, এখানেও সেই কথা! কিন্তু সে এখন একটা ঘরের মধ্যে আশ্রয়ের ভিতর দুইটা স্নেহ-হস্তের সেবায় নিজেকে একান্তভাবে ছাড়িয়া দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, দুর্ব্বল কৃশ শরীর ও বেদনাহত চিত্ত কিছুতে যেন আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না! এমন সময় এ অযাচিত করুণা এই একান্ত-স্নেহশীলা সেবাপরায়ণা রমণীর ত্রুটিহীন শুশ্রূষা এইটুকুরই লোভ তাঁহার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেটা কিছু বেশী কথা নয়! অতি সামান্য বস্তু! আসল কথাটা কয়দিন হইতেই সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে ক্রমশ যেন একটু ভীত হইয়া পড়িতেছিল, এবং সেইজন্যই সে এখানকার আশ্রয় শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক! সে সন্দেহটা এই যে, শিবানী তাহাকে ভালবাসে। নীরদ রোগমুক্তির পর হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিদিনকার প্রত্যেক চালচলনটাকে তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছে এবং তাহার সন্দেহটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সেদিনও বিশেষ করিয়া তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া সে স্পষ্ট বুঝিল যে, শিবানী তাহাকে ভালবাসে! দয়া? সে কি কেবল দয়া! শুধু দয়া নয়, ভালবাসা, এটুকু বুঝিবার ক্ষমতা নাই, এমন অজ্ঞ সংসারে কয়জন আছে? জীবনদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতামিশ্রিত করুণায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনাকে বিকাইয়া দিতে সে কুণ্ঠিত হইল না।

অপরাহ্ণে নদীর ঘাটে সিদ্ধেশ্বরীর মিতিন মকর ও দিদি জানিলেন, অগ্রহায়ণ মাসে শিবানীর বিবাহ।

মানুষ পদে পদে ভুল করে, পদে পদে ঠকে। সিদ্ধেশ্বরীও ভারি ঠকিয়াছিলেন! তিনি আশা করিয়াছিলেন, অন্তত বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেও প্রকাশ পাইবে, যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জামাতা কোন রাজা বা জমীদার, অন্তত কোন বড় লোক! লোক-জন হাতি-ঘোড়া বাজি-বাজনায় বিবাহ-রাত্রে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিবে। মন্ত্রী আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নবদম্পতীর সম্মুখে সোনার থালায় হীরার বালা গজমতির মালা ও পট্টবসন স্থাপন করিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইবে, এবং পরদিন বাসরের সমস্ত রমণীরা ঈর্ষা-কলুষিত চক্ষে দেখিবে শিবানীর দেহ হীরা-মুক্তা ও পাকা সোনার ভারে হেলিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু যথাসময়ে বিনা বাধায় বিনা বিঘ্নে যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজপুত্রের তত্ত্ব লইতে রাজবাড়ি হইতে একটা কাকপক্ষীও আসিল না। সিদ্ধেশ্বরীর বুকখানা আধহাত বসিয়া গেল। সই মিতিনের কাছে যে সমস্ত ভবিষ্যৎ দর্শনের পরিচয় দিয়া মনে মনে তিনি কতখানি গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইল! জামাতা যে তাঁহাকে অন্যায়ভাবে অত্যন্ত ঠকাইয়াছে, সে বিষয়ে বিনা তর্কেই তাঁহার চিত্ত দ্বিধাশূন্য হইয়া গেল এবং তাহার উপর একটা অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হইল।

শিবানীর বিবাহ হইয়া গেল। হাতে হীরার বালা উঠিল না, গলায় মুক্তার মালা দুলিল না, একখানা পাটের

গাড়িও জুটিল না, অথচ বিবাহ হইয়া গেল। তবু শিবানী যেমন সুখী হইল, তেমন কোন মেয়েই, বোধ হয়, হয় না। তাহার নিভৃত হৃদয়ের পূজা, ঐকান্তিক স্নেহমিশ্রিত অক্লান্ত সেবা যে দেবতার চরণে পৌঁছাইতে পারিয়াছে, ইহাই কি তাহার অল্প লাভ!

কিন্তু সবশুদ্ধ জড়াইয়া বিবাহটা সুখের হইল না। সিদ্ধেশ্বরী যখন দেখিলেন, জামাতাবাবাজী রাজা নহেন, জমিদারও নহেন, নেহাৎ চালচুলা-হীন একটা লক্ষ্মীছাড়া পথিকমাত্র, এবং সে তাঁহারই ঘরে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিল, তখন রাগে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার উপর বসিয়া বসিয়া শাশুড়ির অন্ন ধ্বংশ করিতে লজ্জা বোধ হয় না! কেমনই বা বিদ্বান? সেদিন যখন মিত্তিনের কাছে শুনিয়া আসিয়া গোপাললাল ব্রজবাসীর খাতা লেখা চাকরীর কথাটা বলিলেন, তখন নবাব-পুত্রের মত জামাই অহঙ্কারে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, যেন তাঁহার মত দরের লোকের এমন তুচ্ছ কথা কানে তোলাও অপমান!

সেদিন ক্রোধ সম্বরণে অশক্ত হইয়া সিদ্ধেশ্বরী নদীর ঘাটে ও পাড়ার প্রতি বাড়িতে প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি একটা জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া কন্যা শিবানীকে একেবারে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছেন। জামাই লোকটি মোটেই ভাল নয়।

সেদিন দুদশ কথা বেশ মিষ্ট রকম শুনিয়া নীরদেরও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার রাগ করিবার পূর্ব্বেই শিবানী আসিয়া দুইটা বালা-পরা কোমল হস্তে তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া ধীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এমন ভাবে তাহার মুখের পানে

চাহিল যে, নীরদকুমার একবার তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, রাগ করিতে পারিল না। কেহ কোন কথা কহিল না, কিন্তু পরস্পরের সেই নীরব ভাষায় যে একটা ভাবের সুর, একটা প্রচ্ছন্ন হৃদয়ের ভাষা নিহিত ছিল, তাহার মধ্যে কথার কোন প্রয়োজন ছিল না। নীরদ কুমারও সে নীরব ভাষা সে করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, তাই অনেক সহ্য করিতে হইত। যখন অপমানের আগুন মাথায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তখন সেই দুইটি নীরব ভাষাপূর্ণ চোখের স্থির দৃষ্টি মুহূর্ত্তে সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিত।

নীরদ কিছুতে বুঝিতে পারিত না, যে এই অশিক্ষিতা সামান্য মেয়েটার মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে তাহাকে এমন শক্তি হীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া বেশী দিন চলিল না। শ্বশ্রুর সুধাবর্ষী রসনার সুমধুর রসাস্বাদনে ক্লান্ত নীরদ গৃহবাস যতই হ্রস্ব করিয়া তুলিল, তাঁহার জিহ্বার বিষ ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, সে জ্বালা আর শিবানীর বাক্যহীন মৌন আবেদনের করুণতায় জুড়াইবার উপায় রহিল না।

শিবানীর কৃতজ্ঞতা, অপমানের পাথরে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

শেষে একদিন যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু নীরদকুমার যে সুরথবাবুর লাইব্রেরিতে একজামিনের জন্য রাত জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিত, সে সংবাদটা তাহার মৃত্যুর পর সুরথের মুখেই প্রথম শুনিতে পাওয়া গেল।

কলিকাতায় প্লেগ বাড়িয়া উঠায় রজনীনাথ পরিবারবর্গকে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রজনীনাথের স্ত্রী বসুমতী প্রথমতঃ এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অবশেষে অনেক যুক্তিতর্ক ও বাদানুবাদের পর স্বামীর মতই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল, কারণ সুপ্রকাশ ও শান্তির সম্বন্ধে রজনীনাথ বিশেষ করিয়াই ভয় প্রদর্শন করিলেন। যখন যাওয়াই স্থির হইল, তখন বসুমতী বলিলেন, "যদি যেতেই হয়, তবে কোন তীর্থস্থানেই যাওয়া ভাল। দার্জ্জিলিং কারসিয়ঙ্গে আমার মন টেঁকে না। না আপনার লোক একটা আছে, না আছে ঠাকুর-দেবতা! ও সব জায়গায় আমি কিন্তু যাব না, তা বলে রাখচি।"

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া অনেক প্রসিদ্ধ স্থান প্রত্যাখ্যান করিয়া শেষে পুরী যাওয়াই বসুমতী স্থির করিলেন! এই উপলক্ষে তবু একবার জগন্নাথ দর্শনও হইয়া যাইবে, অনেক দিন হইতেই যাইবার ইচ্ছা! স্থানটিও স্বাস্থ্যকর, বিশেষ এখন রথযাত্রারও বিলম্ব আছে! রজনীনাথ সম্মত হইলেন।

প্রথম কয়দিন নূতন জায়গায় গিয়া দেবদর্শন ও প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বসুমতী অনেকটা অন্যমনস্ক হইলেন। সকালে সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে ভ্রমণ, মধ্যাহ্নে গৃহে পুত্র কন্যা লইয়া গল্প-স্বল্পে দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন ভ্রাতৃজামাতা মাদুরাপ্রবাসী যোগেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া দুইদিনের ছুটী লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত

হইল, বলিল, "এখানে একলা না থেকে মাদুরায় চলুন! জায়গা ভাল, আর আমরাও রয়েছি।"

বসুমতী প্রথমে 'জামাইবাড়ি' যাইতে কিছুতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু নাছোড়-বন্দা যোগেন্দ্রকে আঁটিবার জো নাই। সে শেষকালে পা দুইটা চাপিয়া শিশুর মত আবদার ধরিয়া বসিল, "যতক্ষণ না,"যাবো" বলবেন, ততক্ষণ আমি পা ছাড়ব না।" অগত্যা ব্যস্তচিত্তে বসুমতী বলিলেন, "যাব।"

যোগেন্দ্র বসুমতীর পায়ের কাছে দীর্ঘভাবে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল এবং বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া হতবুদ্ধি শান্তিকে ডাকিয়া আদেশ করিল,"নতুন গিন্নী! শিগ্‌গির শিগ্‌গির সব গুছিয়ে টুছিয়ে নাও, দাঁড়িয়ে থাকলে চলচে না, সতীনের বাড়ী যেতে হবে।"

শান্তি লজ্জায় লাল হইয়া পলাইয়া গেল। সমস্ত দিন সে যোগেন্দ্রর সম্মুখে আসিল না। অবশেষে যোগেন্দ্র আবার 'ঘাট' মানিয়া তোষামোদের সমস্ত মুখস্থ বুলিগুলি বলিয়া অনেক কষ্টে তাহার রাগ থামাইল এবং মাদুরায় গিয়া প্রতি সন্ধ্যায় সে যে তাহাদের একটি করিয়া ডিটেক্‌টিভ বা ভূতের গল্প বলিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহাও সেই সময়ে চুক্তি হইয়া গেল। রজনীনাথ শুনিয়া লিখিলেন, "বেশ ত, যোগেন তোমাদের দেখবে শুনবে, আমিও কতক তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।"

মাদুরায় আসিয়া কিন্তু বসুমতীর একটুও ভাল লাগিল না। ঠাকুর দেবতা এখানেও আছেন বটে, কিন্তু সে সর্ব্ব-সন্তাপহরা আনন্দময়ের আনন্দরূপ ত এখানে নাই, সমুদ্রই যে সেখানে তাঁহার সঙ্গী ছিল। জামাতা শুনিয়া কিন্তু অভিমান করিতে

প্রকাশক
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়
ভূদেব ভবন, চুঁচুড়া।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

লাগিল, "তা নই কি! পিসিমা আমাদের ভাল বাসেন না ত, কি করে ভাল লাগবে!

ফাঁপরে পড়িয়া পিসিমা আবার সামলাইয়া লইলেন, "না, না, তা কি বলচি, তবে সেখানটিও বেশ, তাই বলছিলুম। তোমাদের এখানে ভাল লাগে বই কি।"

হাসিয়া যোগেন্দ্র বলিল, "তাই বলুন!"

সেদিন যোগেন্দ্র ও সুকু যোগেন্দ্রর এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিল। শান্তি যোগেন্দ্রর পুত্র অনিলকে লইয়া তাহার বাগানে বেড়াইতেছিল, এমন সময় অদূরস্থ বনবীথির অন্তরালে সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া গেল।

শান্তির ইচ্ছা, অনিলকে গোটাকত ফুল তুলিয়া দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া সে বালকের এক পার্শ্বে কাষ্ঠাসনের উপর যে অর্দ্ধ পঠিত পুস্তকখানা মার দৃষ্টি এড়াইয়া আনিয়া রাখিয়াছে, যোগেন্দ্র ও সুকু ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, সেখানাকে শেষ করিয়া ফেলে। কারণ রাত্রে যোগেন্দ্র ইংরাজি ডিটেকটিভ গল্প আরম্ভ করিবে, আর বই শেষ করা ঘটিয়া উঠিবে না! অথচ আগ্রহ ও কৌতুহলে এতটুকু বিলম্ব সহিতেও সে প্রস্তুত নয়, কিন্তু অনিলের মতলব অন্যরূপ।

শান্তি একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল—সুকু না থাকিলে তাহার কিছুই ভাল লাগে না। সে ফুলের ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াও নূতন ফুলের জন্য আব্দার ধরিতে ছাড়িতেছিল না। একটা ফুল গাছের চারিদিকে প্রজাপতি উড়িতেছিল দেখিয়া, সে আব্দার ধরিল, "মাসিমা পেজাপতি দাও না।" হাসিয়া শান্তি ধমক দিল, "প্রজাপতি ধরলে বিয়ে হবে হবে না; এই নে, কেমন ফুল দেখ"

দেখি।” অনিল সমস্ত ফুল চারিদিকে ছড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, “আমায় পেজাপতি দিতে হবে।” এমন সময় সহসা উদ্যানে গাড়ির শব্দ শুনিয়া শান্তি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—যে টমটমখানা কয়দিনই সকালে সন্ধ্যায় এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে একবার করিয়া এ বাড়ির দ্বারের নিকট থামিয়া যোগেন্দ্রনাথকে অফিসে লইয়া ও অফিসের ফেরত বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া যায়, সেইখানা তাহার সেই একমাত্র আরোহীকে লইয়া আজ উদ্যান-পথে অগ্রসর হইতেছে। শান্তি অনিলের হাত ছাড়িয়া একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। অনিল ততক্ষণে ছুটিল এবং আগন্তুক গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “তুমি কদিন আসনি, কেন, কাকাবাবু?”

আগন্তুক তাহাকে কোলে লইয়া তাহার কোমল গণ্ডে চুম্বন করিলেন। প্রকৃতির অঙ্গে বৃষ্টি যেমন বর্ষণ-চিহ্ন রাখিয়া যায়, সদ্য ক্রন্দন তেমনই তাহার গণ্ডে অশ্রুচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। আগন্তুক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া শিশুর মুখ মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেঁদেছ কেন?” অনিলের পূর্ব্বশোক আবার উথলিয়া উঠিল, সে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া চোখে জল আনিয়া নালিস রুজু করিল, “আমায় পেজাপতি দিলে না!”

“এইজন্য! আচ্ছা আমি তোমায় একটা প্রজাপতির ছবি দেবো’খন।” বলিতে বলিতে আগন্তুক অদূরবর্ত্তিনী শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অনবগুণ্ঠিতা কিশোরী তাঁহার প্রতি কৌতুকপূর্ণ সহাস্য চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে। দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি ত যোগেন্দ্রর বাড়ি সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন,—

এই অল্পদিনের মধ্যেই দুইবার গৃহকর্ত্রী বদল হইল। অনিলের মার মৃত্যুর পর অনিলের পিতা বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়-বার বধূ আনিয়াছেন,—সেও কয় মাসের কথা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নববধূ, তাঁহার চোখে পড়ে নাই—ইনিই কি সেই নববধূ? খোলা মাথায় এমন অপ্রতিভভাবে একজন অজানা পুরুষের সাক্ষাতে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব করিলেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তিনি শুনিয়াছিলেন বটে; যে, যোগেন্দ্রর শ্বাশুড়ি ও তাঁহার ছেলে মেয়েরা কয়দিন হইল, যোগেন্দ্রর বাসায় আসিয়াছেন, এবং সেই কথা শুনিয়াই তিনি এখানে সন্ধ্যায় আসা বন্ধ করিয়াছিলেন, এ মেয়েটি তাঁহাদের কেহ হইতে পারে ত!

অনিল শান্তির কাছে আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা।" আগন্তুক তখন বুঝিলেন, সে অনিলের বিমাতা নয়; তবু তাহার বিস্ময় ঘুচিল না। তিনি জানেন, এই বয়সে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া, গালের মধ্যে পান-দোক্তা ভরিয়া, রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইলেই বাঙ্গালীর মেয়েকে সব চেয়ে বেশি মানায়! বড় বেশী স্বাধীন হইল ত, না হয় সখী-সঙ্গিনী লইয়া রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে বসিয়া তাস খেলুক, বা টপ্পা গান করুক! অথবা বি, এ ক্লাশের স্বামীকে দীর্ঘ পত্রও লিখিতে পারে! সে যে বাগানে ফুলের রাশি অঞ্চলে লইয়া খোলা মাথায় একজন অপরিচিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন সলজ্জ সুন্দর ভঙ্গীতে লক্ষ্মী প্রতিমার মত দাঁড়াইতে পারে, এ ধারণাই তাঁহার ছিল না। মনে মনে তিনি চমৎকৃত হইলেন।

অনিল মাসিমার নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া রাগিয়া মাটিতে

আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, শান্তি ব্যস্তভাবে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, "তোমার মার কাছে চল।" বলিয়া অনিলের হাত ধরিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। আগন্তুক ভাবিলেন, এই মেয়েটি যখন তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিল না, তখন তাহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করা তাঁহারও পক্ষে ভাল দেখাইবে না, বোধ হয়! তাই একটু সসঙ্কোচে তাহার দিকে ফিরিয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি যোগেনের স্ত্রীর বোন ?"

শান্তি জানিত না যে, তাহার মত কিশোরী কুমারীর পক্ষে এ অবস্থায় লজ্জাতিশয্যে ছুটিয়া পলানই নীতিসঙ্গত, তাই সে একটু কুণ্ঠিত অনিচ্ছুকভাবে দাঁড়াইয়াছিল। "হাঁ" বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। আগন্তুক ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে একটু ভাবিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "আপনারা কি এখন মাদুরায় কিছুদিন থাকবেন ?" শান্তিকে দেখিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার কি একটা কথা মনে পড়িতেছিল। গমনোদ্যতা শান্তি দাঁড়াইয়া বলিল, "তা ত বলতে পারি না, বোধ হয়, থাকা হবে। কলকেতায় এখন খুব প্লেগ হচ্চে কিনা, বাবা তাই এখন আমাদের নিয়ে যাবেন না, তিনি সেখানেই আছেন।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনের দুঃখটা হঠাৎ সে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। আগন্তুক দেখিলেন, বালিকার চোখদুইটি ছল ছল করিতেছে। সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ছোট ছেলেদের জন্যই প্লেগে ভয় বেশি কি না, তাঁর জন্য কিছু ভয় নাই। আপনাদের বাড়ি বুঝি কলকাতায় ? আপনার বাবা বুঝি সেখানে চাকরি করেন, তাই আসতে পারেন নি ?"

"বাবা ত চাকরি করেন না, তিনি উকিল, ইচ্ছা করলেই

আসতে পারতেন, তা এলেন না। বাবাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারি না, বড্ড কষ্ট হয়।”

“উকিল! তাঁর নাম কি?”

“শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ মৈত্র।”

“কি, কি বল্লেন?”

শান্তি নব-পরিচিতের এই অদ্ভুত আগ্রহের স্বরে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া বলিল, “শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র।”

আগন্তুক একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আপনি রজনী বাবুর মেয়ে! কোন্ রজনী বাবু—হাইকোর্টের উকিল যিনি?”

শান্তির মনে ভারি কৌতূহল জন্মিল, আনন্দও হইল। সে সবিস্ময়ে নেত্রদ্বয় বিস্তারিত করিয়া প্রশ্ন করিল,“আপনি বাবাকে চেনেন, না কি? আপনার বাড়িও বুঝি কলকাতায়?”

“হাঁ, না, তা নয়, চিনি, নাম শুনেছি মাত্র, তেমন কিছু চিনি না।” আগন্তুক একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন, “রজনী বাবুর বড় মেয়ে বুঝি যোগেনের স্ত্রী?”

শান্তির কর্ণমূল লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে আঁচলখানা মুখের কাছ অবধি তুলিয়া কি ভাবিয়া লজ্জিত ভাবটা সামলাইয়া লইল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল, “আমিই তাঁর বড় মেয়ে! যোগেন বাবুর স্ত্রী আমার মামাতো বোন! আমার শুধু একটি ভাই আছে, বোন নেই।” বলিয়া সে অনিলের হাত ধরিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। আগন্তুকও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

১০

বৈশাখী পূর্ণিমায়, মাদুরার বসন্তমণ্ডপ মন্দিরে খুব উৎসব হয়। সেদিন মাদুরায় বড় ধুম। সুন্দরলিঙ্গ মহাদেবের বসন্তোৎসবের আজ শেষ দিন, সেই জন্য ভিড়ও অতিরিক্ত হইয়াছিল। মণ্ডপমধ্যে পয়ঃপ্রণালীগুলি গন্ধবারিতে পরিপূর্ণ। প্রস্তরস্তম্ভে তিরুমল ও তৎপূর্ব্ব নয় পুরুষের সস্ত্রীক খোদিত মূর্ত্তির উপর সুন্দর আকারে গ্রথিত পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান, দেবালয়ের প্রসিদ্ধ মহামূল্য আসবাবপত্র সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে বসন্ত-মণ্ডপ কয়দিন অমরাবতীর শোভা ধরিয়াছে। কয়দিন শান্তির মাতা বসুমতীর অম্বলের ব্যথা ধরায় তাঁহারা বসন্ত-উৎসব দেখিতে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ এমন উৎসব দেখিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া, একটু সারিতে না সারিতেই, তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে শিবতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া দেব-দর্শনে যাইতে হয়। পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া যোগেন্দ্রর স্ত্রী মণিমালা এবং শান্তি দুইজনে ধরিয়া বসিল, তাহারা এইখানে স্নান করিবে। দেখাদেখি অনিলও আব্দার ধরিল। যোগেন্দ্রনাথ সকলকে এক-একটা ধমক দিলেন, "এমন করে যদি জ্বালাতন কর, তা হলে এইখান থেকেই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব, বলে রাখছি। দেখুন দেখি, পিসিমা, এদের অন্যায় আব্দার!"

পিসিমা মৃদু হাসিয়া ভ্রাতৃজামাতার অভিযোগের বিরুদ্ধে কেবল-মাত্র বলিলেন, "ওরা পাগল! ওদের কথা শোন কেন!"

মীনাক্ষিদেবী-দর্শন ও সুন্দরলিঙ্গের উৎসব-সমারোহ দর্শনান্তর

পূজাদি সারিয়া ললাটে শ্বেত চন্দন ও বিভূতি চিহ্ন ধারণ করিয়া অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যোগেন্দ্র যখন মেয়েদের ফাঁকা জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইতে পারিল, তখন সহসা মৈত্রগৃহিণীর বুকের বেদনাটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে এতটুকু শক্তি থাকিতে পুণ্যের লোভ দমন করিতে পারে না, তাই তিনি সে যন্ত্রণাটা চাপিয়া সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ দেখিতে চলিলেন।

আর্য্য নায়কের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপের এখনও নয়শত সাতানব্বইটি স্তম্ভ প্রায় অক্ষত আছে। ইহার নির্ম্মাণকৌশল চিত্রচাতুর্য্য অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সুমহান কীর্ত্তিরাজি এখনও তাহার বিগত গরিমার সাক্ষ্য দিতেছে।

তেপ্পমকুলম্ বা টেপ্পা ট্যাঙ্ক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, ইহার প্রত্যেক দিক বারশত গজ লম্বা—চারিদিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব্বোপরি গ্রেনাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত এক কলস। স্থানে স্থানে দেব ঘোটক, ময়ুর এবং অন্যান্য পশুমূর্ত্তি সুশোভিত। কলসের মধ্য-দিকে বেড়াইবার জন্য একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় সন্ধ্যাকালে অনেকে বায়ু সেবন করিয়া বেড়ায়। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি উপদ্বীপ আছে, সেই উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো, ইহার মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারিদিকে কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-মন্দির। মধ্যস্থলে পথ এবং পথের দুই ধার নানা-বর্ণের লতাগুল্ম পত্র-পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। কয়দিন পূর্ব্বে দেবালয়ের চারিদিক এক লক্ষ বাতি দ্বারা সাজান হইয়াছিল এবং যেদিন মীনাক্ষিদেবীর সহিত সুন্দর লিঙ্গ মহাদেব এখানে আনীত হইয়া সন্ধ্যাকালে মহাসমারোহের সহিত তেপ্পনে চড়িয়া দ্বীপের

চারিদিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রর সহিত ছেলেমেয়েরা সেদিন উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল, বসুমতী অসুস্থতার জন্য আসিতে পারেন নাই।

মার্ব্বেল ও কষ্টি পাথরে মিলাইয়া গাঁথা প্রাচীরের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বসুমতী হঠাৎ বসিয়া প'ড়লেন। শান্তি তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটিয়া আসিল, "অসুখ করেছে বুঝি, মা? সুকু, সুকু, শিগগির যোগেন বাবুকে ডাক। বলাই, শিগগির গাড়ি আনতে বল।"

যোগেন্দ্রনাথ একটু দূরে দাঁড়াইয়া এক সহসাদৃষ্ট বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিল। পিসশাশুড়ির অসুখের সংবাদে ভারি ব্যস্ত হইয়া ছুটিবার উপক্রম করিল। বন্ধু তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিলেন, "শোন, শোন, তোমার পিসশাশুড়ির অসুখ, তা তাঁকে এ রোদে আবার এতটা পথ না নিয়ে গিয়ে এখন কেন আমার বাসাতেই নিয়ে চল না? তোমার বাড়ি ত আর এ মুল্লুকে নয়! গরমে অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তা মন্দ কথা কি, কিন্তু তিনি কি রাজি হবেন? আমার বাসাতেই বেশী দিন থাকতে সম্মত হন না! আচ্ছা, বলে দেখি কি বলেন।"

"তবে আমি গাড়িটা এখানে আনাই, তুমি একটু বুঝিয়ে বলগে।"

বসুমতী প্রথমে কিছুতে সম্মত হইলেন না। শান্তি জিদ করিতে লাগিল, "বিপদের সময় কারু কাছে সাহায্য নিতে অপমান নেই মা! বাবা বলেন, সকলকেই আপনার মত করে নিতে হয়! চল, আমরা ঐখানেই একটু জিরিয়ে নিই।"

কিন্তু ধনীর গৃহিণী বসুমতী নিজের মান-মর্য্যাদার প্রতি যথেষ্ট প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। জামাই-বাড়ি উঠিয়াই তিনি কতকটা ছোট হইয়া পড়িয়াছেন, ভাবিতেছিলেন, তাহার উপর আবার জামাতা যদি তাঁহাকে এমন করিয়া রামী শ্যামী পাঁচজনের বাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া ফিরে, তাহা হইলে ত, তাঁহার এখানে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। যোগেন্দ্র বন্ধুকে গিয়া বলিল, "না ভাই, তিনি সম্মত হলেন না। গাড়িটা এনেছে! ওরে বলাই, ওঁদের সঙ্গে করে এনে গাড়িতে তুলে দে। ওহে, ও বেলা একবার যেও না,—কেন বল দেখি পায়া এত ভারী হয়ে পড়েছে?"

"সেটা কেবল তোমার প্রতি করুণায়। ঘরে যে সব সঙ্গ পেয়েছ, তাদের ছেড়ে এসে আমার মুখখানাকে ঠিক পদ্মফুল বা আমার বাক্যগুলো চাঁদ থেকে খসে পড়া সুধার মত লাগবে, এমন ভরসা হয় না।"

"না, না, সত্যি তুমি যেও, জানত কুইনীন-খেকো ধাত, অত মিছরীর পানা বরদাস্ত হবে কেন? সময়-বিশেষে ত আবার সন্দেশ ফেলে নীমের ঝোলও মুখ-রোচক হয়।"

বন্ধু হাসিয়া কহিল, "উপমাগুলো দিলে ভাল! এর পরেও যদি না যাই, তাহলে আর কি বলে গাল দেবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছি না। যাই হোক, শেষে যেন গর্দ্দান না যায় দেখো।"

বলাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মার ব্যথাটা বড্ড বেড়ে উঠেছে, দিদি বল্‌লে একটু ঠাণ্ডা জল কোথাও থেকে আনিয়ে দিন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে তখন বাড়ি যাবেন।"

"দেখ দেখি অন্যায়! মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করবে, তবু নিজেদের জিদ্‌ ছাড়তে পারবে না।" যোগেন্দ্র ব্যস্তচিত্ত বলাইকে

লইয়া জলের সন্ধানে চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রর বন্ধু বসুমতীর দাসীকে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা তাঁহাকে বলাইলেন, "আমি সন্তান, আপনার! আমার বাড়িতে যদি মা একবার পায়ের ধূলা না দেন, তা হলে আমি বড়ই দুঃখিত হব।" ইহার পর বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; দেহও আর শ্রান্তি সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছিল না। কন্যা ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে তিনি বলিলেন, "চল, যাওয়াই যাক্! বিদেশে যখন বেরিয়েছি, তখন মানসম্ভ্রম আর রইল না!"

মোক্ষদা বলিল, "অ দিদিমণি দাঁড়াও, আগে জামাই বাবুকে ডেকে নে আসি। ওমা, ঐ গো, ঐ বাবুটি, ঐ যে নারকেল গাছগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে দেখতে পাচ্চো না, ছাতা মাথায় গরদের জামা গায় সুন্দর হেন লোকটি। চেহারা খানি যেন রাজার জামায়ের মত, দিব্যি, বাবু। আহা লেঙু-মেণ্ডুর জায়গায় দেশের লোক দেখলেও যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায়!"

মোক্ষদার নির্দ্দিষ্ট লোকটিকে দেখিয়া শান্তি ঈষৎ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, "ও মা, ও যে মিঃ রায়! সেদিন যোগেনবাবুকে ওঁরই কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, উনি বাবাকে জানেন।" বসুমতী বার বার অপরিচিতকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়িল না।

মিঃ রায়ের বাসাটি বেশ উচ্চ জমির উপর নির্জ্জন স্থানে। একটি সুরম্য ছোট বাগানের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গ্লা। বাড়িতে তিনি একা—অল্প কয়টি ঘরেই বেশ সঙ্কুলান হইয়া গিয়াছে। মাঝের ড্রইং রুমটি দিব্য পরিপাটিরূপে সাজান। দুই পাশে দুইটি ঘর, একটি শয়ন-গৃহ ও অন্যটি বসিবার

যাঁহার অতুলনীয় আদর্শ

সম্মুখে রাখিয়া,

স্নেহে শাসনে অটল, আদর্শ

পিতৃচরিত্র

অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছি,

আমার সেই পরমারাধ্য পূজনীয়

পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ

হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

ঘর রূপে ব্যবহৃত হইত। সব ঘরগুলিতেই গৃহস্বামীর সৌখীনত্ব ও স্বদেশ-অনুরাগের চিহ্ন বিদ্যমান। টেবিল-ক্লথ, পর্দা, বিছানা হইতে ফটোগ্রাফের ফ্রেম ও দোয়াত কলম নিবটি পর্য্যন্ত সমস্ত স্বদেশী। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন কোন জিনিষই তিনি বিদেশী ব্যবহার করেন না।

মিঃ রায়ের গৃহে আসিয়া কোন বিষয়েই তাঁহাদের সম্মান-আতিথ্যের ত্রুটি হইল না। স্বয়ং গৃহস্বামী নিজের হাতে আসন সরাইয়া বসুমতীর জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া বিশেষভাবেই সম্মান দেখাইতেছিলেন। আহারাদির ও বন্দোবস্ত হইল। রান্নাঘর ঠিক শুচি হইবে কিনা সন্দেহে বাহিরে মণিমালা ইটের উনানে সকলকার জন্য পাক করিল, কেবল মিঃ রায়ের পাচকের প্রস্তুত খাদ্য যোগেন্দ্র সুকু ও গৃহস্বামীই গ্রহণ করিলেন।

যোগেন্দ্র শান্তি ও মাণকেও তাহাদের দলে টানিতেছিল এবং অসমর্থ হওয়ায় বকাবকি আরম্ভ করিল। যোগেন্দ্রর বন্ধু আপত্তির কারণ বুঝিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিল, "কাজ কি যোগেন! জানত, আমরা খুব সদাচারী নই, মিথ্যে কেন কারো রুচির বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করতে চাও।"

দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় বসুমতীর সেই বেদনাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ মহা চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। নিকটে ডাক্তার পাওয়া যায় না। এখন উপায় কি? বন্ধুর কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি পড়া ছিল, সে বলিল, "বল ত দু-এক ডোজ হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখতে পারি।"

যোগেন্দ্র একটু ভাবিতে লাগিল, নেহাৎ জলটা দেওয়া পিসিমার সহিত ছেলেখেলা হইবে না?

বসিবার ঘরে গিয়া গৃহস্বামী হোমিওপ্যাথি বাক্সটা ও বইগুলা বাহির করিলেন। ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রস্তুত করিয়া যখন ড্রইংরুমে যোগেন্দ্রর কাছে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার নাক ডাকিতেছে। নিদ্রিতকে সে আর জাগাইল না। ভৃত্যের দ্বারা সুপ্রকাশকে ঔষধের গ্লাশটা পাঠাইয়া দিল, বলিয়া দিল, "সবটা একেবারে খাইয়ে দাও, আর এখন কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করে এস।"

সুপ্রকাশ ঔষধ রাখিয়া মিঃ রায়ের কাছে ফিরিয়া গেল। তাহার বন্দুকের বাক্স ও ব্যাটগুলার উপর অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাহার লুব্ধদৃষ্টি ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাহাদের পরস্পরে বেশ পরিচয় হইয়া গেল। এ বিষয় কেহই অসমকক্ষ ছিল না, বিশেষতঃ যখন উড্ডীয়মান পাখীটি তাহার একটি অব্যর্থ গুলির আঘাতে নিঃশব্দে মাটিতে শুইয়া পড়িল, তখন সুকুর আর কৌতুকের সীমা রহিল না। সে লুণ্ঠিত-মস্তক বিস্তারিতপক্ষ গতপ্রাণ জীবটিকে দুইটি ডানা ধরিয়া উঠাইল, সাগ্রহে তাহাকে দেখিতে দেখিতে তাহার ঘাতককে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, না মেরে ফেলে কি পাখী বেঁধা যায় না? তা হলে দিদি পুষতো!" তারপর হঠাৎ পাখীটা ফেলিয়া সাগ্রহে বন্দুকটা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল, "আমায় বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিন না, আমি একটা পাখী মারবো।"

মিষ্টার রায় শশব্যস্তে বন্দুকটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, "তুমি যে ছেলে মানুষ, তুমি ত এ বন্দুক ধরতে পারবে না, তোমায় মান্দ্রাজ থেকে একটা এয়ার গান্ আনিয়ে দেওয়া যাবে, কি বল? সরে এসো, ঠিক আমার পাশে থেকো, ঐ দেখ, একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে, ঐটের উপর তাগ্ করতে হবে, ঐ

পড়েছে।” সুপ্রকাশ ছুটিয়া শিকার-করা পাখীটি কুড়াইয়া আনিতে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চা খাইয়া মিঃ রায় বলিল, “এস সুপ্রকাশ, মাকে একবার দেখে আসি।” অভ্যাস নাই বলিয়া সুপ্রকাশ চা পান করিল না।

বাহিরে আসিতেই শুনা গেল, মোক্ষদা দাসী বলিতেছে, “ওমা, এ যে তোমার অন্যায় কান্না, দিদিমণি! এদের বাড়ীর বাবু পাখী মেরেছে, তাতে তুমি যে কেঁদে একেবারে হাট বাধালে! ছি চুপ কর, তিনি জানতে পারলে, কি মনে করবে,—বল দেখি?”

বসুমতী বলিলেন, “তোরই বা বাছা ও মরা পাখীগুলো আমাদের সামনে আনবার বা কি দরকার ছিল? আহা, কি সুন্দর পাখীগুলি! কান্নাই তো পায়!”

সহসা বিজয়ীর বিজয়-আনন্দ গভীর অনুতাপের লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। অন্তরালবর্ত্তী একখানা বেদনা-ক্লিষ্ট মুখের ছায়া কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোতে একটা ধাক্কা দিল। সুপ্রকাশের সহিত মিঃ রায়কে হঠাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া শান্তি চোখ মুছিতে মুছিতে পলাইয়া গেল।

১১

রামেশ্বর যাত্রীর ভিড়ে সহরে অত্যন্ত অসুখ-বিসুখ আরম্ভ হইল। বসুমতী যদিও সহরের বাহিরে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাড়ি লইয়াছিলেন, তথাপি ছেলে-মেয়ে লইয়া এই রোগের

মুখে থাকিতে তিনি আর সাহস করিলেন। রোগের ভয়েই বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছেন, এখানেই বা কি সাহসে থাকিবেন। রামেশ্বর তীর্থ-দর্শনের যে লোভটুকু তাঁহাকে এই দূরদেশে টানিয়া আনিয়াছিল, সেটুকুও মনের মধ্যে মিলাইয়া গেল। রজনীনাথ এ সংবাদ শুনিয়া লিখিলেন, "আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে আনিতে যাইতেছি! এ কয়দিন সাবধান থাকিবে। রামেশ্বর দর্শন তোমার ভাগ্যে নাই, নহিলে, এতদিন তুমি মাদুরায় আছ পূর্ব্বে না দেখিয়া অতিরিক্ত পুণ্যের লোভ রাখিলে কেন? এখন আর হয় না। আমার নিষেধ, এখন যেন যাইবার চেষ্টা করিও না।" বসুমতী এই আদেশ পাইবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন।

যোগেন্দ্র সপরিবারে সহর ছাড়িয়া আমার সংসারের মধ্যে কারাশ্রয় ভাবিয়া শাশুড়ির অতিথি হইয়াছে। মিঃ রায় আজকাল আর এ পরিবারের কাছে অপরিচিত বাহিরের লোক নহে। সে এখন ইহাদের মধ্যে বেশ একটি স্থান করিয়া লইয়াছে। এখন সকলে প্রতি সন্ধ্যায় তাহার আগমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে। রাত্রি বাড়িয়া উঠিলেও বিদায়ের ইচ্ছা কাহারো মনে উঠে না। একদিন দৈবক্রমে না আসিতে পারিলে পরদিন ইঁহার উঁহার মান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বেচারার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ত অল্পেই বশ হইয়া থাকে; গৃহকর্ত্রী বসুমতী পর্য্যন্ত তাঁহার এই নূতন ছেলেটার জন্য বিকাল হইতে ছটফট করেন। যতক্ষণ না মিঃ রায় আসিয়া তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত মিষ্টান্নগুলি খাইতে বসিয়া সুপ্রকাশের সহিত কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দেয়, ততক্ষণ যেন তাঁহার আরাম বোধ হয় না।

তার পর আহারের সমালোচনায় ও মায়ের উপর দাবী-দাওয়া লইয়া যখন ভাই দুটিতে প্রায়ই হাতাহাতির উপক্রম ঘটে, অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে তখন তিনি উভয়েরই প্রতি চাহিয়া দেখেন। শান্তি এ সব ঝগড়া বিবাদ ও পাখী শিকার ছাড়া অন্য সকল সময়ই তাঁহাদের সহিত সানন্দে যোগ দিত। মধ্যে মধ্যে বাগানে চড়িভাতির ব্যাপারে এবং প্রাত্যাহিক বৈকালিক ভ্রমণের সময় কোথায় কোন সত্যকালের ভগ্নস্তূপ পুরাতন দেবালয় অথবা উদ্যান দর্শনে তাহারা যোগেন্দ্র অপেক্ষা মিষ্টার রায়ের সাহায্য লওয়াটাই পছন্দ করিত। যোগেন্দ্র ভারি কড়া সমালোচক; সে মুগের ডালের আঁকা গন্ধ ও নৌকার ধারে ঝুঁকিয়া পড়া কিছুই সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু মিঃ রায় ডাল ত ডাল, ভাত অবধি পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেলেও সুপ্রসন্নভাবে তাহার মধ্য হইতে নীর ছাড়িয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিত। একদিনকার চড়িভাতির খিচুড়ি ধরিয়া গিয়া ভয়ানক গন্ধ উঠিলে যোগেন্দ্র তীব্র সমালোচনা করিল, "সরস্বতি! মিথ্যা কেন এ বিড়ম্বনা ভোগ করছ? সপত্নী-বিদ্বেষটা চিরকালের জিনিষ! তার চেয়ে তোমার দিদিকে এই কাজটা ছেড়ে দিয়ে ততক্ষণ বরং একটা টেনিসনের ট্রান্‌শ্লেসন করে ফেল—যে সময়ের সার্থকতা হবে। কি বল হে, রায় মহাশয়?" শান্তি কাঁদো কাঁদো মুখে নত চক্ষে বসিয়া রহিল।

মিঃ রায় একবার চকিতনেত্রে তাহার লজ্জা ও বেদনা-পরিপূর্ণ করুণ মুখচ্ছবি সাগ্রহে দেখিয়া লইল। যোগেন্দ্রর উপর একটু রাগ হইল, তাড়াতাড়ি শান্তির কাছে আসিয়া বলিল, "এস ত শান্তি, এবার আমরা দুজনে মিলে খিচুড়ি রাঁধি।

ও পেটুকটার অল্পে স্বল্পে কুলোবে না ত, সেজন্য তোমার রান্নায় দোষ দিয়ে আর এক হাঁড়ির বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে।”

চোখের জল চাপিতে চাপিতে অপরাধীর মত রন্ধনকারিণী বলিল, “না ওটা সত্যিই যে পুড়ে গেছে।” তথাপি মিঃ রায় বলিতে ছাড়িল না যে, ইহা যোগেন্দ্রর নিন্দুক স্বভাবের মিথ্যা দোষারোপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। নহিলে এখানে এতগুলা নাসিকার মধ্যে যোগেন্দ্রই বা ধরাগন্ধ পাইল কেন?

যোগেন্দ্র কিন্তু এ অপবাদ সহ্য করিল না! সে রাগিয়া বলিল, “ঐ ত তোমাদের কেমন রোগ! তোমরাই ত মিথ্যা তোষামোদ করে এখনকার মেয়েদের দিন দিন বিবি বানাচ্ছ। সরস্বতীরা মা লক্ষ্মীর সঙ্গে আড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন! যা করেন, তাই মনে হয়, খুব করেছি। খালি উল কার্পেটের শ্রাদ্ধ করে বাতে ও অম্বলের ব্যায়রামে অস্থির হচ্চেন। তার কারণ কিন্তু এই তোমারই! খোসামুদে!”

মিঃ রায় হাসিয়া বলিল, “তুমি বুঝি খোসামোদ জান না? গৃহিণীকে একেবারে লক্ষ্মীর আসনখানাই দিয়ে ফেল্লে?”

এই সব নানা কারণে শান্তি মিঃ রায়কে মনে মনে প্রশংসা করিত। বিশেষ, সম্পর্কের দোষে যোগেন্দ্র তাহাকে যে সকল তামাসা করিত এবং মণিমালা শুদ্ধ তাহা লইয়া সময়-অসময় তাহাকে যে রূপ জ্বালাইত, তাহাতে যোগেন্দ্রনাথের সহিত তাহার আরও বনিত না। আর ইহার সহিত কোন বিষয়েই তাহার এতটুকু মতদ্বৈধ ছিল না। বরং সময় সময় সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত যে, তিনি যেন তাহার বাবার মনের কথা সমস্ত পাঠ করিয়া আসিয়াছেন—যেন তিনি তাহার পিতার হাতে

গড়িয়া-তোলা একটি প্রিয় শিষ্য। ইদানীং বসুমতীও এই অপরিচিত যুবাকে স্নেহের সহিত বিশেষ একটু শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেটি তাঁহার স্বামীর একজন বিশেষ প্রীতি-পাত্র হইবার উপযুক্ত। তিনি তাঁহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিতেন; তাঁহার নাম নীরদকুমার রায়। এখানে তাঁহার বিদেশী সহকর্ম্মিগণের দ্বারা নামটার সংক্ষিপ্ত, আধুনিক সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মিঃ রায়। বসুমতী তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন, দেশে অনেকেই আছেন, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু আছে, জ্ঞাতিদের সহিত বনিবনাও হয় নাই, তাই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। একবার জন্মভূমি-দর্শনে যাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে, বোধ হয় শীঘ্রই যাইবেন। অনেকদিন হইতেই যাইতে ইচ্ছা, কেবল কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। এখানে মিঃ রায়ের চিনির কুঠি ও কাপড়ের তাঁত ভাল রকমই চলিতেছে। তিনি নিজেই সব দেখা-শুনা করেন। অংশীদারেরাও ধনী ব্যক্তি! নিত্য নূতন নূতন কাজ আরম্ভ হইতেছিল।

কতকটা বসুমতীর ও কতকটা শান্তির পত্রে দূর দেশের এই অপরিচিত বন্ধু ও অজ্ঞাত ভক্তের বিষয় জানিয়া তাহার প্রতি রজনীনাথের বিশেষ একটু শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। একলব্যের মত কে এই শিষ্যটি? এ কৌতূহল অনেকবারই মনে জাগিত! শান্তিকে তিনি লিখিলেন, "বুড়ি তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস। প্রথম প্রথম রায়ের কথা তোরা কতই না লিখতিস্, আজি কাল আর মোটেই লিখিস্ না। কেন, বল্ দেখি? তার তাঁত টাঁত

সব উঠে গেছে নাকি? না তিনি তোদের বাড়ি আর আসেন না?”

শান্তি উত্তর লিখিল, “না বাবা, তাঁর কারবার বেশ চলছে। একটা কাপড়ের কল আবার শীঘ্র আরম্ভ হবে। আমরা তাঁর তাঁতের অনেকগুলা কাপড় কিনে নিয়েছি। সেগুলো সব দেশী সুতোর আর খুব মজবুত। চিনিও বেশ ফর্সা হচ্চে, বিক্রিও খুব।”

রজনীনাথ চিঠি পড়িয়া হাসিলেন, লোকটার সম্বন্ধে বুঝি একটা কথাও লিখিবার প্রয়োজন নাই? শুধু তার কাজের সংবাদ!

এমন করিয়া অপরিচিত স্থানে নূতন লোকের মধ্যে শান্তিদের বেশ সুখে দিন কাটিতেছিল। বিশেষতঃ নীরদকুমারকে লইয়া তাহাদের এখন আর সঙ্গহীনতার কোন কষ্ট ছিল না। একদিন বৈকালে নৌকা করিয়া নদী ভ্রমণে যাওয়া হইল। সেদিন বসুমতীও সঙ্গে ছিলেন বলিয়া দুইখানি পান্সীর বন্দোবস্ত হইল। ক্ষুদ্র নৌকার একটিতে যোগেন্দ্র, নীরদ ও সুকু, অপরটিতে অনিলসহ স্ত্রীলোকেরা আরোহণ করিলেন। পাশাপাশি নৌকা ভাসিয়া চলিল। আরোহীগণ মুগ্ধ নেত্রে দুই কূলের সেই স্তব্ধ গম্ভীর মহিমাময় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন। নদীর স্পন্দনহীন শ্যামল তৃণশষ্পাবৃত তটভূমির প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া স্থির জল আছে। তীরে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। বিবিধ বর্ণের পাখী প্রজাপতি তাহাদের বিচিত্রবর্ণের পাখা মেলিয়া চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নীলাকাশ, তাহার অঙ্গে মেঘমালা শুভ্র তনু লইয়া আবেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অস্তোন্মুখ সৌরকরে মণ্ডিত সেই

শুভ্র মেঘপুঞ্জ যেন স্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি ক্রমে পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল রক্তরাগে সমুজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। অনেকখানি পথ কেহ কোন কথা বলিল না। প্রকৃতি নীরবতায় ভরিয়া রহিয়াছে। একস্থানে নদীতীরে সুন্দর পুষ্প-খচিত একটা বৃক্ষ-শাখা জলের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বালক সুকুর চঞ্চল হৃদয়খানি গাম্ভীর্য্যের গণ্ডির মধ্যে আর আটক মানিল না। সে সাগ্রহে নৌকার ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "আমাকে ওই ফুলগুলো তুলে দিন না, ভারি সুন্দর ফুল ত নীরদবাবু—"

যোগেন্দ্র আতঙ্কে তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া বিরক্তির স্বরে বাধা দিল, "ছি ছি সুকু কর কি, পড়ে যাবে যে। বনে দুটো ফুল ফুটে আছে, তাও তোমার প্রাণে সহ্য হয় না। সকল সময়ে তোমার ছেলেমানুষি!"

সুপ্রকাশ সবেগে যোগেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া নীরদকুমারের বাহু জড়াইয়া ধরিল, ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "তোমাকে ত আমি বলিনি, তুমি কেন বকছ? ও নীরদ বাবু! দাওনা, দিদি মালা গাঁথবে।"

নীরদকুমার তীরের দিকে নৌকা পাড়ি দিতে আদেশ করিল, তার পর যোগেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ছেলেমানুষ আবদার ধরেছে—সুকু, ভাই, আমায় একটা মালা দেবে ত?"

সুপ্রকাশ সানন্দে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ, একটা গাছে কত ফুল দেখ! আপনি মালা নিয়ে কি কর্ব্বেন নীরদ বাবু! দিদির মত গলায় পরবেন? আচ্ছা, আমি দিদিকে বলে দেব'খন, সে

আপনাকেও একটা মালা গেঁথে দেবে। কিন্তু অনেক ফুল তুলে দিতে হবে, তা হলে!”

যোগেন্দ্র ঈষৎ কৌতুক কটাক্ষ করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, “না হে না, দিদিকে অত পরিশ্রম করিয়ে কাজ নাই। দিদির প্রসাদী মালা-গাছটাই তোমার রায় মশাকে দিতে বলো, তাতেই তার যথেষ্ট হবে। কি বল হে?”

নারিকেল-বৃক্ষসমাকুল বনবীথির পানে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নীরদ মৃদু স্বরে উত্তর দিল, “গরীবের উপর তোমার অনেক দয়া দেখছি। অমৃতে অরুচি কার, বল? দেখ সুকু, ঐ যে পাখীটা উড়ে যাচ্চে, ওটাকে খুব সহজেই বেঁধা যায়।”

সুপ্রকাশ সাগ্রহে বন্দুকটা টানিয়া বাহির করিল, সৌৎসুক্যে বলিয়া উঠিল, “তবে বিঁধুন না নীরদ বাবু! শীগ্‌গির বন্দুকটা নিন্, ঐ যা, উড়ে গেল যে।”

নীরদ ব্যস্তভাবে বন্দুকটা সরাইয়া ফেলিল। বাধা দিয়া বলিল, “না না, মা ও শান্তি রাগ করবেন, তাঁদের সামনে পাখী মারা হবে না, সুকু, এখন থাক।”

যোগেন্দ্র ধমক দিয়া উঠিল, “তোমার কেবলি অন্যায় আব্দার সুকুন্‌। নৌকায় বসে গুলি ছুঁড়ে শেষে একটা খুন জখম করে বসবে না কি?”

নীরদ মৃদু হাসিল, “না! সে ভয় নেই! কিন্তু শান্তি—”

সুপ্রকাশ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, “খালি খালি আপনার দিদিকেই ভয়! দিদি রাগ কর্ব্বে! আর আমি যেন রাগ করতে জানি না। আচ্ছা আপনার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি, এই তিন সত্যি করলুম।”

নীরদকুমার বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া বলিল, "না না, সুকু, না না, রাগ করো না ভাই! সত্যি বলছি কাল দুপুরবেলা আফিস পালিয়ে নিশ্চয় তোমায় নিয়ে শিকার করতে যাব! বল, ভাব।"

সুকু তথাপি ঠোঁট ফুলাইয়া রহিল, কথা কহিল না। যোগেন্দ্র বলিল, "ও বাবা, এরা যে দেখি সবাই মানময়ী রাধা! ওহে, সুপ্রকাশ, দিদির জন্য ও ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে আপাততঃ দিদির মালা গাঁথবার সাহায্য করলে ভাল হয় না?" সুপ্রকাশ সাগ্রহ দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, সত্যই নৌকাখানা তখন সেই ঈপ্সিত বৃক্ষতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! কাজেই গোল মিটিল।

১২

প্রথম আষাঢ়ের আকাশ সেদিন আসন্ন বর্ষণের জন্য মেঘ বিদ্যুৎ লইয়া বেশ রমণীয় সাজিয়া আসে নাই। সেই একঘেয়ে বিস্তৃত নীলঢালা আকাশখানা সমস্তদিন রৌদ্রে ঝলসাইয়া এতক্ষণ পরে অগ্নিময় থালাখানাকে নদীর ওপারে নারিকেল গাছগুলার মাঝখানে ঠেলিয়া দিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিল।

এখানে প্রায়ই অসহ্য গরম পড়ে না। আজ দিনের বেলা একটু গ্রীষ্মবোধ হইলেও এখন গুমট কাটিয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিল, এবং বাগানের ফুলগাছগুলার মাথা নাড়াইয়া একটু ঝিরঝিরে বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা হইয়া গেলেও সেদিন মিঃ রায় আসিল না। যোগেন্দ্র কিছুক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে সুপ্রকাশকে ডাকিয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

গাড়ি-বারান্দায় আইভি জড়িত একটা থামের গায়ে হেলান

দিয়া শান্তি অনিলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ রায় না আসাতে শান্তির সন্ধ্যাটাকে বৃথা বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার কথা, তাঁহার হাসি, তাঁহার মধুর স্বভাব, সকলের নিকট তাঁহার নম্রতা, বিশেষতঃ দেশের প্রতি প্রাণঢালা অনুরাগ-আগ্রহ তাঁহার প্রাণে কি এক অনুপম আনন্দ ও প্রীতি জাগাইয়া তুলিত! শান্তি কিই বা ছাই গল্প জানে, কিই বা সে দেখিয়াছে যে জানিবে, তবু তাহাই তিনি কত আগ্রহের সহিত শুনেন! আবার তাহার বুদ্ধির তিনি এত প্রশংসা করেন যে, শুনিয়া লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারে না।

আজ সহসা শান্তির হাসিমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে! সে গম্ভীর মুখে ভাবিতেছিল, আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না! কেমন করিয়া হইবে? ভাবিতে ভাবিতে শান্তির মুখ অকস্মাৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, মনে মনে সে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার লজ্জায়, সে মরিয়া যাইতেছিল। সে কি অকৃতজ্ঞ! কি নির্ব্বোধ! সেখানে গেলে সে নিজেদের বাড়ি, ঘর, পাখী, পায়রা, হরিণ, বিড়াল, কুকুর, পাঁচকড়ি, হরে, বিধুর মা, হরিদাসী সর্ব্বোপরি তাহার বাবাকে দেখিতে পাইবে, তাহা না ভাবিয়া সে ভাবিতে বসিল, বাড়ি গেলে কোথাকার কে মিঃ রায়কে দেখিতে পাইবে না! কি লজ্জা! এমন সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে নীরদকুমার ডাকিল, "শান্তি!"

ধরা পড়িলে চোর যেমন চমকিয়া উঠে, শান্তি প্রথমটা সেইরূপ চমকিয়া উঠিল, কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, "আপনার বুঝি আর কাজ শেষ হয় না? এত দেরি? তার চেয়ে না এলেই ত হত।"

নীরদকুমারের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আনন্দে উত্তেজনায় সে বলিয়া উঠিল, "আমার আজ আসতে দেরী হয়ে গেছে, শান্তি, মাপ কর। তুমি আমার প্রতীক্ষা করছিলে ?"

"করিনি ? যোগেনবাবুও অনেকক্ষণ বসেছিলেন, তার পর রাগ করে একটু আগে বেড়াতে চলে গেলেন। সুকুও তাঁর সঙ্গে গেছে।"

মনের সে অদম্য হর্ষোচ্ছ্বাস গোপন করিতে না পারিয়া নীরদকুমার একটু নিকটে আসিয়া পুলক-কম্পিত ব্যগ্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি কেমন করে আমার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা তোমায় জানাব, শান্তি ?"

শান্তি তাহার আগ্রহে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া স্বাভাবিক মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "ঘরে আসুন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?" পরে চারিদিকে চাহিয়া সে দেখিল, অনিল নাই, সে কোন্ সময় পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়া মিঃ রায় আসন গ্রহণ করিল না, দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, "আজ যোগেন সুকু কেউ নাই, আজ আমি যাই। কাল থেকে খুব সকাল সকাল আসব। বল ত, দু বেলাই আমি আসতে পারি।"

শান্তি হাসিয়া কহিল,"কালই আসবেন। পরশু বোধ হয় আমরা এখান থেকে চলে যাব। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, আমাদের নিতে আসছেন। বোধ হয়, কাল সকালে এসে পৌঁছুবেন।"

নীরদকুমার ঈষৎ বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সে কি, তিনি এসে দুদিনও থাকবেন না, এত শীঘ্র চলে যাবেন ?"

"সেই রকমই তো লিখেছেন।" বলিয়া শান্তি ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিল।

সে নিশ্বাসটুকুও নীরদকুমারের কর্ণ অতিক্রম করিল না। ব্যথিত দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "আপনার সঙ্গে আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না!"

বলিতে বলিতে সহসা তাহার সহাস্য চোখের পাতা লজ্জায় মুদিয়া আসিল। কে জানে, কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য ভাবের আবেশে তাহার গোলাপি গণ্ডের রক্তিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মিঃ রায় ঘরের উজ্জ্বল আলোকে লজ্জিতার সেই সুন্দর মুখখানি অতৃপ্ত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, একটু হাসিয়া বলিল, "যদি ইচ্ছা কর, তা হলে আবার আমাদের দেখা হবে। বল, শান্তি, হবে?" যে স্বরে এই কথাগুলা উচ্চারিত হইল, তাহাতে বালিকা শান্তির সরল হৃদয়তন্ত্রীতেও সবলে একটা আঘাত লাগিল। সে কিছু না বুঝিলে না ভাবিলেও, তাহার নত দৃষ্টি সহসা আরও নত হইয়া পড়িল। নীরদকুমার একবার সহাস্য সপ্রেম সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহার লজ্জাকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আবার দেখা হবে, শান্তি! নিশ্চয়-নিশ্চয়ই আমাদের আবার দেখা হবে। না হলে——আজ তবে চল্লেম—না—একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসি—"

সুপ্রকাশ আসিয়া দিদির কাছে শুনিল, মিষ্টার রায় আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন! সে রাগিয়া গেল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ যেই আমরা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছি, অমনি তিনি এসেছেন, তাও আর একটু দাঁড়াতে পারলেন না! দাঁড়াও ত, কাল আমি

তাঁর সঙ্গে এমন ঝগড়া করব। কিন্তু দিদি, মিঃ রায়, আমার চেয়ে তোমায় বেশি ভালবাসেন, তা তুমি যাই বল—"

শান্তি তাড়াতাড়ি সুকুর কাছে আসিয়া তাহার একটি ছোট হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সুকু ও কথা না, ও কথা বলোনা, বলতে নেই।" সুকু দিদির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, অত্যন্ত আমোদও অনুভব করিল। সে হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বল্‌তে নেই বই কি? খুব বলতে আছে! সত্যিই ত! তিনি আমায় অনেক জিনিষ দেন, কিন্তু তোমার সঙ্গে বেশি গল্প করেন ত'? আমি যেন কিছু বুঝতে পারি না?"

শান্তি বড় বিপদে পড়িল। মিঃ রায় তাহাকে ভালবাসেন! ভালবাসিলেই বা, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহা লইয়া তাহার এত লজ্জাই বা কিসের জন্য? কিন্তু আজ যেন সবই নূতন! সেও নূতন, তিনিও যেন নূতন! আজ সে বুঝিয়াছে—কে জানে ছাই-পাঁশ কি-ই বা সে বুঝিয়াছে, তাহাও সে স্পষ্ট জানে না—শুধু এইটুকু অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়াছে যে, তাঁহাকে ছাড়িতে তাহার একটা গভীর আঘাত লাগিবে। আর এইটুকুও সে বুঝে, একজন নিঃসম্পর্ক যুবার জন্য এ বেদনা-বোধ করা তাহার পক্ষে অন্যায়!

সে যে তাঁহার কেহই নহে, এ কথা ভাবিতে শান্তি বড় বেদনা অনুভব করিল। তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা যেন ভাঙিয়া যাইতেছিল। সত্য তাহারা একেবারে নিঃসম্পর্ক, পর! ইহার পর সাক্ষাৎ হইবার এতটুকু দাবীও তাহার নাই! তবে কি সাহসে মিঃ রায় অমন জোর করিয়া

বলিলেন, আবার আমাদের দেখা হইবে। আচ্ছা, নাই বা আর দেখা হইল? পৃথিবীতে ত কত লোক আছে, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন! তবে তাঁহার সহিত আর কখনও দেখা হইবে না ভাবিয়া শান্তি এতটা কাতর হইতেছে, কেন? কই, আপনার লোক যোগেন বাবুর জন্য তো ভাবনা হইতেছে না? ছি এ'ত বড় লজ্জার বিষয়! শান্তি এমন এক চোখো হইল কেন? রাত্রে বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া জাগিয়া সে ভাবিল! কিন্তু এই সব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর তাহার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া সে পাইল না। জটিল সমস্যা জটিলই রহিয়া গেল।

পরদিন রজনীনাথ আসিয়া বলিলেন, "কাল সকলকে যেতে হবে, এখানে আর থাকা হতে পারে না। মান্দ্রাজে দিন কয়েক থেকে কলিকাতায় ফিরব। যোগেন, তুমিও চল।"

যোগেন্দ্র মাথা চুলকাইয়া একটু কাশিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল, "আমি ত যেতে পারি না, ছুটি কি এত শীঘ্র দিবে?"

রজনীনাথ কহিলেন, "ছুটি দেবে না, কে তোমাকে বলছে? আজই একটা দরখাস্ত দাও! না হয়, আমি দুদিন অপেক্ষা কর্ব্বো, এই দুরন্ত রোগের মুখে তোমাদের কি রেখে যেতে পারি, কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাজ কর, ফিল্‌টারগুলো সাফ করার বন্দোবস্ত কর। বাড়ি বেশ পরিস্কার আছে বটে, তবু বাগানের নালা টালাগুলো আরও একটু সাফ থাকা চাই।"

শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতাকে তাহাদের কয়মাসের অপূর্ব্ব সঞ্চয় ও যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়িল। রজনীনাথ

পুত্রের ফরমায়েস-মত এয়ার-গানটা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যে কিছু আনতে বল্লিনা বুড়ি? কেন? রাগ করেছিস?"

শান্তি হাসিয়া কহিল,"না বাবা! তার জন্য নয়, আমরা ত বাড়িই যাচ্চি, তা ছাড়া আমার তো সবই আছে, কি আর আন্‌তে বলব?"

"ইস্, তুই যে মস্ত লোক হয়েছিস্ রে! এমন কথাটা ত এ পর্য্যন্ত কেউ বলেনি। কিন্তু একটা জিনিষ যা তোর নেই, আমি তোর জন্যে আসবার দিন কিনে রেখে এসেছি! কি বল্, দেখি?"

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,"পুতুল আবার কি? বোধ হয়, খুব বড় মোমের কি কাঁচের পুতুল, সেত দিদির নেই, হ্যাঁ বাবা! তুমি যে বিলিতি কিনেছ?"

রজনীনাথ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সুকু হেরে গেল, পুতুল নয়।"

শান্তি চিন্তিত মুখে একটু হাসিয়া ভাইটির ভুল সংশোধন করিয়া লইল, "সুকু মনে করে, আমি যেন এখনো বড় হইনি, তাই বল্‌চে পুতুল! কি বলনা বাবা?"

"একটা চরকা!" শুনিয়া সুকুর বড় পছন্দ হইল না। শান্তি বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া বলিয়া উঠিল, "চরকা কি, বাবা? যাতে কাপড় বোনে?" সস্নেহে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া পিতা হাসিয়া কহিলেন, "চরকা কাকে বলে তাই জানিস্ না! সে কি রে বুড়ি, চরকার কাপড় বোনে না, সুতো কাটে! তাঁতে কাপড় বোনে। তুই সুতো কাটতে শিখবি? সেকালে সব মেয়েরা ঘরে ঘরে সুতো কাটত, সেই সুতোয় তাঁতিরা কাপড় বুনে দিত।"

শান্তি সানন্দে মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল, সোৎসাহে

বলিল, "আমিও খুব চেষ্টা করে সুতো কাটতে শিখবো, বাবা, সুকুকে ভাইফোঁটায় যদি নিজের কাটা সুতোর কাপড় পরাতে পারি, তা হলে কেমন হয়!"

রজনীনাথ তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "পারবি মা, তুই পারবি।"

১৩

মিঃ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রজনীনাথ বিশেষ ব্যগ্র থাকিলেও সেদিন আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। মিঃ রায় আসিল না। এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। সকলেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইল। বসুমতী তাহার বাসায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "বাবুর কি অসুখ করেছে?" বলাই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "তিনি বাড়ি নেই। সকাল বেলাই বাইরে গেছেন, রাত্রেও হয়ত আসবেন না।"

বসুমতী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কই কালতো সে কিছু বললে না! আমি সারাদিন ধরে তার পছন্দ-সই খাবারগুলি তৈরি করে রাখলেম।"

যোগেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজে তাকে যেতে হয়েছে। না হলে সে কখনো পিসে মশায়ের সঙ্গে দেখা না করে চলে যায়?"

রজনীনাথ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। এই অজ্ঞাত ভক্তটিকে দেখিবার জন্য তিনিও অনেকদিন হইতে একটা আগ্রহ মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। সেদিনকার আনন্দটা মাত্রাহীন হইয়া রহিল।

রাত্রে শান্তির বিবাহ সম্বন্ধে আবেদন শুনিয়া চিন্তিত ভাবে অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া রজনীনাথ কহিলেন,

"এ ত হতে পারে না, বসু! অনেকদিন থেকে আমি কথা দিয়ে রেখেছি। বল্‌তে গেলে তিনি শান্তির জন্যই শুধু হেমকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন! এখন কি মত বদলাতে পারি?"

বসুমতী বলিলেন, "সে কোন কাজের কথা দেওয়া নয়। সে রকম কথা ছেলেমেয়ে থাকলেই অমন হয়ে থাকে, তাতে কি আসে যায়। এ ছেলেটীকে তো দেখনি, দুদিন যদি কাছে রাখ, তাহলে আর কোন বাধাকেই বাধা মনে করবে না। ঠিক তুমি যেমনটি পছন্দ কর, ভগবান যেন তেমনি এনে মিলিয়ে রেখেছেন। রূপই বা কি! বেশ লম্বা চওড়া সুস্থ সবল দেহ। তা ছাড়া এ বিয়েতে বোধ হয় মেয়েও বেশি সুখী হবে। লক্ষ্মী-পুরের ওঁরা বড়লোক সত্য, কিন্তু সেখানে পড়লে তারা আমার মেয়ে পাঠাবে না। ছেলেও কেমন, তাই বা কে জানে? নীরদ আমার শান্তিকে খুব ভালবাসে। আমি বুঝেছি সেও ওকে চায়।"

রজনীনাথ বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া বলিলেন, "ঐ তোমাদের একটা ভুল বিশ্বাস, বসু! দুদশখানা নভেল পড়ে তোমরা সংসারটাকে উপন্যাসের চক্ষে দেখতে থাকো। তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়, তখন ত কই আমাদের মধ্যে ভালবাসা হয়নি, আর তার এমনই কি মন্দ ফল ফলেছে? শান্তির বাপ মা যে পথে চলেছে, তার পক্ষেও সেই পথ ভাল। ও সব নভেলিয়ানা আমি ভাল বুঝি না। শ্যামাকান্ত চৌধুরীর ভারী সাধ যে শান্তি তাঁর বউ হয়। তাঁর ছেলে বিনোদ কতদিন নিরুদ্দেশ, এ পর্য্যন্ত তার এতটুকু খবর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। ধরে নাও, সে বেঁচে নেই। বিশেষ সেবার কাগজে সেই যে রেলওয়েতে কাটা-পড়া ছেলেটির কথা বেরিয়েছিল, তুমি কি মনে কর,

সে বিনোদ ছাড়া আর কেউ? চৌধুরীকে লুকোলেম সত্য, কিন্তু তারিণী বাবু স্বচক্ষে সে ছেলেটিকে দেখে এসে স্পষ্টই বল্লেন, শুনলে ত যে, সে বিনোদ ছাড়া আর কেউ নয়। সেই জন্য চৌধুরী যখন শান্তিকে পাবার জন্য তাঁর ভাইপো হেমেন্দ্রকে দত্তক নিলেন, আমি বাধা দিইনি। পূর্ব্বেও আমি একবার তাঁর কাছে স্বীকার করেছিলেম, যে যদি বিনোদ ফিরে আসে, তাহলে আমি শান্তিকে তার হাতে দেবো। অবশ্য সেটা কতক লজ্জার খাতিরে বটে, তবু যখন বলেছি, তখন আর সে কথা ফেরে না। এখন শ্যামাকান্ত চৌধুরী সেই দাবী তুলেছেন। সে দিন তিনি নিজে তাঁর বর্ত্তমান পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, আমিও এক রকম কথা দিয়ে ফেলেছি।"

বসুমতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি কয়মাস ধরিয়া যে আশা মনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছিলেন, বুঝিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। আহা! সে যে স্নেহের ভিখারী! বিনোদের চেয়ে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিতে বসুমতীর আপত্তি কম। তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিলেও সে যে বাপের অবাধ্য ছেলে, এ কথা বসুমতী কখন ভুলিতে পারিতেন না।"

রজনীনাথ আবার কহিলেন, "বসু! তুমি দুঃখ করো না! ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যা করেন, তা ভালর জন্যই। দেখ, শান্তির জন্য শ্যামাকান্ত যেমন ব্যগ্র, পৃথিবীতে বৌয়ের জন্য কোন শ্বশুর বোধ হয় তেমন হয় না। আর বুড়িও তাঁকে খুব ভালবাসে। আমাদের বুড়িটা যেমন আদরের, সেখানেও সে তেমনি আদর পাবে। ছেলেটাও দেখতে শুনতে স্বভাবে সব রকমে ভাল।

ভূমিকা

'পোষ্যপুত্র' প্রকাশিত হইল। "ভারতী"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালীন যে সকল পাঠক-পাঠিকা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সুখ্যাতি করিয়া আমাকে উৎসাহ দানে বাধিত করিয়াছিলেন, এই অবসরে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদিগের উৎসাহ না পাইলে 'পোষ্যপুত্র' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে আমি কখনও সাহসী হইতাম না।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলেখক শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ, যত্ন ও উদ্যম অপরিসীম। তাঁহার সহায়তা না পাইলে আমি এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! তাঁহার সাহিত্যসাধনা সফল হউক, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

প্রুফ দেখায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেও কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল, সুধী পাঠক অনায়াসে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন, এ আশা আমার বিলক্ষণ আছে। তাই সে সম্বন্ধে বিশেষ কৈফিয়ৎ প্রদান করা অনাবশ্যক মনে করি।

এক্ষণে 'পোষ্যপুত্র' সুধীসমাজে আদর লাভ করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

লেখিকা

মজঃফরপুর,
১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯

নিশ্চয়ই লতি আমার সুখী হবে। তা ছাড়া আমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে যেতে পারি যে, শ্যামাকান্ত চৌধুরী, যাঁর দয়াতে আজ আমার এ সমস্ত সুখ সম্পদ মান যশ, যাঁর সাহায্য না পেলে দরিদ্র রজনীনাথের আজও সেই দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা অনিবার্য্য হত! আজ আমার দুটো টাকা হয়েচে বলে কি আমি আমার সেই অন্নদাতাকে উপেক্ষা করতে পারি? করলেই বা ধর্ম্ম তা সহ্য কর্ব্বেন কেন? তিনি দয়া করে তাঁর আশ্রিতের মেয়েকে কোলে নিতে যাচ্চেন, কেমন করে সরিয়ে নোব। এ যে আমাদের একটা পরীক্ষা, তা বুঝতে পারচো না? এ অবসরে একটুখানি ঋণ পরিশোধ যদি না করব, তবে কবে করব?"

পরদিন সকালেও নীরদকুমার আসিল না দেখিয়া রজনীনাথ যোগেন্দ্রকে বলিলেন, "কৈ হে যোগেন, তোমার বন্ধু ত আজও এলেন না? আমাদের অবসরও সংক্ষেপ হয়ে এলো! তবে দেখছি, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হলনা।"

যোগেন্দ্র একটু চিন্তিতমুখে গোঁফের প্রান্ত দুইটা মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিল, "তাইত! তা না হয় না-ই আসুন, পর্ব্বত যখন মহম্মদের নিকট এলেন না, তখন মহম্মদের পর্ব্বতের নিকট যাওয়া ভাল।"

কিন্তু নীরদকুমারের ভৃত্য সেদিনও অভ্যাগতদ্বয়কে বসিবার ঘরে দুইখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কুণ্ঠিতভাবে জানাইল, তাহার মুনিব এখনও গৃহে অনুপস্থিত। কিন্তু ইহাও সে জানাইতে ভুলিল না, সে সে জন্য তাঁহাদের চা চুরুট এমন কি তামাক এবং মিষ্টান্ন অবধি পাইতে পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইবে না। কেবল হুকুমের অপেক্ষা। যোগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে

কহিল, "গোল্লায় যাক তোর চা চুরোট! নিশ্চয়ই সে ক্ষেপেছে।"

উভয়ে মাদুরার দ্রষ্টব্য স্থান সকল দেখিয়া বাড়ি ফি আর একবার মিঃ রায়ের খপর জানিয়া আসিতে ভুলিলেন না। কিন্তু সেবারও বিশেষ ফল হইল না। পথে আসিতে আসিতে বিস্ময়বিমূঢ় যোগেন্দ্র শ্বশুরকে পুনঃ পুনঃ জানাইল, কোন গূঢ় রহস্যযুক্ত কারণ ভিন্ন নীরদকুমারের দ্বারা কখনই এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিতে পারে না। তিনি যেন মনে না করেন, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। কারণ সে অনেকবার তাহাকে রজনীনাথের সহিত সাক্ষাতাভিলাষ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছে। এবং এই সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাক্যে ও কার্য্যে এমন সমান মিল রাখিয়া চলা লোক, সে আর কখনও দেখে নাই। সাধারণের সহিত তাহার এইখানেই প্রভেদ। অনেক সময় জেদী বলিয়া মনে হইলেও, এটা যে নীতিশাস্ত্রের একটা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য, তাহাকে অস্বীকার করিবে? এমন একজন উপযুক্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারিল না, তাহা যে তাহারই দুর্ভাগ্যের ফল এ কথা বলিয়া, সে অনেক আক্ষেপ করিল। রজনীনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অবশেষে বলিলেন, "আর যাই হোক, লোকটা স্বদেশভক্ত, তাতে সন্দেহ নাই। সে যে একটা শিল্পবিদ্যালয় খোলবার চেষ্টা করছিল, শুনছিলুম না? কি হল?"

যোগেন্দ্র ঔদাস্যের সহিত উত্তর দিল, "সে এখন হলনা, টাকা উঠল না। অন্য কেউ বড় গ্রাহ্য করলে না। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি, বলছিল দু তিন মাসের মধ্যেই কাজে

সে যথেষ্ট সহায় পাবে। কলটায় শীঘ্রই সে কাজ আরম্ভ করবে শুনছি। অনেক বড় বড় মহাজন অংশীদার আছে। একটা কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলুম—আমার বিশ্বাস সে শান্তিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। আর আমরা মনে করি সে ইচ্ছা তার অসঙ্গতও নয়! শান্তির জন্য যে সে যোগ্য পাত্র, তাতে সন্দেহ নাই।”

বাধা দিয়া রজনীনাথ বিষণ্ণভাবে কহিলেন, “তা ত হবার নয়, যোগেন! হলেত খুব ভালই হত, কিন্তু শুনেছ ত সব, বুড়ি যে শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে অনেকদিন থেকে দেওয়া আছে। কি করি বল? তা সেও দিব্য ছেলে।”

যোগেন্দ্র বন্ধুর হইয়া ওকালতি করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু প্রথম সূচনাতেই সে হাল ছাড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু মনে মনে সহস্রবার তাহাকে ‘নির্ব্বোধ’ বলিয়া গালি দিতে ছাড়িল না। সে যদি এই এই সঙ্গীন সময়েও একটি দিন মাত্র রজনীনাথের নিকট আসিয়া তাহার স্বাভাবিক বিনয়নম্রতার সহিত শান্তির পাণি প্রার্থনা করিত! যোগেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা হইলে শ্যামাকান্ত চৌধুরী ও তাহার দিব্য ছেলে সেই মুহূর্ত্তে বিনা তর্কেই পরিবর্জ্জিত হইতেন।

মানুষ সব সময় অপরের মন ঠিক বুঝিতে পারে না, যোগেন্দ্র তাই দুইজনকেই ভুল বুঝিয়াছিল! দেখিয়া শুনিয়া তাহার বেশ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নীরদকুমার শান্তির প্রার্থী, তাই সে আশ্চর্য্য হইয়াছিল, এমন সুযোগ কি বলিয়া সে পরিত্যাগ করিল?

ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘন ঘন গোঁফে মুচড় দিয়া, ছিলিমের পর

ছিলিম পুড়াইয়াও সে কিছু স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, বোধ হয় সে শান্তিকে সত্যই ভালবাসে!

১৪

সকালবেলা ভাঁড়ার ঘরের দালানে কুটনা কুটিতে কুটিতে মণিমালা বলিল, "ভাই শান্তি! সত্যি করে বল দেখি ভাই! তুই মিঃ রায়কে ভালবাসিস্ কি না?"

শান্তি বলিল, "তুমি বুঝি বাস, তাই আমায় বলা হচ্চে?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "কেন আমার ভালবাসবার লোক নাই নাকি, যে আমি তোর নীরদকে ভালবাসতে যাবো?"

"তবে, আমারও কি ভালবাসার লোকের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে?"

"তোর আবার ভালবাসার লোক কিনি হয়েছেন, শুনি?"

শান্তি হাসিয়া উত্তর দিল, "কেন, বাবা, মা, সুকু, অনিল, তুমি, তোমার বর, তরু নিরু টেবি মেনি মোক্ষদা হরিদাসী—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ পেঁচোর মা, বাগ্দিবুড়ি, ময়রাবুড়ো—"

"দূর! তুমি ময়রাবুড়োকে ভালবাসগে যাও, আমি তাকে চিনি না।"

হাসিয়া মণিমালা গড়াইয়া পড়িল, কহিল, "[illegible]মুখী যেন নেকি! আমি যেন সেই ভালবাসার কথাই [illegible]? এত বই পড়েছেন, আর এ কথা বোঝেন না, এ নাকি [illegible] বিশ্বাস করতে পারি? সত্যি করে বল্ দেখি তাঁকে [illegible] বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় কি না? আচ্ছা দিব্যি কর!"

অকস্মাৎ শান্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বিকশিত

পুষ্পের মত সেই রাঙ্গা মুখ লইয়া সে বড়ই বিপদে পড়িল। মুখ নত করিয়া জলের মধ্য হইতে ডালনার আলুগুলা থালায় তুলিতে তুলিতে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে কহিল, "তুমি বিশ্বাস না করলে ত আমার বয়ে গেল। আমি যেন তোমায় মাথার দিব্য দিয়ে বিশ্বাস করতে বলছি?"

"আচ্ছা, তবে আমি পিসিমাকে বলিগে যাই, তুই তাকে বিয়ে করতে চাস, তুই তাকে ভাল—"শান্তি চমকিয়া মণির হাত ধরিয়া ফেলিল। রাগ করিয়া একটু তীব্রভাবে সে বলিল, "এ আবার কি তামাসা মণিদি?' ছি, ছি, মা তা হলে কি মনে কর্ব্বেন, বল দেখি? ছি, ছি! তোমরা আজকাল কি যে সব বলতে আরম্ভ করেছ, আমি কিছু বুঝতে পারি না"।

মণিমালা শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সত্যই কিছু আর সে বসুমতীকে এ কথা বলিতে যাইতেছিল না। আর তাই যদি বলে, তাহাতেই বা সে এত রাগ করিল কেন? মণি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তুই যেমন পাগল্! অমনি ঐ কথায় রাগ হয়ে গেল? আমি যেন সত্যিই বলতুম! কিন্তু ভাই, যাই বলিস্, তিনি যে তোকে বিয়ে করতে চান, তিনি যে তোকে ভালবাসেন, তাতে সন্দেহ নেই। ইনি বলছিলেন, এ কথা পিসেমশাইকে বলবেন।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রজনীনাথ যোগেন্দ্রনাথের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সুকুও সঙ্গে গিয়াছে। ঘরে বসিয়া অনিলকে লইয়া শান্তি গল্প বলিতেছিল। মণিমালা আসিয়া কহিল, "কি হচ্ছে তোমাদের? গল্প? আমিও একটু শুনি?" শান্তি গল্প বলিতে লাগিল। মণি কিন্তু গল্প না শুনিয়া

কি ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, নীরদকুমার কাল আসে নাই, আজও আসিল না! ইহার অর্থ কি?

যোগেন্দ্রর কথাটা মণির সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছিল। যোগেন্দ্র বলিয়াছিল, হয় ত কোনপ্রকারে পূর্ব্বেই শাস্তির অন্যত্র বিবাহের সংবাদ পাইয়া আত্মাভিমান-বশে নীরদ দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার অত্যধিক আত্মগৌরব রক্ষার চেষ্টা মণির অবিদিত ছিল না। আচ্ছা, সত্যই কি সে শাস্তিকে ভাল বাসে নাই? না, এ কি কখনও সম্ভব! চুম্বক লৌহকে নিকটে পাইলে আকর্ষণ করিয়া বসিবে, ইহাই চুম্বকের ধর্ম্ম। কুমারী বালিকার প্রতি অবিবাহিত যুবকের এ অত্যধিক আকর্ষণ কি শুধু স্নেহ, না আর কিছু? তবে বোধ হয় দ্বিতীয় কারণটাই বেচারাকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়াছে।

শান্তি মণিমালার মুখে শুনিল, দেশে ফিরিয়া বোধ হয় এই মাসের শেষেই তাহার বিবাহ হইবে। জ্যেঠা মহাশয় তাঁহার স্নেহ-ভারাকুল নিরানন্দ হৃদয়-রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে যাহাকে স্থাপন করিয়াছেন, সে তাহারই জন্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছে। মণি বলিল, "শান্তি, ভাই, ক্ষমা করিস্।"

শান্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে?"

"কাকে আবার,—আমাকে"।

"তোমাকে? কিসের জন্য? কেন তুমি কি করেছ?"

"তোকে অন্যায় তামাসা করেছি। তা ভাই, আমি ত জানতুম না যে, তুমি অন্যের বাগদত্তা, তা কি কর্ব্ব বল? ওহো! তাই বুঝি বলা হচ্ছিল ভালবাসবার লোকের দুর্ভিক্ষ হয়নি?"

"না আমি তোমায় ক্ষমা কর্ব্বোনা,"— বলিয়া শান্তি হাসিতে লাগিল।

"না করলি ত, বড় বয়েই গেল। ভাল মানুষের ত আর কাল নেই। যা, তোর ক্ষমা চাইনে! ইস্, কথাটা যে বড্ডই গায়ে লেগেছে দেখছি।"

শান্তি অনিলের বর্ণিত গল্প পুনরারম্ভ করিল, "তার পর শিয়াল করলে কি, বউটাকে নিয়ে একটা ছুতোরের বাড়ি গেল। গিয়ে দেখে, না—"

মণি বলিল "এত ছেলেমানুষিও তোর আসে, তুই কি চিরকালই খুকি থাকবি?"

শান্তি হাসিয়া কহিল, "কেন, আমি কি বুড়ো? আমি ত তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, ভাই!"

"এখন আয় না ভাই, আমায় সেই গানটা শেখাবি। তোর ভগ্নিপতি কাল ভারি রাগ করছিলেন, বলছিলেন, তুমি ভারি মূর্খ, কিছু শিখতে পারনা। শান্তি কেমন সুন্দর বাজায়, আর তোমার হাতে পড়ে বাজনা যেন কাঁদতে থাকে।"

শান্তি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমায় বাজনা শেখান ভাই আমার কর্ম্ম নয়। যোগেনবাবু নিজেই যেন শেখান!"

মণি একটু অভিমান করিয়া ঠোঁট ফুলাইল, "কেন, আমি কি এতই মুখ্যু নাকি? তুই ভাল করে শেখাস্ না, তাইত পারিনে, আজ দেখিস্ দেখি"।

তখন বাজনা-শেখানর চেয়ে, গল্প বলার উপরই শান্তির আগ্রহ বেশী। দায়গ্রস্তভাবে সে বাজনার ডালা উঠাইয়াই রক্ষা

পলাইয়া গেল। ঠিক সেই সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। এ শব্দ তাহাদের অপরিচিত নয়, মণিমালা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সে যাইতে না যাইতেই দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া নীরদকুমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে শান্তির মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। শান্তি তাহার আকস্মিক আগমনে আজ একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। তাই ঈষৎ লজ্জিতভাবে হারমোনিয়মের চাবীগুলার উপর হইতে সে অঙ্গুলি উঠাইয়া লইল। বোধ হয়, তাহার সেই পুষ্পকোরকতুল্য অঙ্গুলির লীলাচঞ্চল ক্রীড়াস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া, হার্ম্মোনিয়মের চাবিগুলা সহসা মাতৃক্রোড়চ্যুত হইল।

নীরদকুমার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ি যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে? কবে যেতে হবে?"

শান্তি মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "বোধ হয়, পরশু!

"যোগেনও যাবে?"

"তা ঠিক বলতে পারি না, মণিদি আর অনিল যাবে।"

মিঃ রায় একটা চেয়ার সরাইয়া বসিল, কহিল, "আমি কাল আসতে পারিনি বলে বুঝি রাগ হয়েছে? তুমিই শুধু রাগ করেছ, না সবাই? হাসলে হবে না, বল্‌তে হবে, কে কে রাগ করেছে! মা, খুকু, যোগেন, অনিল, তুমি—আচ্ছা, খুকুর কুকুরটাও কি রাগ করেছে না কি? সেটাকেও ত দেখতে পাচ্চি না!"

শান্তি সহসা রাগ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল, "বাঃ, কুকুর বুঝি রাগ করতে পারে? ওদের বুঝি তত বুদ্ধি আছে? কুকুরটা রাগ করেনি।"

মিঃ রায়ও হাসিল, কহিল, "আর তুমিও রাগ করনি—না?

শান্তির ওষ্ঠপ্রান্তে যে ক্ষীণ সলজ্জ হাসিটুকু ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল, তাহাই তাঁহার প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর। মিঃ রায় তাহার মুখের অস্পষ্ট বিষাদের ক্ষীণ ছায়াটুকু লক্ষ্য করিল না, তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইল, সুন্দর মুখ নূতন একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময় বাহিরে একটা দুপদাপ শব্দ ও চীৎকার উঠিল, "টেবি, টেবি!" এবং পরক্ষণেই সশব্দে সুপ্রকাশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে নূতন এয়ার গান্ এবং পশ্চাতে গলায় নীল ফিতা ও পায়ে রূপার ঘুমুর-পরা শ্বেতরোমাবৃত ক্ষুদ্রকায় কুক্কুর-শাবক! টেবি তাহার নূতন প্রভুর সহিত ঘরে ঢুকিয়াই পুরাতন প্রভুর গলার শব্দ চিনিয়া নাচিয়া লাফাইয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ জীব এখনও তাহাকে ভুলে নাই। সুপ্রকাশ মিঃ রায়কে দেখিতে পাইয়াই গভীর অভিমানের সহিত মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া হস্তস্থ দ্রব্যটা পশ্চাৎদিকে লুকাইয়া ফেলিল। অভিমানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আজ কোনমতেই তাঁহার সহিত কথা কহিবে না। মিঃ রায় তাহা বুঝিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বালকের বন্দুকশুদ্ধ হাতটা গ্রেপ্তার করিয়া বলিল, "বাঃ সুন্দর বন্দুকটি ত। কিন্তু সুকু এখানে বেশ শিকার করা যেত ভাই! কলকাতায় ত সে সুবিধা হবে না! আমরা দুজনে শিকার করতে কোনখানে যাব বল দেখি?"

কথাটা শুনিয়া সুকু ও শান্তি একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "সত্যি! আপনি নাকি কলকাতায় যাবেন?"

"যাব বলেই ত কাল আসতে পারিনি। নানান ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপানো, সেগুলো সাফ করে ফেলা চাই ত। সুকু, তুমি এটা সহজেই ছুঁড়তে পারবে। কাল সকালেই আমি তোমায় শিখিয়ে দেব, কি বল?"

সুপ্রকাশের অভিমান দূর হইয়া গেল, সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই আমায় শেখাবেন। একটা পাখী কিন্তু আমায় মারতে দিতে হবে।"

শান্তি তাহার সব কথা বলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল, "নির্দ্দোষী জীবকে অনর্থক মেরে তোর কি সুখ হয়, সুকু? আহা, তোর কষ্ট হয় না? আগে ত এমন নিষ্ঠুর ছিলিনে?"

"কেন হবে? নীরদ বাবুর কি হয়? উনিই ত বলেন, শিকার না করলে, হাতের কৌশল না অভ্যাস করলে, এর পর যদি কখনও রাসিয়ানরা আসে, তা হলে লড়াই করতে পারব, কেমন করে? তখন কি লক্ষ্মণ সেনের মত খিড়কী দোর দিয়ে পালাব? বাবাও ত তাই বলেন। তুমি কিন্তু আমার চেয়ে নীরদ বাবুকে বেশি ভালবাস, দিদি! আমারই শুধু দোষ ধর! কিন্তু ওঁর বেলা ত কিছু বল না?"

শান্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন ভ্রাতার কথায় লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। নীরদকুমার প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া ঈষৎ স্নিগ্ধভাবে হাসিল। সুকু বলিল, "সত্যি আপনি যাবেন, নীরদ বাবু! বেশ হবে, কিন্তু তা হলে। আমরা দেশে গেলেই ত দিদির বিয়ে হবে, সে সময় আপনি থাকবেন? কত বাজনা বাজবে, আলো আর বাজি হবে। আপনি এমন করে চেয়ে রইলেন যে?

সকালবেলা উঠে যে একটু পূজো-আহ্নিক কর্ব্বো তার যোটি নেই,— চার কাল ধরে খেটেই মরবো।”

গোময়-মৃত্তিকালিপ্ত হাত ধুইতে ধুইতে কন্যা ধীর স্বরে বলিল, “তুমি চান করতে যাও মা, আমি এখনি সব সেরে ফেলচি—”

মাতা গরুকে সর্ষপ-খইলমিশ্রিত বিচালী দান করিয়া তৈলের বাটি ও গামছা লইয়া স্নান করিতে গেলেন।

বর্ষায় যমুনার চর ডুবাইয়া চড়া ভাঙ্গিয়া ঘাটের কোলে কোলে পুরাতন পাথরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত জল আসিয়াছিল। বস্ত্রহরণ ঘাটের প্রশস্ত সিঁড়ির উপর জটলা করিয়া স্নানার্থীরা কেহ তৈল মাখিতেছে, কেহ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ কচ্ছপকে ছোলা ভাজা খাওয়াইতেছে, কেহ-বা পূজা করিতেছে, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, ঘাটের পাণ্ডারা দস্তুরমত হাঁক দিতেছে, পয়সা লইতেছে, ফোঁটা তিলক দান করিয়া ঠাকুর দেখাইয়া অযাচিত অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া দিয়া স্নানার্থী ও দর্শনার্থীকে ত্রাহি মধুসূদন -ডাক ছাড়াইতেছে; চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সবই যথাযথ চলিতেছিল।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর আজ যেন স্নানের অর্দ্ধেক সুখ-টুকু চলিয়া গিয়াছিল! বেলা হওয়াতে তাঁহার ভাবীসাবির দল আজ আর কেহ এখানে উপস্থিত নাই! স্নান ও স্নানকৃত্য সংক্ষেপে সারিয়া কলসী ভরিয়া তিনি বাড়ি ফিরিলেন। শিবানী তখন বাসি পাঠ সারিয়া, বাসন মাজিয়া সেগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় সাজাইয়া রাখিতেছিল, মাতার পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া, তাঁহাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার চান হয়ে গেলো, এতো শীঘ্র ফিরলে যে মা?”

আপনি বুঝি শোনেননি, দিদির যে এই মাসেই লক্ষ্মীপুরে বিয়ে হবে?"

মানুষকে সাপে কামড়াইলে সে যেমন আকস্মিক ভয়ে চমকিয়া উঠে, নীরদকুমারের সেই অবস্থা হইল। সে বলিল, "কোথায়? কোথায়?"

সুপ্রকাশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া একবার দিদির দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি নত মুখে বসিয়া হারমোনিয়মের সুরগুলার উপর অঙ্গুলি দ্বারা মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "লক্ষ্মীপুরে।"

মিঃ রায় পরিত্যক্ত কেদারাখানার উপর বসিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মীপুরে—কাদের বাড়ি? কার সঙ্গে?"

বালক একটু ভাবিয়া বলিল, "জ্যেঠামশায়দের বাড়ি, হেম বাবুর সঙ্গে। জ্যেঠামহাশয়কে চেনেন না? তাঁর মস্ত সাদা দাড়ি নেই, গল্পও জানেন না, তবু তিনি আমাদের জ্যেঠা মশায়, আবার দিদির তিনি ছেলে হন। আমি তাঁর নামও বলতে পারি, বলব, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চৌধুরী, জানেন নীরদ বাবু! হেম বাবু তাঁর ছেলে নয়,—বাবা মার কাছে বলছিলেন, তাঁর ছেলে বিনোদ যদি ফিরে আসত, তা হলে তার সঙ্গে দিদির বিয়ে হত না, সে সব বিষয়ে ভাল ছেলে হলেও বাপের অবাধ্য। এ দত্তক ছেলে। বাবা বল্লেন, এ বিনোদের চেয়ে না কি সুন্দর। বিনোদের কিন্তু খুব অন্যায়, না নীরদ বাবু! সে কি করে তার বাবার অবাধ্য হল! দিদি তাকে কখনো বিয়ে করবে না, কখ্খনো না, আমি বাবার অবাধ্য হই না, দিদিও না।"

মিঃ রায়ের মুখ নীল হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার রক্তহীন বিবর্ণ ওষ্ঠ গভীর হতাশায় ঈষৎ কম্পিত হইল, তাহার যেন সকল শক্তি চলিয়া গিয়াছিল মুখ দিয়া একটিও ভাষা বাহির হইল না। সুপ্রকাশ তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিল না। সে এবার তাহার দিদিকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল, "হ্যাঁ দিদি, বাবা বলছিলেন তুমি হেমবাবুকে ভালবাস। আমি কিন্তু তা কখনো বাসতে দেব না। তা হলে তুমি যদি আমায় আর ভাল না বাস? তার চেয়ে বরং নীরদ বাবুকে ভালবাসাও ভাল—ঐ বুঝি বাবা আসচেন।" বলিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। টেবিও তাহার অনুসরণ করিতে ভুলিল না।

এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাতে নীরদকুমার এক মুহূর্ত্তে বজ্রস্তম্ভিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে সেই আকস্মিক বিহ্বলতার স্থানে একটা গভীর উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়া তাহার অসাড় মনোবৃত্তিগুলিকে পুনশ্চ সচেতন করিয়া তুলিল। অকস্মাৎ কেদারা ছাড়িয়া দ্রুতপদে সে শান্তির নিকট গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "ও কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না! শোন, শান্তি! তুমি আমার এ অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা। সেই কথাই আমি আজ তোমার বাবাকে বলতে এসেছি। এমন সময় এমন আঘাত দিও না, বল, শান্তি, সুকুর কথা সত্য নয়?"

একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া শান্তি দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিল। তবে ত লোক মিথ্যা বলে না। উন্মাদের মত নীরদকুমার তাহার মুখের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইতে গেল।

কিন্তু সহসা ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সরিয়া আসিল, কম্পিতকণ্ঠে কহিল,"আমি তোমায় পত্নীরূপে পাবার যোগ্য নই। কিন্তু মানুষ সকল সময় যোগ্যতা অযোগ্যতা অবিচার করে না, শান্তি, শুধু তুমি বল, তোমার কোন আপত্তি নেই, তার পর আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমার যা বলবার সব বলব। শুনে তিনি আমার ভাগ্য-নির্ণয় করবেন। তুমি শুধু বল, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা হয়নি ?"

শান্তি তথাপি উভয় হস্তে মুখ আবৃত করিয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে রক্ত যেন বরফপিণ্ডের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সে কি বলিবে ? বলিবে কি, সুকু বোধ হয় শুনিতে ভুল করিয়াছে, শান্তি সে ব্যক্তিকে চোখেও কখন দেখে নাই! কিন্তু না, কেমন করিয়া সে এ সব কথা লইয়া আলোচনা করিবে ? ছিঃ, যদি তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন, বাবাকে কিছু বলেন যদি! প্রবল প্রথম আঘাত-জনিত অসহ্য বেদনা সহ্যের সীমার মধ্যে ফিরিলে নীরদকুমার ঈষৎ লজ্জিত হইল। শান্তি মুখ তুলিল না! একটা অব্যক্ত ব্যথায় তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কেন তিনি তাহাকে এমনভাবে ভালবাসিলেন! সেই কি তবে তাঁহার চির-দুঃখের কারণ হইল ? সেও ত তাঁহাকে ভালবাসে, কিন্তু জানিত না, অভিধানে সে ভালবাসার অর্থ কি,—ভালবাসাকে সে শুধু সেই নামেই জানিত, কিন্তু সেদিন মাত্র সেই অজ্ঞাত-মনোবৃত্তি, অস্ফুটবাক শিশুর প্রথম আধ আধ বুলির ন্যায়, চারিদিকের ইঙ্গিতে নবজীবন লাভ করিয়া যেন একটা অপূর্ব্বশ্রুত অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল, এ

মুকুল সূর্য্যমুখী নহে, ইহা কুমুদকলি, সেই মুহূর্ত্তেই সেই আধ খোলা পাপড়িখানি মুদিত হইয়া আসিয়াছে। যতটুকু ক্ষুদ্রই হোক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতার কন্যা কর্ত্তব্যের বোঝা বহিতে কোন অবস্থাতেই অপারগ নহে। সে বোঝা যত ভারি হোক্, শান্তি তাহা বহন করিবেই।

বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে তাহার নিকট একটু অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত কোমল অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে নীরদকুমার বলিল, "শান্তি, মুখ তোল, আমার কথার উত্তর দাও। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না? আমি তোমায় চাই। মনে করোনা, এ ক্ষণিক মোহ! আমার মনের ভাব আমি বেশই জানি। যেদিন যোগেনের বাগানে বনদেবীর মত ফুলরাশির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফুলের মত তুমি দাঁড়িয়েছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তারপর এই কমাস অনেক চেষ্টা করেছি! তুমি আমায় পরাজিত করেছো। আমার গর্ব্বিত আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার ওই দুটি স্বচ্ছ কালো চোখের একটু করুণ দৃষ্টির মধ্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। আমার বর্ত্তমান, আমার ভবিষ্যৎ, সব, আমি তোমার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভ্রম, আমার অহঙ্কার, সব চূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমি তোমার পবিত্রতায় সে সব মলিনতা দূরে ফেলে জটিল জীবনজাল সোজা পথে ফিরিয়ে নিতে চাই, বল, শান্তি, তুমি এ ভিখারীর দান দয়া করে গ্রহণ করবে?"

নীরদকুমার উৎকণ্ঠিত নেত্রে তাহার বেদনা-চিহ্ন-প্রকটিত মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বাসভরে, আবার বলিতে লাগিল, "জীবনের

কোন রহস্য, কোন পাপ, আমি তোমার অজ্ঞাত রাখতে চাই না, সব কথা স্পষ্ট করে বলতে অনেক বিলম্ব হবে, তবে, এখন এই পর্য্যন্ত বলছি, আমি নিষ্পাপ নই। মানুষের স্বভাবজাত ভ্রম ও দুর্ব্বলতা আমাকে পুনঃপুনঃ পথভ্রষ্ট করেছে। আমার জীবনের প্রথম প্রভাতে আর একদিন আমি এমনি শুভাবসর পেয়েছিলাম, কিন্তু শান্তি, অকপটে আমি স্বীকার করছি, চেষ্টা করেও সেখানে আমি ভালবাসা আনতে পারিনি, সে জন্য আমায় দোষ দিও না ;—সূর্য্যকে লোকে পূজা করতে পারে, ভয় ও ভক্তি করতে পারে, কিন্তু সুধাবর্ষী চাঁদকেই সে ভালবাসে। এ কি শান্তি, তুমি কাঁদচো— ?" দারুণ সন্দেহে বিবর্ণ মুখে অবরুদ্ধ প্রায় স্বরে নীরদকুমার সহসা চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি, শান্তি! এ পৃথিবীতে আমার আর কোন আশা নেই। নূতন আশায় যে আবার আকাশকুসুমে মালা গাঁথছিলুম, তাও ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার সব ফুরিয়ে গেছে!"

আহত নীরদকুমার মাতালের মত স্খলিত পদে নিজের পরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে ছিল, চারিদিকের কৌচ কেদারা সাজসরঞ্জামসমেত সমস্ত ঘরটা তাহারই চারিদিকে উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিয়াছে।

শান্তিও কি আঘাত পায় নাই? সে ভাবিতেছিল, তাহার অপরাধের বুঝি সীমা নাই! কি বিশ্বস্ত হৃদয়ে সে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছে। সে কি নিষ্ঠুর! অথচ দেবতা জানেন, সে কত নিরুপায়! সে অন্যের বাগ্দত্তা, উৎসর্গিত ফুল। সে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস সব দিতে পারে, কিন্তু এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে না। ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। ভিতরের

কক্ষ হইতে সুপ্রকাশের কণ্ঠ শুনা গেল,—সে বলিতেছে, "চলনা বাবা, তিনি বসে রয়েছেন। এসে তখন মাকে চিঠি পড়ে শুনিও। জ্যেঠামশায় সকাল বেলা কেন চিঠি লিখতে পারেননি?"

নীরদকুমার স্তব্ধতার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, শান্তি হারমোনিয়মের ডালাটার উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে নীরদ কহিল,"তোমায় আঘাত দিয়েছি, ভাল করিনি, শান্তি! আমার বিশ্বাস ছিল, তুমিও আমায় ভালবাস, তাই আমি এতদূর সাহস করেছিলাম। আমায় ক্ষমা কর।"

শান্তি সহসা তাহার অশ্রুপ্লাবিত করুণ নেত্র তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "আপনি কেন এমন কথা বলছেন। আমাদের উপর রাগ করবেন না! আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা চিরদিনই আপনার কথা মনে রাখবো। আমরা কি এত অকৃতজ্ঞ বলে আপনি মনে করেন? আমরা ত সকলেই আপনাকে ভক্তি করি, সম্মান করি। মা আপনাকে কত ভালবাসেন, আর বরাবরই বাসবেন—"

"ভালবাসা"—কথাটা তাহার মুখ হইতে কোনমতেই বাহির হইল না! ছি, ছি, সে কি নভেলের স্বেচ্ছাচারিণী নায়িকা? কেমন করিয়া সে বলিবে, সেও তাঁহাকে ভালবাসে! কি নির্ম্মল, পবিত্র, সে ভালবাসা!

নীরদকুমার কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাণ্ডু মুখ হইতে অবশিষ্ট শোণিতবিন্দুটুকুও যেন কে শুষিয়া লইল। কিন্তু তখনও সে আশা ছাড়িতে পারে নাই, বুঝি শেষ

মুহূর্ত্তেও একটা প্রত্যাশিত কথা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তাই ভাল, তাই ভাল, শান্তি! তুমি আমায় ইচ্ছা করে যা দেবে তাই আমি মাথায় তুলে নেব। ভক্তি! সম্মান! আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট!"

নীরদ শান্তির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে বলিল, "তবে বিদায় শান্তি, বোধ হয়, জন্মের মত বিদায়। আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত পাত্রে পড়ে সুখী হও। বাস্তবিকই আমি তোমায় পাবার উপযুক্ত নই।"

নীরদকুমার চলিয়া গেল। রজনীনাথের সহিত পাছে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, এই ভয়ে একটু দ্রুত পদেই সে চলিয়া গেল। শান্তি একা সেইখানে ভারাক্রান্ত বক্ষ লইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এ ঘটনা কি সত্য, কিম্বা এতক্ষণ সে একখানা করুণ কাহিনীর একটা পৃষ্ঠা পড়িতেছিল, তাহাও যেন ভাল করিয়া সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল তাহার মসীরেখাহীন অমল হৃদয়ে একটা কালির রেখা পড়িয়া গেল! হায়, এ করুণ অভিনয় অনভিনীত থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল! এ অস্পষ্ট চিত্রখানাকে কেন তিনি অস্পষ্টই থাকিতে দিলেন না?

১৫

নীরদকুমারের নূতন জীবনের নবীন আশা অকস্মাৎ প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন ধূলিলুণ্ঠিত হইল। সে সারাদিন তাহার অংশীদারদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দিন কয়েকের জন্য অবসর চাহিয়া লইল। বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে পথেই

সে স্থির করিল, তাহার আর কোন আবশ্যক নাই। দেশে ফিরিবার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে।

ঘরের মধ্যে জিনিষপত্র সব বিশৃঙ্খল, একটা পোর্টমেণ্ট অর্দ্ধসজ্জিত এবং দুইটা ছোট বড় চামড়ার ব্যাগ সাজান পড়িয়া আছে। নীরদকুমার বাড়ী ফিরিয়াই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য নিকটে আসিলে নীরদকুমার বিরক্ত চিত্তে তাহাকে বিদায় দিল। রান্নাঘরে আহার্য্য লইয়া পাচক প্রতীক্ষা করিতেছে, আহ্বান না পাইয়া আসিতে সাহস করিল না। তা ছাড়া সে জানিত, অর্দ্ধেকেরও অধিক দিন আহারের প্রয়োজন হয় না। নীরদ দ্বাররুদ্ধ করিয়া একেবারে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। কাপড়-চোপড়গুলা পর্য্যন্ত ছাড়া হইল না। আজ হস্ত পদ বা মনের শক্তি এতটুকু খরচ করা তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর যত-কিছু আবশ্যক-অনাবশ্যক খুঁটিনাটি, আজ যেন তাহার নিকট মস্ত বোঝার মত ভারি ঠেকিতেছিল। যেন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই! এখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা রহিল, কি গেল, তাহারও খোঁজ লইবার প্রয়োজন নাই! সব ফুরাইয়া গিয়াছে!

কি ফুরাইয়াছে? কি ছিল, গেলই বা কি? এ কথা অনেকবারই মনে উঠিতেছিল। কি ছিল? অনেক ছিল! অনন্ত স্নেহ, অতুল সম্মান, অপ্রতিহত অধিকার, কি না ছিল? সংসারে মানুষ যাহা পাইলে জীবন ধন্য মনে করে, যাহা কিছু কাম্য, সবই ছিল। কিন্তু সে সব ত অনেক দিনই গিয়াছে! তবে আজ আবার এতদিন পরে ইহা নূতন করিয়া অনুভব করা, কেন? সব ফুরাইল! ফুরাইয়াছে? হাঁ ফুরাইয়াছে, সত্য,

কিন্তু সে কাহার জন্য? কাহার দোষে ফুরাইল? সে স্বেচ্ছায় বৃথা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া সুখের সাধের সংসার ছাড়িয়া, অকৃতজ্ঞের মত, চলিয়া আসিয়াছে! সে অন্ধ, তাই চাহিয়া দেখে নাই! সে স্বার্থপর, তাই বুঝিতে পারে নাই! যে পিতৃহৃদয় স্নেহ-হীন ভাবিয়া সে অভিমানের আগুনে গুমিয়া গুমিয়া পুড়িয়াছে, বাস্তবিক তাহা কত স্নেহময়! স্নেহময় জনকের সে আত্মবিস্মৃত প্রাণ-ঢালা ভালবাসা, তাহা কি তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করিবার? নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন,একবার সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল না! নিজের খেয়ালে, নিজের দর্পে, অনায়াসে সেই স্নেহের নীড় ছাড়িয়া আসিল! না হয়, অন্যায়ই করিয়া ফেলিয়াছিল,—কিন্তু ফিরিবারও ত পথ ছিল। ভুল সে বুঝিয়াছে অনেকদিনই, কিন্তু তাহার সংশোধন করিল কই? কেন, আবার সে কাঁদিয়া গিয়া পিতার বুকে পড়িল না? সে বুক ত তাহারই জন্য পাতা ছিল!

আর, তাহাকে বিপদে আশ্রয় দিয়া, অক্লান্ত শুশ্রূষায় প্রাণপণে যে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই বা সে কি প্রতিদান দিল? এতদিন নীরদ অনেক ভাবিয়াছে! সে যে দয়া, শুধু করুণা করিয়াই শিবানীকে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ভালবাসিতে ইচ্ছাও করিয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীর কন্যার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট পুরস্কার। তারপর স্বেচ্ছায় সে যখন সে অধিকার ত্যাগ করিল, তখন আর নীরদ কি করিবে? ইহাতে তাহার অপরাধ কি? কিন্তু তাই কি ঠিক? কই, সে কথা ত আজ সে ভাবিতে পারিল না! কেবল মনে হইতে লাগিল, সে পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। সে তাহার প্রতিশ্রুতি মন্ত্র, অগ্নি-দেবতা, এবং দেব-মানবের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের অপমান করিয়াছে, আজ শাস্তি তাহার

শোধ দিল। কেন, দিবে না? ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে যথার্থই ত সে এই অপমানদণ্ড ভোগ করিবে! কে বলে, কর্ম্মফল নাই? বেশ করিয়াছ, শান্তি, ভালই করিয়াছ!

নীরদ বিছানায় উঠিয়া বসিল। ভাবিতে ভাবিতে নিজের জন্য সে একটা সাফাই খুঁজিতেছিল। পরাজিত-প্রায় উকিল হাল ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সহসা বিপক্ষ-পক্ষের এতটুকু ছল পাইলে সেইটুকু লইয়াই নূতন উৎসাহে আবার যেমন চাপিয়া ধরে, নীরদকুমারও সেইরূপ হতাশার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজেকে সাফাই করিবার একটা পথ পাইয়া ঈষৎ আশ্বস্তচিত্তে উঠিয়া বসিল, ভাবিল, "শিবানীর প্রতি আমার ব্যবহার বেশি অন্যায় নয়। কেন, সে ত স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে, সে আমাকে ঘৃণা করে। তবে? যে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না, বিনা প্রমাণে পরের কথার উপর নির্ভর করিয়া ঘৃণা করে, তাচ্ছল্য করে, স্বামীই বা কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে! এত অবিশ্বাস, কিসের জন্য? আমি মাতাল? না, দুশ্চরিত্র? কিছু কি সে প্রমাণ পাইয়াছিল? আমি উপার্জ্জনে অক্ষম, এ কথা সত্য, কিন্তু যখন তাহার মা আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেয়, তখন ত অসহায় পথিক ভিন্ন আমি নিজেকে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা রাজপুত্র বলিয়া জাহির করি নাই! এবং আমি ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে বিবাহ করি নাই। বরং সে বিবাহ আমার পক্ষে যথেষ্ট অপমানজনকই ছিল! সে ক্ষতি-সত্ত্বেও তাহার জন্য অনর্থক তাহাদের বাড়ীতে অকথ্য লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, তাহাও সহিয়াছিলাম, শেষে যাহার জন্য সহিলাম, সেও আমাকে ঘৃণা করিল, তাচ্ছল্য করিল! স্বামীকে

মাতা কন্যার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভাণ্ডার গৃহের এক পার্শ্বে জলের কলসী নামাইয়া রাখিয়া, নিজের পুরাতন মটকা সাড়ি ও ফুলশূন্য ফুলের সাজি লইয়া বাহিরে আসিলেন, আর্দ্র বস্ত্র রকের একদিকে লম্বিত বাঁশের উপর ফেলিয়া কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবি, তুই চট্ করে ডুব দিয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দে, শেঠ-মন্দিরে আটটার ঘড়িতে ঘা পড়লো, আমি চল্লাম, নীরদ আসে তো ভাঁড়ারের তাকের ওপোর মুড়কি আছে, তাই চাট্টি দিস, না হয় তো পেসাদি প্যাঁড়া বুঝি আছে তাই একটা দিস, বাবুর আজকাল মুখে মুড়কি রোচেনা, রোজই পড়ে থাকে দেখতে পাই।"

"আচ্ছা" বলিয়া শিবানী তেলের বাটি পাড়িয়া চুল খুলিতে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী উঠানের একপার্শ্বে কৃষ্ণকলি ও টগর গাছ হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিতে করিতে "যশোদা রাখিলা নাম যাদু বাছা ধন, শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দেরি নন্দন" গাহিয়া কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি সমাপ্ত হইলে রান্নাঘরের দাওয়ায় তাল পাতার চেটাই পাতিয়া সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী টেকোয় করিয়া সুতা কাটিতেছিলেন। কাজ-কর্ম্ম সব সারা হইয়া গিয়াছে, এ বেলার জন্য ডাল ও ব্যঞ্জন ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে, রান্নাঘরে শিকল দিয়া শিবানী নিকটস্থ যমুনার ঘাটে হাত পা ধুইতে গিয়াছে।

বর্ষাকাল হইলেও আজ আকাশে এখনও মেঘ জমে নাই, চড়চড়ে রৌদ্রে ঘাটের পাথর তাতিয়া উঠিয়াছে, কয়খানা বাসন লইয়া শিবানী ধীরে ধীরে সেই রৌদ্রতপ্ত সোপান অতিক্রম করিয়া জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল, আজ তাহার মনটা, কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া আছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

অপমান করা, স্ত্রীর ধর্ম্ম নয়! আমি সেখানে বেশী অপরাধী নই।"

অপরাধীর পক্ষে "অপরাধী নহি,"—ইহা ভাবিতে পাওয়াও অল্প আরামের নহে! বুকের ভারটা যেন এ চিন্তায় অনেকখানি কমিয়া যায়। কণ্ঠের কাছ অবধি যে নিশ্বাসটা রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠনালিকে চাপিয়া রাখিয়াছে, তাহা যেন কতকটা হাল্কা হইয়া পড়ে! বৎসরখানেক হইল, কোচিনে যখন কলেরা রোগে সে মরণাপন্ন হইয়াছিল, সেই সময় একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী-দ্বারা পত্র লিখাইয়া রেজিষ্ট্রী করাইয়া নীরদ হাজার টাকা বৃন্দাবনে পাঠায়, সেটা তখন সে স্নেহ বা ভালবাসার জন্য করে নাই। সেটা তাহার ঋণ-পরিশোধ। তার পর মৃত্যু আসিয়া মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া, কে জানে, কি ভাবিয়া, সরিয়া গেল। যেমন আসিয়াছিল, তেমন রিক্তহস্তেই সে ফিরিল, বরং একটু শিক্ষা দিয়া গেল। এইটুকু বুঝাইয়া দিয়া গেল যে, আত্মীয়ের একটু গঞ্জনা সহিতে অভ্যস্থ হইলে নিদারুণ তৃষ্ণায় শীতল জল ও প্রবল যন্ত্রণায় অক্লান্ত শুশ্রূষা অতি সহজেই মিলে। রোগমুক্তির পরই দ্বিতীয় পত্র লিখিবার একটা আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু পরক্ষণে সে আগ্রহ নিভিয়া গেল। আবার সেই দারিদ্র্য লইয়া তাহার নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা হইল না, বরং তাহাদের সম্পর্ক মিটিয়া গিয়াছে, ইহা এক রকম ভাল। যদি কখনও অবস্থা ভাল হয়, তখন তাহাকে পত্র লিখিবে, ইহাই সে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু যখন অবস্থা ফিরিল—তখন দৈবগতিকে ইচ্ছাও ফিরিয়া গেল। শান্তি আসিয়া শিবানীর আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। সেখানা শিবানীর জন্য পাতা হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহাকে জু,

তাহাতে বসিতে দেওয়া হয় নাই, তাহা শূন্যই পড়িয়াছিল ; আর যেটুকু সে দখল করিয়াছিল, এতদিনে তাহাও বুঝি তামাদি হইয়া গিয়াছে।

যেখানে দাবী বেশী, অত্যাচারও সেখানে অধিক। শিবানীর প্রতি ক্রোধ ত অভিমান নয়, সেজন্য তাহার কথা মনের চারিপাশে কেবল ভাসিয়া বেড়াইত,—এমন করিয়া হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে কাটিয়া বসে নাই। কখনও তুলাদণ্ডের মাপে তাহার অন্যায়ের দিকটা ঝুঁকিয়া পড়িত, আবার কখনও বা নিজের দিকটায় বেশী ভার দিত। তাহার জন্য খুব বেশী মন দিবার অবসরও ছিল না। কিন্তু আর পারা যায় না! এখন কেমন করিয়া একবার সে তাহাকে দেখিতে পাইবে? এখন ত আর সে গৃহহীন, মূর্খ বা অক্ষম নয়, সুযোগ সত্ত্বেও সে তাহার জন্য নিজের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আশা ত্যাগ করিয়াছে, অথচ এ দীর্ঘ সময় বৃথা অপব্যয় করে নাই, যেখান হইতে সে আসিয়াছিল, এখন যদি সেইখানে আবার ফিরিয়া গিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কেহই তাহার দিকে করুণার চক্ষে চাহিয়া বলিবে না, 'আহা! বৃথা গর্ব্বে নিজের কি সর্ব্বনাশই করিয়া গেল!' সে বাহিরে আসিয়া নিজে নিজের পথ করিয়া লইয়াছে! স্বাবলম্বন অভ্যাস করিয়াছে, কঠোর পাঠাধ্যয়নে দুস্তর পরীক্ষা-সাগর নির্ভয়ে পার হইয়া আসিয়াছে! সে আজ মানুষ! সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিতে পারে, গিয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়া ফিরে নাই। ঘরে বসিয়া যাহা না হইত, তাহা সে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, ক্ষমার অযোগ্য সে হইবে না! কিন্তু এ সব তর্কের কথা! হৃদয়ের নহে! নীরদ সে কথা,

বলিতে পারে, কিন্তু তাহার বক্ষের মধ্যে যে একটি অনুতপ্ত পুত্র লজ্জাকুণ্ঠিত প্রাণে ক্ষুধিত সন্তপ্ত চিত্তে স্নেহ-তৃষ্ণায় হাহাকার করিতেছিল, সে কোন্ স্পর্দ্ধাভরে এমন কথা বলিতে প্রশ্রয় দিবে! দিনের পর দিন ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। সঙ্কোচ ও সংশয়ের বাধা আর কাটিতেছিল না। যদি ক্ষমা না মিলে?

তারপর বিধাতা সুবর্ণ-সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। নীরদ ভাবিল, তাহার অদৃষ্টাকাশ হইতে অগ্নিমুখী ধূমকেতুটা বুঝি এত দিনে নামিয়া গেল। অকস্মাৎ এই ভারতের এক প্রান্তে মাদুরায় শান্তির সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে তাহার সমুদয় মনঃপ্রাণ যেন সেই মুহূর্ত্তে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জোয়ারের জলের মত উথলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ইহার চেয়ে বিচিত্র ঘটনা মানব-জীবনের ইতিহাসে অল্পই ঘটিয়াছে! শান্তিকে যদি সে পায়, তাহা হইলে অনায়াসে আবার সে নিজের পরিত্যক্ত অধিকারে ফিরিয়া যাইতে পারিবে, এবং নিজের অপরাধের কালিমা পুণ্যময়ী বালিকার গুণে মুছিয়া আবার তেমনই স্নেহের দাবী লইয়া পিতার নিকট দাঁড়াইতে পারিবে! তবে শান্তিকে পাইবার পক্ষে তাহার একমাত্র বাধা, শিবানী! তা সে এমনই কি প্রবল বাধা? কোথায় এক দরিদ্রা অনাথার অশিক্ষিতা কন্যা, শিবানী,—সে কি শান্তির প্রতিদ্বন্দিনী হইবার যোগ্যা! থাক না, সে পড়িয়া! যখন বিবাহের পর একদিন অত্যন্ত সাবধানে শান্তির কোমল হাতখানি হাতে তুলিয়া তাহার কালো চোখের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষমা চাহিয়া সব কথা শান্তিকে সে খুলিয়া বলিবে, তখন শান্তি তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবে না! সে যদি ক্ষমা করে, তবে আর কে করিবে না? দুইবার বিবাহে আর

কাহার ক্ষতি? রজনীনাথ? কন্যা ক্ষমা করিলে, পিতা কি করিবেন না? নীরদ ঠিকই বুঝিয়াছিল, একবার যদি সে লাল সাড়ি ও সোনার সিঁথিময়ূর-পরা কল্যাণময়ী শান্তিকে তাহার রেশমী চাদরের গ্রন্থি-বন্ধনে নববধূবেশে পাশে লইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে দুইবাহু প্রসারণ করিয়া ক্ষমা তাহার জন্য আগাইয়া আসিবে। তাহার কল্যাণবর্ষী স্নিগ্ধ হাসিটুকুতে তাহাদের কঠিন কৈফিয়ৎ মিটাইয়া দিয়া এ দীর্ঘ তাপদাহ মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া দিবে। সে বুঝিয়াছিল, শান্তির উপরই তাহার সমুদয় সুখশান্তি এখন নির্ভর করিতেছে। তাহাকে পাইতেই হইবে! সেই সঙ্গে রজনীনাথকে দ্বিতীয় পিতৃস্বরূপ পাওয়াও অল্প প্রার্থনীয় নহে।

কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সকল আশা, সকল ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া তাই নীরদ ভাবিল, সব শেষ! শুধু শান্তি নয়, শান্তির সহিত তাহার জীবনের সুখশান্তি সবই গেল! এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? এখন কি আর রজনীনাথকে সে বলিতে পারে, আমি শান্তিকে চাহি! সুকুর মুখে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিবার পর? যদি রজনীনাথ পূর্ব্ব কয়বৎসরের ইতিহাস শুনিতে চাহেন? নীরদকুমার মিথ্যাবাদী নহে, তাহা হইলে, সকল কথাই তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। সে সকল কথা শুনিবার সময় রজনীনাথের ওষ্ঠপ্রান্ত তীব্র পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট হাস্যের আভাষে কি গভীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়াই সে যেন লজ্জায়, ক্ষোভে মরিয়া গেল। বসুমতীর প্রবল স্নেহ কেমন করিয়া গভীর ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইবে, শান্তি তাহাকে কি মনে করিবে,

সেই কথাগুলা ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। আত্ম-প্রকাশে এখন কেবল শান্তিরই সুখ-শান্তি নষ্ট হইবে!

সে ভাবিল, যে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাকে স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতেই হইবে। কূলে উঠিবার চেষ্টা এখন বৃথা। নিজের স্নেহ-সিংহাসনে সে পদাঘাত করিয়া আসিয়াছে, সুখের নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, এখন সে নষ্ট নীড়ে ফিরিবার আর পথ নাই! সেখানকার সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়া গিয়াছে! সে আর তাঁহার কেহ নহে, তিনিও তাহাকে চাহেন না। বিশেষতঃ এ মিলনে এখন আর কাহারও সুখের আশা নাই! রজনীনাথ তাহাকে কন্যাদান করিবেন না। শান্তি তাহাকে চাহে না। আর, তিনি? তিনি এখন তাহার চেয়ে শান্তিকেই বেশি চাহেন। না হইলে, এত শীঘ্র পোষ্যপুত্র লইয়াছেন? হায়, আজ কোথায় তাহার সেই স্নেহময়ী মা, যাঁহার অভাবে জন্মের মত সে বহিয়া গেল!

নীরদ ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া শেষে সে স্থির করিল, যখন পৃথিবীর মধ্যে কেহই তাহাকে চাহে না, কাহারও কোন প্রয়োজনে সে লাগিবে না, তখন তাহার সকল দাবী, সকল সত্ত্ব আজি হইতে সে নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ করিবে। এখনও পর্য্যন্ত যাহারা এ সংসারে তাহার একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র স্নেহাস্পদ, তাহারা সুখী হোক, সে সুখে হতভাগ্য সে বাধা দিবে না!

ভাগ্য-পরীক্ষার ছলে, হিংসায় পড়িয়া, আর একজনের সুখের প্রদীপ সে নিভাইয়া দিবে না! হেমেন্দ্র দরিদ্র, নিঃস্ব। লক্ষ্মীপুরের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার পক্ষে শান্তিকে পাওয়া

অসম্ভব। কিন্তু শান্তি তাহাকে ভালবাসে! শান্তি তাহারও হইবে না, হেমেন্দ্ররও হইবে না, ইহাতে তাহার কোন লাভ নাই। যখন রজনীনাথ তাহাকে চাহে না, শান্তি তাহাকে চাহে না, তখন আবার কিসের পরীক্ষা? যে পরীক্ষায় পরাজয় সুনিশ্চিত, সে পরীক্ষার প্রয়োজন? কেন, নিজের স্বার্থের বৃথা চেষ্টায় সে পরের সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবে? না, তাহাতে আর কাজ নাই, শান্তি যাহাকে চাহে, তাহারই সে হউক, সে সুখী হউক!

নীরদ ভাবিল, শান্তির আশা ছাড়িলেও রজনীনাথের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু না, সে কর্ত্তব্যও ফুরাইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থানে এখন নূতন লোক নূতন স্নেহে পুষ্ট হইতেছে। যে অপ্রতিহত স্নেহাধিকার সে মূঢ়ের মত ছাড়িয়া আসিয়াছে, আজ তাহা চিরদিনের জন্য তাহার নিকট হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে আর তাহার স্থান নাই। কতদিন,—কতদিন সে তাহার স্থান দখল করিয়াছে? হয় ত অনেক পূর্ব্বে, হয়ত এতদিনে সে তাহার একমাত্র প্রাপ্য, তাঁহার সেই অতুল স্নেহরাশির সমস্তটাই অধিকার করিয়াছে। যে স্মৃতি তাহার একমাত্র আনন্দের, যাহা এখনও বিপদে তাহার চিত্তে ধৈর্য্য ও বল প্রদান করে, যে হস্তের কল্যাণময় অদৃশ্য স্নেহ-স্পর্শ নিদ্রা-জাগরণে এখনও সে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া পুলকে কণ্টকিত হয়, অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, সে স্নেহ, সে স্পর্শ, সে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়, এখন আর তাহার নাই, সে সমস্তই এখন হেমেন্দ্রর! বেদনায় নীরদের বুক ফাটিয়া পড়িতে চাহিল! ইহার চেয়ে তাহার পাপের সহজ শাস্তি আর কি হইতে পারে?

ভোরের বেলা ভৃত্যকে গাড়ি তৈয়ার করিতে বলিয়া নীরদ কাগজপত্র লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিল, তার পর ভ্রমণের পোষাকে বাহির হইয়া গেল। ভৃত্যকে বলিল, "যদি কেউ আমার সন্ধান করে ত, বলিস, বিশেষ দরকারে আমি রামনাদে চল্লুম; দিন পনেরো সেখানে আমার দেরি হবে, হয় ত বেশিদিনও হতে পারে।"

ভৃত্য বিস্মিত হইয়া বলিল, "জিনিষপত্র ?"

নীরদ অধীরভাবে মাথা নাড়িল, কহিল, "কিছু না, কোন দরকার নেই।" মনের বিষম উত্তেজনায় আবেগে আর একবার সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া অকূলে জীবনতরী ভাসাইয়া দিল।

১৬

যথাসময়ে আলোকমালায় মণ্ডিত পুরপ্রাঙ্গণে বাজনাবাদ্য, এবং বামা-কণ্ঠের হুলুধ্বনি ও শঙ্খরোলের মধ্যে শান্তির বিবাহ হইয়া গেল। বর হেমেন্দ্রনাথকে দেখিতে বেশ সুন্দর! তেমন সুন্দর ছেলে সদা-সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। জামাই দেখিয়া বসুমতীর হৃদয়ের ক্ষোভ অনেকটা নিভিয়া গেল। তথাপি আর একটি উন্নত মহিমাময় মুখ চকিতের মত যে তাঁহার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

বিবাহের পূর্ব্বেই শান্তি অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছিল। সে আর তেমন করিয়া কারণে-অকারণে যখন-তখন হাসে না, হাসিলেও সে হাসি যেন তাহার ওষ্ঠাধরের সীমা ছাড়াইয়া চোখে মুখে উথলিয়া উঠিতে চাহে না। সুকুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া সে খেলিয়া বেড়ায় না, পিতাকে যাহা-খুসী প্রশ্ন করিয়া বিব্রত

করিয়া তুলে না। বিবাহের পাত্রীর উপযুক্ত সে স্থির ও গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। সে যে নীরদের মত লোকের এতটা মন-কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে নিজের প্রতি তাহার অত্যন্ত বিরক্তি ধরিয়াছিল। নিজের কথা কখনও সে ভাবিতে শিখে নাই, তাই আজও তাহা ভাবিল না।

বুকের মধ্যটা কেমন থাকিয়া থাকিয়া হু-হু করিয়া উঠে, আর কেবলই কান্না পায়। মধ্যে মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া সে ভাবে, আর কয়দিন পরেই কোন্ অচেনা ঘরে চলিয়া যাইবে, মাকে বাবাকে দেখিতে পাইবে না, সুকুকে কেমন করিয়াই বা সে ছাড়িয়া থাকিবে? কখনও বা বালিসে মুখ গুঁজিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কোথা হইতে চোখে অজস্র জল আসিয়া পড়ে। বাবার খাবার আনিয়া সে চুপ করিয়া ম্লানমুখে বসিয়া থাকে। মার গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে করিতে অন্যমনা হইয়া যায়। সকল সময় হয়ত সুকুরই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। মণিমালা বিদ্রূপ করে, "একদিন সবারই বিয়ে হয় লো, তা বলে, আর কেউ এত করে বরের ভাবনা ভাবে না।" সুকু রাগিয়া বলে, "যাও দিদি, তুমি যেন কি হচ্ছ! তা হলে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় নিয়ে যেও তুমি, ঐ কুনো বেরালটাকে।" মাতা সস্নেহে অশ্রু মুছিয়া ভাবেন, "শ্বশুর-বাড়ি যাবার ভয়ে মেয়ে আমার আধখানি হয়ে গেল। মাগো, আমি আমার লতিকে ছেড়ে কেমন করে থাকব! আমার বাড়ি-ঘর সব অন্ধকার হয়ে যাবে। কোথায় যাবে? কে সেখানে খাবার দেবে? যত্ন-আত্তি করবে কি না? জামাই

না জানি কেমন চোখে দেখবে?" সুখের মধ্যে এইরূপ দুঃখের ভয়ের যে কত ভাবনা, তাহা শুধু মাতৃহৃদয়ই বলিতে পারে।

বিবাহের পর যখন গোলাপী রঙ্গের বেনারসী সাড়ি-পরা, সর্ব্বাঙ্গে স্বুবর্ণালঙ্কারভূষিতা অশ্রুমুখী নতাননা শান্তি সঙ্গিনীপরিবেষ্টিতা হইয়া ধীর অনিচ্ছুক গতিতে গাঁঠছড়া-বাঁধা বরের সহিত পিতার পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন অদম্য অশ্রুজলের প্রবাহে স্থির-গম্ভীর-প্রকৃতি রজনীনাথের দৃষ্টি রোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার কম্পিত দক্ষিণ করে ধীরে ধীরে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া সুগভীর স্নেহের ধারায় তাহা সিক্ত করিয়া অন্তরের আশীর্ব্বাদের সহিত তাঁহার স্নেহাধারদ্বয়ের মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক উভয়ের মস্তক চুম্বন করিলেন, তারপর পুরমহিলা-গণের আদেশে কন্যার স্বর্ণমণ্ডিত দক্ষিণ হস্ত এক হস্তে উঠাইয়া লইয়া অপর হস্তে জামাতার হস্ত ধারণ করিয়া উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া গদ্-গদ্ কণ্ঠে জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হেম! আমার শান্তিকে আজ আমি তোমার হাতে দিলাম। এতদিন সে আমার ছিল, আজ হতে তোমার হ'ল। তুমি তাকে বিপদে-সম্পদে রক্ষা করো, পালন করো, বালিকার সমস্ত ত্রুটি-অপরাধ মার্জ্জনা করে তাকে নিজের মনের মত গড়ে নিও। মা আমার, চিরসুখী হও।" তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া আনন্দ-মিশ্রিত বেদনার অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। পিতৃহৃদয়ের সেই অশ্রুসিক্ত অনন্ত আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল বন্ধনটিকে আরও পবিত্র, আরও নিবিড় করিয়া তুলিল। তীর্থসঙ্গমের মত পবিত্র সেই সম্মিলন যেন জাহ্নবী-সলিলস্পর্শে পবিত্রতর হইয়া উঠিল। সেই সকরুণ দৃশ্যে

দর্শকবৃন্দের নেত্রও ছল ছল করিতে লাগিল। তার পর রজনীনাথ কন্যার হস্ত ধরিয়া বৈবাহিকের নিকট আসিলেন। শ্যামাকান্তের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমার লতিকে আমার মাকে আপনার কোলে তুলে দিলাম। আমি জানি, সেখানে সে খুবই সুখে, খুবই নিরাপদে থাকবে, তবু বাপের প্রাণ কিছুতে প্রবোধ মানে না। বাপের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, আপনার নিকট প্রার্থনা—"

শ্যামাকান্ত ব্যস্তভাবে বাধা দিলেন, "ভাই, অমন কথা বলো না, আমি যে তোমার কাছে কত ঋণী, তা শুধু মা জগদম্বাই জানেন। তুমি আমায় যা দিয়েছ, এ পৃথিবীর মধ্যে কেউ আমায় তা দেয়নি। তুমি সন্তানহীনকে সন্তান দিয়েছ। এসো মা লক্ষ্মী! কাঁদছ কেন, মা! বাবার কাছ থেকে জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে কি কাঁদতে আছে, মা! তা হলে তোমার ছেলে যে দুঃখ করবে!"

অশ্রুজলে ভাসিয়া নববধূবেশে শান্তি তাহার আজন্মের ঘর বাড়ি, চিরদিনের স্নেহের নীড় ছাড়িয়া অপরিচিত সঙ্গীর সহিত কোন্ অজানা গৃহোদ্দেশে চলিয়া গেল! গাড়িতে উঠিবার সময়ও সে তাহার বাবাকে দুই হাত দিয়া এমন ভাবে জড়াইয়া রহিল যে, সে নির্ভর বাহুপাশ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই স্নেহপালিতা ক্ষুদ্র লতাটি যে প্রকাণ্ড মহীরুহের আশ্রয়ে এতদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই নিরাপদ কক্ষ ছাড়িয়া কোথায় কোন অপরিচিত উদ্যানক্ষেত্রে আজ প্রোথিত হইতে চলিয়াছে! সেখানকার ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি-বজ্র হইতে কি সে এমনই ভাবে রক্ষা পাইবে?

ঘাট প্রায় জনশূন্য। দুই একজন ব্রজবাসিনী শুধু তাহাদের সুগৌর বর্ণ নীলজলে অর্দ্ধাবরিত করিয়া স্নান করিতেছিলেন। দুই চারিটি বালক কূর্ম্মবংশীয়গণের সহিত অত্যধিক সৌহার্দ্দ্যবশতঃ স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। শিবানী বাসন মাজিয়া জলে নামিল, বানরের ভয়ে, মার্জ্জিত বাসনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শীতল কালো জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল।

"হ্যালা শিবি, তোর কেমন ধারা আক্কেল বল্ দেখি ? গেলি তো আর ফিরতেই চাস্ না, কচ্ছিলি কি ? যেখানে যাবি, যেন বাঘের মাসি, রায়েদের বউটো বুঝি এসেছিলো ?"

শিবানী ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে নিঙ্গড়াইতে উত্তর দিল, "কেউতো আসেনি মা। কেন, আমার কি বেশি দেরী হয়ে গেছে ?"

"কি জানি, বাছা ? নীরদ তো চটে-মটে বেরিয়ে গেলো, চাবি খুঁজলে, পেলেনা, পান চাইলে, তা কে এখন পান সাজতে বসে— বল্লাম,—'একটা লাগিয়ে নাও, নয়তো সে এসে দেবে, একটু দাঁড়াও এতো তাড়া কিসের, টেরেন ফেল্ তো হবে না'। তা শোনা হলোনা, বল্লেন,—'বাজার থেকে কিনে খাবো, বাড়ীর পান আর খাবোনা' ! এমন মাড়োয়ারি গোরার মত মেজাজ নিয়ে কি বাপু পরের ঘরে চলে ? আমি যাই ভাল মানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তাই,—আর কেউ হলে টেরটি পেতেন। চাকরী নেই, বাকরী নেই, বার মাস ঘরে বসে কুঁড়ো পাথর ঠাস্‌বেন, আর পান থেকে চুন খসলেই অমনি নবাবপুত্তুরের গসগসানী দেখে কে ? তবু যদি না পরদোয়ারী হতেন !"

শিবানী আর্দ্র বস্ত্রাঞ্চলে অসম্বরণীয় দুই বিন্দু অশ্রু নিঃশব্দে

সুপ্রকাশ তাহার নূতন জরীর পোষাক পরিয়া দিদির সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। দিদির এত কান্না-কাটি সে একটুও পছন্দ করিতেছিল না। এমন সুন্দর জামা কাপড়, এত গহনা, ফুলের মালা পরিয়া, এমন উৎসব সমারোহের মধ্যে চতুরশ্বযানে চড়িয়া দেশান্তর-গমন,—ইহার মধ্যে যে কান্নার কি আছে, সুকু তাহা বুঝিয়াই উঠিতে, পারে না! আশ্চর্য্য! মা বাবা পর্য্যন্ত কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন! সে যেদিন বর সাজিয়া অমন মুক্তার মালা, হীরার আংটি পরিয়া এমনই ধূমধামে বধূ আনিতে যাইবে, সেদিন যদি মা বাবা ও দিদি এমন করিয়া কাঁদিতে বসে, তাহা হইলে সে কিন্তু ভারি রাগারাগি করিবে! দিদি যে এখনও অত্যন্ত ছেলেমানুষ ও নির্ব্বোধ রহিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া তাহার প্রতি সুকুর একটু করুণাও হইল। সে দিদিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দিদির কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "দিদি, কেঁদো না ভাই! আমি কাল কিছুতেই ফিরে আসব না, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে গোলোকধাম আর দশপঁচিশ নিয়েছি, সেখানেও খেলা হবে। তাদের বাগানে লুকোচুরি খেলতে যদি না দেয় ত, ছাদে না হয় খেলব।"

শুনিয়া দিদির অশ্রুপরিপ্লুত মুখখানি, একটা স্নেহ-করুণ হাস্যের আভাষে, বর্ষাকাশে মৃদু সূর্য্যালোকের ছটার মত, ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তার পর আবার তেমনই সমারোহের মধ্যে সে সেই ইন্দ্রপুরী-তুল্য প্রাসাদে শত হুলুধ্বনি ও মঙ্গলাচারের মধ্যে সাগ্রহে সাদরে গৃহীত হইল। সেই পুরাতন প্রাসাদ আজ অনেকদিন

পরে আপনার শোকমলিন অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া নূতন শোভায় সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। একটি হৃদয় ভিন্ন আজ সর্ব্বত্রই নূতন চিন্তা। হায়, দুর্ভাগ্য বিনোদ! এ কি তোমার দুর্জ্জয় অভিমানের পরিণাম!

ক্রমে ফুলশয্যা, বৌভাত প্রভৃতি বিবাহের আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় মঙ্গল অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রে বেদমন্ত্র এবং গুরুজনের আশীর্ব্বাদ বালিকা শান্তির ক্লান্ত হৃদয়ে একটি নূতন রেখাপাত করিল। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় সকলের পুনঃপুনঃ অনুরোধে যখন সে আপনার লজ্জামুকুলিত চক্ষু তুলিয়া সম্মুখস্থ চক্ষে স্থাপন করিতে গেল, ঠিক সেই সময় মণিমালার একটা কথায় তাহার হৃদয় অজ্ঞাত ব্যথায় ক্ষুব্ধ চমকিত হইয়া উঠিল! মুহূর্ত্তে সম্মুখের দৃশ্যপট অপসারিত করিয়া একটা কাতরতাপূর্ণ হতাশ দৃষ্টি, করুণ মুখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। চমকিয়া সে চক্ষু নত করিল, আর সেদিকে চাহিতে পারিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে আদর করিয়া হেমেন্দ্র যখন তাহার মুখের দীর্ঘ ঘোমটা খুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মৃদু হাসিয়া স্বহস্তে ফুলের পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া বলিল, "ভারি গরম, কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘেমে উঠ্‌ছ যে, খুলে ফেল", তখন সে, চকিত নত নেত্র তুলিয়া আধ-অপসৃত ঘোমটার মধ্য হইতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ঘোমটার মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া দিল। সে দেখিল, চকিতের মধ্যেই দেখিল, সেই মুখখানি অত্যন্ত সুন্দর। হেমেন্দ্রও তখন তাহার দিকে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টি যদিও তেমন করুণ, তেমন উজ্জ্বল, তেমন মর্ম্মস্পর্শী নহে,

তথাপি শান্তি মনে মনে স্বীকার করিল, সুন্দর পুরুষ! কাহারও সহিত সে এ মূর্ত্তির তুলনা করিল না, করিলে কোনখানে গলদ ঘটিত, বলা যায় না। সে কিন্তু নত মস্তকে নীরবে এই অপরিচিতকে চিরনির্ভর করিয়া ধরিল! মনে পড়িল, বাসরে একজন ঠানদি বলিয়াছিলেন, "লতির আমাদের তপস্যা ভাল, যেন মদন-রতির মিলন হয়েছে।" হেমেন্দ্রও মুগ্ধ নেত্রে তাহার নব-পরিণীতাকে দেখিতেছিল, সে-ও স্বীকার করিল, কুন্দ কিম্বা সূর্য্যমুখী, রেবেকা কিম্বা আয়েসা এমন সুন্দরী ছিল কি? তাহাদের বর্ত্তমান সংস্করণেরা ত অত রংচং লাগাইয়াও ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। হাঁ, স্ত্রী হয়ত এমনই হওয়া উচিত।

তারপর ধীরে ধীরে নবদম্পতীর মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। ক্রমেই যেন শান্তির মন হইতে পূর্ব্বকার সেই ভার-বোধটা সরিয়া মন হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল। পিত্রালয়ে ফিরিবার দিন হেম তাহার কোমল হাতদুইখানি আপনার হাতে চাপিয়া ম্লানভাবে বলিল, "চল্লেম শান্তি, আবার কবে দেখা হবে, কে জানে!"

হেম চলিয়া গেলে তাহার মনটা যে একটুও কাতর হয় নাই, এমন নহে। পিতৃগৃহে আসিয়া কয়দিনকার বন্দিত্বের শোধ সে কড়ায়-গণ্ডায় মিটাইল। প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীরা তাহার অপর্য্যাপ্ত হীরা-মুক্তার দিকে লুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে চাহিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল। মাতা বলিলেন, "গহনাগুলো ভারি সেকেলে, কিন্তু জিনিষ বটে।"

পিতা বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! একটা মানুষে এত সব

পরতে পারে ? ওরে বুড়ি ! এমন কর্ম্ম কখনও করিস্‌নি, মাথা ধরে উঠবে।"

বসুমতী ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন, "তোমার এক কথা, মাথাই বা ধরতে যাবে, কেন ? পরবে না ত কি গহনাগুলো যক্‌কে দেবে ?"

রজনীনাথ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেমনই বা মাথা তোমাদের, কে জানে ! আমার তো ওগুলো দেখলেই মাথা ধরে ওঠে। আমার সুন্দর মেয়েটিকে কুৎসিত করবার এ এক ফন্দি।"

মণিমালা আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া বরের কথা জিজ্ঞাসা করিল, এবং পীড়াপীড়ির চোটে সব কয়টি কথা বাহির করিয়া শেষে বিস্ময়-প্রকাশ করিল, "ওমা ! শুধু ঐ রকম ছাড়া ছাড়া কথা ? তোর ভগ্নিপতি কিন্তু ভাই ওর চেয়ে অনেক কথাবার্ত্তা বলতেন। রাত্রে ঘুমুতেই পেতাম না ! হেম অমন কেন ?"

শান্তি লজ্জায় রক্তিম হইয়া কহিল, "দূর সে বুঝি ভাল !"

মণিমালা তথাপি ছাড়িল না, হাসিয়া বলিল, "তখন ভাল লাগত না তা সত্যি ! যাই বলিস ভাই, তোর বর কিন্তু বেরসিক, এ দিকেত দিব্যি সৌখীন মানুষ, কিন্তু ধরণটা যেন কেমন কাঠ-কাঠ, বড্ড গুমুরে, বোধ হয় ! তা বড় লোকের ছেলে হবে নাই বা কেন ? সে যেমন আমাদের নীরদকুমার, তার কি মিষ্টি ধরণটি, অমনটি আর কারও দেখা যায় না। অথচ কেমন তেজী লোক।"

শুনিয়া শান্তির আরক্ত মুখ মুহূর্ত্তে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

১৭

দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। একটা আমগাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া মালী ও ভৃত্যদের ছেলেরা ঘুঁটি খেলিতেছিল। মালীর গৃহমধ্যে তালপাতের চেটাই পাতিয়া মালিপত্নী নিদ্রামগ্না। দক্ষিণে বৃক্ষচ্ছায়া-ঘেরা পুষ্করিণী, চারি পার্শ্বে বাঁধা ঘাট এখন জনশূন্য। কেবল একধারে ঘাটে বসিয়া একটা নিষ্কর্ম্মা বালক জলের মধ্যে বঁড়সি ডুবাইয়া পাষাণমূর্ত্তির মত চুপ করিয়া বসিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। জমিদারের কোলাহলমুখরিত প্রকাণ্ড বাড়ি দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবসরে অনেকখানি সংযত। যেখানে কোলাহলের প্রধান আড্ডা, সেই দাসীমহলেও এখন একজনের ভিন্ন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। উচ্ছিষ্টাভিলাষী কাকের দল সে শোধটা তুলিয়া লইতেছিল। বিধু ঝি জোরে জোরে পিত্তলের উপরে তেঁতুল ঘর্ষণ করিতে করিতে সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া বলিল, "মর্, হতভাগা কাকগুলো কি অলুক্ষুণে ডাকই ডাকতে নেগেছে। শুনলে যেন গা শিউরে উঠে।" চন্দরা হেঁসেল নিকাইয়া এইমাত্র বাহিরে আসিয়াছে। সঙ্গিনীর টিপ্পনীতে সে টীকা কাটিল, "অলুক্ষুণে বলে অলুক্ষুণে! বামুনদিদি বলে—যেবার আমাদের দাদাবাবু নিউদ্দেশ হয়ে যায়, সেবার নাকি আমাদের এই পোড়ারমুখোরা এমনি ডাক ডেকেছিল, শুনিসনি নাকি বিধি! তুই তো সেই বছরই এলি।"

বিধু পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে গিয়া দেখিল, তাহার শিশুকাল হইতেই কাকের দল এমনই উৎসাহে গৃহস্থের ঘর

সরগরম রাখিয়া আসিতেছে। কোনদিনই ইহার ব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। কিন্তু মুখে তাহা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর বহুদর্শিতা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে অপমানিত করা হয়, সেইজন্য সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ওমা তা আর মনে নেই, সে এক কাণ্ড! তা দেখ ভাই, সেদিন আবার ঐ পুরোণো পাঁচিলটের পাশে একটা শেবা ডাকছিল, তা যত বিদঘুটে জানোয়ারগুলো তো মরতে আর জায়গা পায় না।"

বিধু ঝাঁটা আস্ফালনপূর্ব্বক সেই কুদর্শন কৃষ্ণাঙ্গ জীবদলকে তাড়না করিয়া সমস্বরে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "সত্যি বলেছ দিদি, হতভাগাগুলো ত মরতেও জানে না! এই যে পিরথিমিতে এত ব্যায়রামস্যায়রাম হচ্চে, পটাপট মানুষ মরচে, তা কাকগুলোকে ত মরতে দেখিনে! পেলেগ না ফেলেগেতে ইঁদুর মরে, তা কাকগুলোকে কি মরণও দেন নি গা! এমন একচোখো ঠাকুরও ত দেখিনি। ছিষ্টিতে এত মনিষ্যি এত জন্তু, থাকতে অমর হল কিনা ওরা! তা বোন, কলির ধর্ম্মই এমনি! এই দেখ না, ছেরকাল ধরে খেটে মনু আমরা, আর মা ঠাকরুণের সঙ্গে তিথি কর্ত্তে যাবে কিনা তারিণী, আর বিমলি, বিচার দেখলে?"

চন্দরা ও বিধুমুখী উভয়েই কাল-ধর্ম্মের অবিচারের কথা ভাবিয়া একান্ত দুঃখে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সখেদে বলিল, "আর বোন, ও কথা বলিস নে, আর কি এখন আমাদের কাল আছে, না দিন আছে? এখন যত খোসামুদেরই রাজ্যি! তা দাঁড়া না দু দিন, নতুন মা একটু ভারিক্যি হোক।

এরি মধ্যে দেখছিস না,—ও মেয়ে গুণের আদর করতে জানে। শাশুড়ি ভালবাসত শুনে অবধি আমায় কত খাতির করে, দেখিসনি? ও বিধি! আমার পোড়া-দুখানা আজ তুইই মাজনা, ভাই! আমি একবার মিতিনের সঙ্গে দেখা ক'রে চট করে তামাক পোড়াটুকু বানিয়ে নে আসি!"

প্রাত্যাহিক কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, আহারান্তে নিজের নির্জ্জন ঘরে বসিয়া শান্তি তাহার পিতৃদত্ত সেলাইয়ের কলে মণিমালার নবপ্রসূত সন্তানের জন্য একটা ফ্রক সেলাই করিতেছিল। নিকটস্থ খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঈষদুষ্ণ বাতাস আসিতেছিল। সে যেন সুরভিলোভে তাহার খোলা চুলগুলার নিকট হইতে কোন মতেই নড়িতে পারিতেছিল না, উড়াইয়া উড়াইয়া তাহাদের দীর্ঘতা পরীক্ষা করিতেছিল, নাচাইয়া নাচাইয়া খেলা করিতেছিল, আবার ভিজা চুল শুখাইয়াও দিতেছিল। জানালার বাহিরে কার্ণিসের উপর একটা ঘুঘু বসিয়া আকুল বিরহ-গানে জগতের কর্ম্মবাসরে ক্লান্ত বিরহীর অর্দ্ধনিমীলিত তন্দ্রাজড়িত চক্ষের সম্মুখে করুণ-বিরহচিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। উদ্যানে বসন্তের পদচিহ্ন অশোকশাখায় লোহিত রাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। আম্রমুকুলের মদির সুবাসে ভ্রমরের দল মাতাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। পাখীগুলার আনন্দ-কলরবের শেষ নাই। গন্ধরাজের অত গন্ধ রৌদ্রের তেজে শুখাইয়া ফুরাইয়া গিয়াছে!

ফ্রকটা শেষ হইয়া গেল। নিজের হাতে-কাটা সুতায়-বোনা লেশের দ্বারা তাহার গলায় ফ্রিল ঝুলাইয়া কল বন্ধ করিয়া সে একটু কি ভাবিল। তারপর আপনা আপনি সলজ্জভাবে হাসিয়া ভাবিল, "না, তিনি আসবেন না।"

একপাশে একটা কাঠের চৌকির উপর সেগুন কাঠে পালিস লাগানো একটি চরকা একখানি কাপড়ে ঢাকা ছিল। শান্তি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সেটি নামাইয়া লইল। চুপড়িতে পাঁচ পাকাইবার সরকাঠি, বাগানের কাপাসতুলা এবং ছোট ধনুকের মত তুলা বুনিবার একটি যন্ত্র আছে। তৈয়ারি সূতাটুকু ছোট লাটাইয়ে জড়াইয়া শান্তি সেটি পরীক্ষা করিল, দুইটা পৈতা হইতে পারে, কিন্তু লেশের জন্য সরু সূতা চাই। সেজ ঠাকুরঝির জামার হাতায় দিতে হইবে।

মধ্যাহ্ন-নিদ্রা হইতে জাগিয়া হেমেন্দ্রনাথ আজ হঠাৎ অনেক দিনের পর একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিবাহের পর প্রথম প্রথম সুন্দরী স্ত্রীকে একদণ্ড চোখের আড় করিতে ইচ্ছা হইত না। সেই অত্যধিক লাভেচ্ছা পত্নীকে কতকটা ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক সময় সরম-সঙ্কুচিতা বধূকে হরির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। হেমেন্দ্র বলিত, "সংসার দেখবার তোমার কি দরকার? সে সব যাঁরা বাড়ি জুড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করছেন, তাঁরা দেখুন! এত নবাবী কেন? আর তোমার জ্যেঠা-মহাশয়ের সেবা! সেও ত এতকাল চাকর দাসীতে করে আসছে! তোমায় কি কেবল খাটাবার জন্যে আনা হয়েছে? একশ' লোক যাদের হুকুম-বরদারী করবার জন্য মুখ চেয়ে হাজির আছে, তারা কোন্ দুঃখে কাজ করবে? তুমি আমার কাছে থাক।"

এই সকল সদুপদেশ পালন করা শান্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। ঘৃণায় লজ্জায় সে যেন মরিয়া যাইত। কাজেই স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভিন্ন তাহার অন্য গতি ছিল না।

এই সব খুঁটি-নাটি লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা মনোমালিন্য চলিত! মধ্যে মধ্যে রাগ করিয়া হেম দুই চারি দিন কথা বন্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। আব্দারে বালকের সখের পুতুলের মত, বাক্সে না তুলিয়া, আলমারির মধ্যে না সাজাইয়া, দিনরাত নাড়াচাড়ায় দুইদিনেই নূতনত্বের সাধ মিটাইয়া হেম সহসা এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। একদিন বন্ধুবর যোগেশের উপদেশে হঠাৎ তাহার জ্ঞান হইল, সত্যই ত! সে এত বড় একটা লোক, ভাবী জমিদার, সে কিজন্য এমন করিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া থাকে? ইহাতে স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে! সে-ই বরং হেমের সাক্ষাৎলাভের জন্য আকুলি-বিকুলি করুক!

বুদ্ধিটা মাথার মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া বসিল। যোগেশ যে গ্লাডষ্টোনের মতই বুদ্ধিমান, সে কথা সেদিন সপ্রমাণ হইয়া গেল। এবং সেই শুভদিন হইতে খাসমহলটা অন্দর হইতে বহির্ব্বাটীতে উঠিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবের আমদানী ও আসর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, অন্দরের টানটাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল।

হেমেন্দ্র সে দিন ঘরের মধ্যে পা দিয়াই ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে আবার আজ চরকা নিয়ে বসে গেছ! আচ্ছা, এ পাগলামি কি তুমি ছাড়বে না? ভদ্র ঘরে এসেছ, অমন জোলানীর মত সখ কেন? শিল্প কাজ করতে হয়, একটা মেম রেখে দিচ্ছি, ভালরকম শিল্প শেখো, ছোটলোকের মত দিন রাত চরকা ঘ্যান-ঘ্যান, ভালও লাগে? এই জন্যেই ত আসি না।"

ভূমি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া শান্তি একটু সলজ্জভাবে হাসিল, ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বারণ কর ত, আর চারকায়

হাত দোবনা, কিন্তু বাবা বলেন, সূক্ষ্ম শিল্পের চেয়ে সূতো কাটা শেখা আমাদের বেশি দরকার। সেলাই, বোনা,—এ সব ত কিছু-কিছু জানি, তার চেয়ে সূতো তৈরি করতে আমারও ভাল লাগে। বাবা বলেন, আগে আমাদের দেশের মেয়েরা ঘরে ঘরে সূতো কেটে তাঁতিদের কাপড় বুনতে দিত। বাবা—"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া হেম রুষ্ট স্বরে বলিল, "বলুন, তোমার বাবা! তিনি যা বলেন, তাই যে একেবারে বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তাঁর পরামর্শে চলতে গেলে আমকে ত, অধঃপাতে যেতে হবে, কোন্ দিন, দেখছি। তিনি উকিল, তাঁর সবই সাজে। আমাদের এত বাড়াবাড়ি করলে, যোগেশ বলছিল, কোন্‌দিন কলেক্টর সাহেবের নজর পড়বে। একে তাঁরই পরামর্শে বাবা সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের চাঁদায় মোটে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে মহা অন্যায় কাজ করেছেন! তার ফল ভুগতেই হবে! তার উপর তোমরা যদি দেশশুদ্ধ লোককে তুলোর চাষ, তাঁত আর চরকা নিয়ে নাচিয়ে তোল, তা হলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে দেখছি। ও সব ছাড়, কথা শোন, স্বামীর কথা শুনলে পাপ হবে না। বল ত একটা মেম গবর্ণেস রাখিয়ে দিচ্চি, সাহেব শুনলে খুসী হবে এখন। যোগেশ বলছিল, দুশো টাকা মাইনে দিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কে আত্মীয়া একটি মিস্, নারাণগঞ্জের কুঠিতে থাকেন, তাঁকেই ঠিক করা যায়। তিনি শিক্ষিতা, আর খুব শিষ্ট, দুদিনে তোমাকে দুরস্ত করে তুলবে। লেখাপড়া বেশ জানো-টানো, একটু স্বাধীন ধরণটা হলেই তুমি ফাষ্টক্লাস লেডি হতে পারবে, কিন্তু এইতেই তোমায় খেয়েচে। দেখ, একটু মানুষের মত হবে?"

মুছিয়া ফেলিল। এ প্রাত্যাহিক ব্যাপারে ইহার চেয়ে বেশি সে খরচ করিত না। কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া সে মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। মা তুলার চুপড়িটা কন্যার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "গোটাকতো পাঁজ পাকিয়ে দেতো মা, আর ওগুলোর বীচিগুলো এগিয়ে দিস্, বকে বকে মুখটা শুকিয়ে উঠলো। হরি হে দয়াময়!"

মাতা-পুত্রী নীরবে আপনাদের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। শিবানী অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরীর আজ মনটা বড়ই ভার হইয়া আছে। সকাল হইতে কাহারো সাক্ষাৎ হইল না, মনের ভিতর কথাগুলা গজ গজ করিয়া উঠিতেছে, আজিকার দিনটাই যেন বৃথা গেল!

"কৈ গো শিবুর মা, কি কচ্চো?" বলিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী উঠানে দেখা দিলেন। "এসো দিদি, এসো ভাই, তোমারি কথা মনে কচ্ছিলাম।"

"তবে আমি অনেকদিন বাঁচবো" বলিয়া মাতঙ্গিনী তাঁহার তামাক-পোড়াবর্জ্জিত দশন প্রকাশ করিয়া সৌজন্যের হাসি হাসিয়া শিবানীদত্ত কুশাসনে তাঁহার বিপুল দেহার্দ্ধ স্থাপন করিলেন, "আঃ, রোদটার আজ তেজ দেখেচো, একটুখানি আসতে যেন পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। হাঁগা শিবুর মা, আজ চান কত্তে নাওনি, যাত্রা করোনি কেন?"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী তৈয়ারী সূতাটুকু লাটাইয়ে জড়াইয়া লইয়া একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন, "আর দিদি ঘর সংসারের কাজের জ্বালায় তো দু দণ্ড ঠাকুর দেবতাকে ডাকবার অবসর পাবার যো নেই, চিরজন্ম ওইই কর্ব্বো।"

শান্তি নত মুখ তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "না, সে জ্যেঠামশায় পছন্দ কর্ব্বেন না, তিনি ও সব ভাল বাসেন না," তার পর স্বর ঈষৎ মৃদু করিয়া কহিল, "সেলাই-টেলাই ত আমি চলনসই জানি, বেশী করতে সময় হবে না, সে কাজ নেই। তা ছাড়া—"

বলিতে গিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। হেমেন্দ্র বিরক্তভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, তা ছাড়া?"

"এত টাকা একজন মেমকে দিয়ে কি হবে? একে এ বৎসর বৃষ্টির জন্য ফসল বেশী না হওয়াতে প্রজাদের খাজনা কিছু ছেড়ে দিতে হবে।"

ভাবী জমিদার সরোষে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা, ফসলের কিছু অভাব হয়নি। ও সব কেবল শালাদের বদমায়েসি! বাবা আবার তাই বিশ্বাস করেছেন। ঐতেই সব গোল্লায় যাবে, দেখছি। এও বোধ হয় শ্বশুরমশায়ের পরামর্শ।"

শান্তি সজলনেত্রে করুণদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র ততক্ষণে সোফার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। ভাল করিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে বলিল, "এ আবার কি হুজুক উঠেছে, শুনছি? তোমরা নাকি তীর্থভ্রমণে যাবে?"

শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর অনতিদূরে সোফা ঘেঁসিয়া মেঝেতে বসিল। স্বামী না ডাকিলে নিকটে যাইতে এখনও তাহার একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। ইচ্ছা-সত্ত্বেও সে সেইজন্য নিজের পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এ গৃহের সে সর্ব্বময়ী গৃহিণী, কারণ, গৃহস্বামী তাহাকে সে পদ সম্পূর্ণরূপেই প্রদান করিয়াছেন। সেই দাবীতেই সে শ্বশুরের উপর মাতৃত্বের পরিপূর্ণ

গৌরব দখল করিয়াছিল। কিন্তু স্বামীর নিকট নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সরম-সঙ্কোচ, মানাভিমান লইয়া নববধূ সে অযাচিত হইয়া একেবারে পত্নীত্বপদ ত কই লইতে পারিল না! শান্তি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, জ্যেঠামশায় যাবেন বলছেন।"

"জ্যেঠামশায় ত যাবেন, তুমিও নাকি যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ। জ্যেঠামশায়ের ইচ্ছা, তুমিও যাও, তোমায় কিছু বলেছেন?"

"আমায়!" হেমেন্দ্র সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল, "আমার ত সে-সাধ নেই। দিব্যি বাড়িতে রয়েছি, এ সব ছেড়ে-ছুড়ে কোথায় বিদেশ-বিভুঁইয়ে অস্থিতপঞ্চকে ঘুরে সারা হতে যাব। বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময় হয়েছে বলে আমার ত মনে হচ্চে না। তা ওঁরা বুড়ো হয়েছেন, তীর্থ করতে যাচ্চেন, সে বেশ কথা—তোমায় আমায় নিয়ে টানাটানি, কেন? তুমি ওঁদের সঙ্গে কোথায় ঘুরতে যাবে? তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

শান্তি সাতঙ্কে জিহ্বা দংশন করিল,একবার চকিতনেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া শঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা কি হয়, জ্যেঠামশায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, কি করে বলব, আমি যাব না!"

হেমেন্দ্র মুখটা একটু ভার করিল, কহিল "বেশ তবে যেও, আমি যেতে পার্ব্বো না। তুমি গেলে আমার আর ক্ষতিটা কি? তোমারই কষ্ট হবে, তাই বলছিলাম।"

স্বামী তাহাদের সঙ্গে যান, শান্তির সে ইচ্ছা অত্যন্তই ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে সে তাহাকে আর কিছু বলিল না। নিজের জিদে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করানো, তাহার স্বভাব নয়। বিশেষ, হেমেন্দ্রর শেষের কথা-কয়টা তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল।

ভালবাসার খাতিরে অনেকখানি অন্যায় সহ্য করা যায়, কিন্তু শান্তি কাছে থাকিবে না বলিয়া হেমেন্দ্রর কিছুমাত্র দুঃখ নাই! এ শুধু তাহার কর্ত্তব্যে বাধা দিবার চেষ্টা! স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে তাহারও একটু কষ্ট হইবে, কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করিল না; কারণ, সে জানে, সে-ভিন্ন জ্যেঠামহাশয়ের যে আর কেহই নাই!

রাত্রে আহার-কালে পাখাহস্তে আসীনা বধূকে সম্বোধন করিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, "মা আমাদের যাওয়া ঠিক ত?"

শান্তি ঈষৎ নতমুখে সলজ্জে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, জ্যেঠামশায়ই।"

"প্রথমে কোথায় গিয়ে ওঠা যাবে, তা কি ঠিক করেছ, মা?"

ক্ষুদ্রা জননী, জননীর মতই সস্নেহে হাসিয়া কহিল, "সেটা আপনিই ঠিক করুন, জ্যেঠামশায়। আমি মনে করছিলুম, বৈদ্যনাথে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবেন, তারপর গয়া হয়ে পরে কাশী যাব। আপনার শরীর ত তত ভাল নয়, একেবারে কাশী যেতে টান পড়বে। কিন্তু আপনি—"

বৃদ্ধ জমিদার মুখ তুলিয়া বধূর দিকে সস্নেহে চাহিলেন, "আমার মা থাকতে আমি স্থির কর্ব্বো? না মা, আমি ত তোমার অবাধ্য ছেলে নই!"

বলিতে বলিতে অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস সহসা বাহির হইয়া আসিল।

সংসারপথে চলিতে গিয়া মানুষ পদে পদে ভ্রম করিয়া বসে। ভ্রান্তিপূর্ণ জগতের ইহা একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম বলিয়াই যেন মনে হয়। মহা-মহাঋষিরা যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই একটা বিরাট ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া গিয়াছেন, তখন সামান্য মানুষ যাহা কিছু করে, যাহা কিছু চাহে, যাহা আশা করে, সেগুলা কেমন

করিয়া অবিচল সত্য হইয়া দাঁড়াইবে? তাই অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনেক আশা করিয়া যে শ্যামাকান্ত গরীব হেমেন্দ্রকে প্রাণাধিক পুত্রের পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া মনে করিয়াছিলেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে তাঁহারই হইয়া যাইবে,—তাঁহার সে আশা বিমানমার্গে নির্ম্মিত সুন্দর অট্টালিকাবৎ অচিরে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এক বৃক্ষ হইতে ছাল কাটিয়া বৃক্ষান্তরে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলে, তাহা যেমন জোড়া লাগে না, বয়স্ক পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে ঠিক মনের মত গড়িয়া তুলিবার আশাও সেইরূপ বিড়ম্বনামাত্র।

গরীবের ছেলে বড়লোক হইয়া হঠাৎ নবাব-উপাধিধারী জীবদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বসিল। শ্যামাকান্ত দেখিলেন, তাঁহার নিজ পুত্র বিনোদ বিপন্নের সাহায্য করিতে যে অর্থ ব্যয় করিত, তাহার অষ্টগুণ অধিক হেমেন্দ্র বিলাসিতায় উড়াইয়া দিতেছে। একখানা পুরাতন গাড়ি কিনিয়া বিনোদ একবার পিতার বিরক্তিভাজন হইয়াছিল,—হেম এখন নিত্য নূতন গাড়ি-ঘোড়ায় আস্তাবল ভরাইয়া ফেলিল। বাইসিকল, মোটর-সাইকেল, মোটর, এ সব ত আছেই! দেখিতে দেখিতে হেমেন্দ্র রীতিমত বাবু হইয়া উঠিল। তাহার মোসাহেবের সংখ্যা রক্তবীজের ন্যায় দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিল এবং মাতা বীণাপাণির সহিত সম্পর্ক একরূপ বিচ্ছিন্ন হইল। কালেজে অনুপস্থিতি নিত্যই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সার্কাস বা থিয়েটারের বক্সে উপস্থিতির কখনও অভাব ঘটিত না। নারায়ণগঞ্জের বাগানবাড়ি বিনোদের পিতামহের মৃত্যুর পর হইতে পরিত্যক্তই পড়িয়াছিল, তাহার নূতন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্মৃতির মত আবার তাহার বৃহৎ

উদ্যান ও প্রাচীর ছাড়াইয়া নারী-কণ্ঠের স্বরলহরী ও সুমধুর নূপুর-নিক্কন বিস্মিত পথিকবর্গের কর্ণে মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া রজনীনাথ লিখিলেন, "হেমেন্দ্রর স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কাজকর্ম্মের ঝঞ্চাট লইয়া আমি ত সর্ব্বদা তাহার সংবাদ রাখিতে পারি না। তাহার চেয়ে সে আমার কাছেই থাকুক, আমারও ত সুকু ভিন্ন-বাড়িতে আর কেহ নাই।" চিঠি পড়িয়া শ্যামাকান্ত হেমেন্দ্রকে ডাকাইয়া শ্বশুরের অভিমত জানাইলেন, বলিলেন, "কাল থেকেই তুমি সেখানে যাও, দেরি কর্ব্বার দরকার কি?"

হেম চটিয়া উঠিল, কহিল, "কি, আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকব? আপনি এমন কথা আমায় কি করে বল্লেন? তিনি এ কথা বলে যে আপনাকে শুদ্ধ অপমান করেছেন, তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি?"

শ্যামাকান্ত নানাপ্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, রজনীনাথের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঠিক সে প্রকার নহে। রজনী ঠিক তাঁহার ছোট ভাইয়ের মত। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাপেক্ষা সদুপদেশ আর কেহই দিতে পারিবে না। বিশেষ হেমেন্দ্র নাথের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শ্বশুরালয়-বাসে কেহ তাহাকে 'ঘরজামায়ে' ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে না, সেজন্য ভয় করা অনাবশ্যক। কিন্তু হেমেন্দ্র সে কথা কানেও তুলিল না, সে সাফ বলিয়া দিল, শ্বশুরের কাছে গিয়া সে কিছুতেই থাকিবে না, তাহাতে তাহার পড়াশুনা হোক, আর নাই হোক!

কিছুদিন পরে সে আরও একটু সাফ বুঝাইয়া দিল যে, তাহার

দৃষ্টিশক্তি একেবারে হীনতা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, আর পড়াশুনা করিতে যাইয়া কি সে অন্ধ হইবে? তারপর, সে একজন ডাক্তারের নিকট হইতে একজোড়া সোনা-বাঁধান চশমা পরিবার অনুমতি লইয়া দিনকতক দার্জ্জিলীঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া থিয়েটার প্রভৃতি নানারূপ হুজুগ লইয়া লক্ষ্মীপুরে অস্থায়ীরূপে বসিল। শ্যামাকান্ত ভয়ে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, শান্তিও একটি কথা বলিল না। রজনীনাথ তীব্র তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। কাজেই সে তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। মনের ঝাল মিটাইয়া শান্তির নিকট তাহার পিতৃনিন্দা করিল। শান্তি রাগ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বসিয়া সমস্ত কথা শুনিল, এবং হেমের বলা শেষ হইলে নীরবে উঠিয়া গেল। পিতার স্বপক্ষে বা স্বামীর বিপক্ষে সে একটিও কথা বলিল না। যে তাঁহাদের বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, কেন সে তাহাকে জোর করিয়া বুঝাইতে যাইবে?

শান্তির সে সহিষ্ণুতাটাকে হেমেন্দ্র অপ্রতিহত গর্ব্ব বলিয়া মনে করিল। যাহাকে দুইকথা শুনাইয়া দিলাম, সে যদি রাগই না করিল, তাহা হইলে বলার আসল সুখটুকুই যে নষ্ট হইল। ইহাতে মানুষের রাগ না কমিয়া বাড়িয়াই যায়! বিশেষতঃ রজনীনাথের সহিত একমাত্র জামাতার যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখনকার লগ্নটা শুভফলদায়ী ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

বৈদ্যনাথে গিরিগর্ভস্থ মহাদেব-দর্শনান্তে গয়া,—পরে গয়া হইতে কাশী পৌছিয়া শ্যামাকান্ত সেখানে বাঙ্গালীটোলার বাহিরে একমাসের ভাড়ায় দিন পনেরোর জন্য একটা বাসা লইয়া একবার হাঁফ ছাড়িলেন।

শান্তি পূর্ব্বে একবার কাশী গিয়াছিল, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, তাহার অচেনা স্থান নয়, কিন্তু শ্যামাকান্তের প্রবীণা আত্মীয়ার দল অত্যন্ত মুগ্ধনেত্রে এ সকল স্থানের শুষ্ক বালুময় ধূলিকণাটা অবধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দধাম, বিশ্বমাতার রন্ধনশালা, যোগিবাঞ্ছিত পুণ্যক্ষেত্র,—এখানকার পবিত্র বাতাসে সংসার-তাপদাহ জুড়াইয়া যায়! কতদিনকার কাশী! এই জনাকীর্ণ রাজপথ কত শত বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষিগণের পবিত্র পদাঙ্ক বক্ষে ধরিয়া গর্ব্ব-স্ফীত হইয়াছিল! এই নগর-গগন সামগানের গম্ভীরতানে স্পন্দিত, মুখরিত হইয়াছিল, আর আজিও এই অবনতির শেষ যুগে হিন্দুর হিন্দুত্ব, সাধুর সাধুত্ব, অদ্বৈতবাদের অচল মহিমা এইখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে! বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ হইয়া টুণ্ডুলা দিয়া আগ্রা জয়পুর এবং তথা হইতে পুষ্কর তীর্থ ও সাবিত্রী পাহাড়ে দেবী দর্শন করিয়া শ্যামাকান্ত উজ্জয়িনী গমন করিলেন। উদয়পুর চিতোর গড় দেখিয়া আরাবলি পর্ব্বতপ্রাচীর বেষ্টিত গিরিপথে কত শত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাহিনীর করুণ ও গৌরবস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শ্বশুর ও বধূ আজমীরে আসিলেন।

আজমীরও এক বহু পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ নগর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত রমণীয়। আরাবলির সমুন্নত

ধূসর শৈলশ্রেণী চারিদিক দিয়া ইহাকে অটল প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘের কোল হইতে সহরের জনাকীর্ণ রাজপথ অবধি সেই প্রাকৃতিক প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। একদিকে গিরি- প্রবাহিত সলিল-রচিত সুদৃশ্য হ্রদ আনায়কাগর! তাহার তিন পার্শ্বে শৈলপ্রাকার; সম্মুখতীরে মর্ম্মরগ্রথিত নরহস্তরচিত প্রশস্ত দালান, মর্ম্মর রেইলবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীষ্মাবাস এবং যত্নরক্ষিত আধুনিক ফ্যাসানে প্রস্তুত রাজকীয় উদ্যান। এই প্রস্তর প্রাসাদাবলী পূর্ব্বে মহানুভব সম্রাট আকবর সাহ এবং সাজাহানের ঝাছারীবাড়ী ছিল, এখন ইহা চিফ কমিশনরের আবাস। পুষ্প-বাটিকার সে মহিমা, সে গরিমা আর কিছুই নাই, এখন ইহা সাধারণ ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষের ক্রীড়াকানন, দর্শকবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার স্থলমাত্র। আজমীরে দ্রষ্টব্যস্থল বিস্তর। আজমীর-রাজবংশীয় কীর্ত্তি অধুনা যাহা আড়াইয়া-ঝোবরা নামে পরিচিত, তাহার সূক্ষ্মশিল্প ও নির্ম্মাণকৌশল অপূর্ব্ব। ইহার রচনা-অবস্থাতেই হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের পর ইহা পুনঃসংস্কৃত ও সমাপ্ত হয়, এবং ইদানীং ইহার অসম্পূর্ণ শোচনীয় ধ্বংসের উপর আমাদের রাজপুরুষগণের করুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

তারাগড় দুর্গে এখন বিদেশী বিজেতার বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে উড়িতেছে। ধূসর গিরিমালার উচ্চতর চূড়া প্রাচীন ভারত ইতিহাসের একটি গৌরব-চিহ্ন। সেই উন্নত দুর্গ-শিরে সমগ্র রাজপুত জাতির বিগত পুণ্যগৌরবময় রক্ত পতাকা তাঁহাদের বীরহৃদয়ের এক বিভীষিকাময় বেদনা-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে!

তারাগড়ের ঠিক নীচেই পর্ব্বতগাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া

সমতলভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুসলমানের পুণ্যতীর্থ আজমীর-সরিফ। ধর্ম্মের সহিত ঐশ্বর্য্যের মিলনে, পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে, ভারতের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। ভক্তের ভক্তি-আরাধনার আন্তরিক প্রয়াস ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি-পুরাতন হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি সমস্ত সম্রাট, নবাব, সেনাপতি, ও ওমরাহগণের কিছু-না-কিছু কীর্ত্তি-চিহ্ন ইহার মধ্যে আছেই। বাবর, হুমায়ুন, আকবরসাহ, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব হইতে হায়দার পর্য্যন্ত স্বনামখ্যাত ব্যক্তির এক একটি ফাটক, মসজিদ, বা কোন-কিছু দান এখনও তাঁহাদের নামকে এখানে সজীব রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লীশ্বরের মসজিদ ভক্তজনোচিত পবিত্র, এবং সৌখীন সম্রাট সাহজাহানের মর্ম্মরপ্রাসাদ তাঁহার রুচিরই অনুরূপ সুন্দর। প্রবেশদ্বারের উপর নহবৎখানায় চিতোরলুণ্ঠিত বিগত গৌরবচিহ্ন প্রকাণ্ড জয়ঢাক, এখনও তেমনই মেঘমন্দ্রস্বরে প্রহরে প্রহরে বাজিয়া উঠে। কিন্তু সে শব্দ রাজপুত হিন্দুর হৃদয়ে আর তেমন অশনি-নির্ঘোষ বলিয়া বাজে না! সে হিন্দু আর নাই, সে বিজেতা মুসলমানও আর নাই।

ইহা ভিন্ন রাজকুমার কলেজ প্রভৃতি আধুনিক কালেরও কিছু-কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বন-পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত নির্জ্জন-কানন মধ্যবর্ত্তী সাবিত্রী-পর্ব্বতের উচ্চচূড় মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরময়ী অপূর্ব্ব শিল্পকলার আদর্শমূর্ত্তি, সাবিত্রী ও সরস্বতীদেবী অধিষ্ঠিতা। উচ্চে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে, মন এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। বিশ্বশিল্পীর অনন্ত শিল্পচাতুর্য্যের ইহাও এক অপূর্ব্ব পরিচয়। নীলাকাশের নীচে যতদূর চাহিয়া দেখ, ধূসর শৈলমালা এবং উচ্চ-নীচ শ্যাম বৃক্ষশ্রেণীর

দৃষ্টিশক্তি একেবারে হীনতা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, আর পড়াশুনা করিতে যাইয়া কি সে অন্ধ হইবে? তারপর, সে একজন ডাক্তারের নিকট হইতে একজোড়া সোনা-বাঁধান চশমা পরিবার অনুমতি লইয়া দিনকতক দার্জ্জিলীঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া থিয়েটার প্রভৃতি নানারূপ হুজুগ লইয়া লক্ষ্মীপুরে অস্থায়ীরূপে বসিল। শ্যামাকান্ত ভয়ে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, শান্তিও একটি কথা বলিল না। রজনীনাথ তীব্র তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। কাজেই সে তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। মনের ঝাল মিটাইয়া শান্তির নিকট তাহার পিতৃনিন্দা করিল। শান্তি রাগ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বসিয়া সমস্ত কথা শুনিল, এবং হেমের বলা শেষ হইলে নীরবে উঠিয়া গেল। পিতার স্বপক্ষে বা স্বামীর বিপক্ষে সে একটিও কথা বলিল না। যে তাঁহাদের বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, কেন সে তাহাকে জোর করিয়া বুঝাইতে যাইবে?

শান্তির সে সহিষ্ণুতাটাকে হেমেন্দ্র অপ্রতিহত গর্ব্ব বলিয়া মনে করিল। যাহাকে দুইকথা শুনাইয়া দিলাম, সে যদি রাগই না করিল, তাহা হইলে বলার আসল সুখটুকুই যে নষ্ট হইল। ইহাতে মানুষের রাগ না কমিয়া বাড়িয়াই যায়! বিশেষতঃ রজনীনাথের সহিত একমাত্র জামাতার যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখনকার লগ্নটা শুভফলদায়ী ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

মাতঙ্গিনী সে কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন, "তাই তো! সংসারের কথা আর বলো না, জ্বলে পুড়ে মরেচি।"

মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী যে বর্ত্তমানের কথা না বলিয়া অতীত জ্বালার উল্লেখ করিলেন, তাহার কারণ বর্ত্তমানে তাঁহার ঘাড় হইতে জ্বালা-যন্ত্রণার দায় একেবারে নিঃশেষ হইয়া নামিয়া গিয়াছে। শিবানী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"শিবু তোমায় আর দেখতেই পাইনা যে, মা! আহা, বাছা যেন রোগা হয়ে গেছে, মুখটি শুকিয়ে গেছে। কেন গা, শিবুর মা?"

শিবানীর মাতা একবার কন্যার দিকে অগ্রাহ্যভাবে চাহিয়া দেখিলেন, "অরে দিদি ওর কি মনের সুখ আছে? যে কসায়ের হাতে পড়েচে, চব্বিশঘণ্টার তাড়নায় তাড়নায় অমন দশা হচ্চে, নইলে খাবার তো কিছু দুঃখু নেই, অমন চেহারাই বা হয় কেন? জামাই যেন দিন দিন মাথায় উঠে বসচে।"

মাতঙ্গিনী শিবানীর হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন, "আয় মাসি দু গাছা পাকা চুল তুলে দে। তা শিবুর মা, জামাই চাকরী বাকরী করে না কেন গা? অক্ষয়দিদির নাতি সেদিন বলছেলো তোমার জামাই নাকি ভারি বিদ্বান, সে শশীর ছেলের ফাষ্ট বুকের মানে বলে দেয়, পাঠশালার পণ্ডিত মশাই সেদিন নাকি সটকে না নাম্‌তা কি জেনে নিচ্ছিল।"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, "আমার কপাল! চাকরী করলে যে আমার দোষ ধরবার সময় কমে যায়! করে কি করে বলো, এই আজই দেখোনা, মেয়েটা একবার ঘাটে গিয়েছে, কোথাও তো যায় না; গিয়েছে, না হয় আসুকই, তা নয় রেগে টং হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। জামাই নিয়ে হাড়মাস

১৮

বৈদ্যনাথে গিরিগর্ভস্থ মহাদেব-দর্শনান্তে গয়া,—পরে গয়া হইতে কাশী পৌঁছিয়া শ্যামাকান্ত সেখানে বাঙ্গালীটোলার বাহিরে একমাসের ভাড়ায় দিন পনেরোর জন্য একটা বাসা লইয়া একবার হাঁফ ছাড়িলেন।

শান্তি পূর্ব্বে একবার কাশী গিয়াছিল, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, তাহার অচেনা স্থান নয়, কিন্তু শ্যামাকান্তের প্রবীণা আত্মীয়ার দল অত্যন্ত মুগ্ধনেত্রে এ সকল স্থানের শুষ্ক বালুময় ধূলিকণাটা অবধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দধাম, বিশ্বমাতার রন্ধনশালা, যোগিবাঞ্ছিত পুণ্যক্ষেত্র,—এখানকার পবিত্র বাতাসে সংসার-তাপদাহ জুড়াইয়া যায়! কতদিনকার কাশী! এই জনাকীর্ণ রাজপথ কত শত বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষিগণের পবিত্র পদাঙ্ক বক্ষে ধরিয়া গর্ব্ব-স্ফীত হইয়াছিল! এই নগর-গগন সামগানের গম্ভীরতানে স্পন্দিত, মুখরিত হইয়াছিল, আর আজিও এই অবনতির শেষ যুগে হিন্দুর হিন্দুত্ব, সাধুর সাধুত্ব, অদ্বৈতবাদের অচল মহিমা এইখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে! বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ হইয়া টুণ্ডুলা দিয়া আগ্রা জয়পুর এবং তথা হইতে পুষ্কর তীর্থ ও সাবিত্রী পাহাড়ে দেবী দর্শন করিয়া শ্যামাকান্ত উজ্জয়িনী গমন করিলেন। উদয়পুর চিতোর গড় দেখিয়া আরাবলি পর্ব্বতপ্রাচীর বেষ্টিত গিরিপথে কত শত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাহিনীর করুণ ও গৌরবস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শ্বশুর ও বধূ আজমীরে আসিলেন।

আজমীরও এক বহু পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ নগর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত রমণীয়। আরাবলির সমুন্নত

ধূসর শৈলশ্রেণী চারিদিক দিয়া ইহাকে অটল প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘের কোল হইতে সহরের জনাকীর্ণ রাজপথ অবধি সেই প্রাকৃতিক প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। একদিকে গিরি- প্রবাহিত সলিল-রচিত সুদৃশ্য হ্রদ আনারকাগর! তাহার তিন পার্শ্বে শৈলপ্রাকার; সম্মুখতীরে মর্ম্মরগ্রথিত নরহস্তরচিত প্রশস্ত দালান, মর্ম্মর রেইলবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীষ্মাবাস এবং যত্নরক্ষিত আধুনিক ফ্যাসানে প্রস্তুত রাজকীয় উদ্যান। এই প্রস্তর প্রাসাদাবলী পূর্ব্বে মহানুভব সম্রাট আকবর সাহ এবং সাজাহানের ঝাছারীবাড়ী ছিল, এখন ইহা চিফ কমিশনরের আবাস। পুষ্প-বাটিকার সে মহিমা, সে গরিমা আর কিছুই নাই, এখন ইহা সাধারণ ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষের ক্রীড়াকানন, দর্শকবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার স্থলমাত্র। আজমীরে দ্রষ্টব্যস্থল বিস্তর। আজমীর-রাজবংশীয় কীর্ত্তি অধুনা যাহা আড়াইয়া-ঝোবরা নামে পরিচিত, তাহার সূক্ষ্মশিল্প ও নির্ম্মাণকৌশল অপূর্ব্ব। ইহার রচনা-অবস্থাতেই হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের পর ইহা পুনঃসংস্কৃত ও সমাপ্ত হয়, এবং ইদানীং ইহার অসম্পূর্ণ শোচনীয় ধ্বংসের উপর আমাদের রাজপুরুষগণের করুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

তারাগড় দুর্গে এখন বিদেশী বিজেতার বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে উড়িতেছে। ধূসর গিরিমালার উচ্চতর চূড়া প্রাচীন ভারত ইতি-হাসের একটি গৌরব-চিহ্ন। সেই উন্নত দুর্গ-শিরে সমগ্র রাজপুত জাতির বিগত পুণ্যগৌরবময় রক্ত পতাকা তাঁহাদের বীরহৃদয়ের এক বিভীষিকাময় বেদনা-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে!

তারাগড়ের ঠিক নীচেই পর্ব্বতগাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া

সমতলভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুসলমানের পুণ্যতীর্থ আজমীর-সরিফ। ধর্ম্মের সহিত ঐশ্বর্য্যের মিলনে, পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে, ভারতের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। ভক্তের ভক্তি-আরাধনার আন্তরিক প্রয়াস ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি-পুরাতন হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি সমস্ত সম্রাট, নবাব, সেনাপতি, ও ওমরাহগণের কিছু-না-কিছু কীর্ত্তি-চিহ্ন ইহার মধ্যে আছেই। বাবর, হুমায়ুন, আকবরসাহ, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব হইতে হায়দার পর্য্যন্ত স্বনামখ্যাত ব্যক্তির এক একটি ফাটক, মসজিদ, বা কোন-কিছু দান এখনও তাঁহাদের নামকে এখানে সজীব রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লীশ্বরের মসজিদ ভক্তজনোচিত পবিত্র, এবং সৌখীন সম্রাট সাহজাহানের মর্ম্মরপ্রাসাদ তাঁহার রুচিরই অনুরূপ সুন্দর। প্রবেশদ্বারের উপর নহবৎখানায় চিতোরলুণ্ঠিত বিগত গৌরবচিহ্ন প্রকাণ্ড জয়ঢাক, এখনও তেমনই মেঘমন্দ্রস্বরে প্রহরে প্রহরে বাজিয়া উঠে। কিন্তু সে শব্দ রাজপুত হিন্দুর হৃদয়ে আর তেমন অশনি-নির্ঘোষ বলিয়া বাজে না! সে হিন্দু আর নাই, সে বিজেতা মুসলমানও আর নাই।

ইহা ভিন্ন রাজকুমার কলেজ প্রভৃতি আধুনিক কালেরও কিছু-কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বন-পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত নির্জ্জন-কানন মধ্যবর্ত্তী সাবিত্রী-পর্ব্বতের উচ্চচূড় মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরময়ী অপূর্ব্ব শিল্পকলার আদর্শমূর্ত্তি, সাবিত্রী ও সরস্বতীদেবী অধিষ্ঠিতা। উচ্চে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে, মন এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। বিশ্বশিল্পীর অনন্ত শিল্পচাতুর্য্যের ইহাও এক অপূর্ব্ব পরিচয়। নীলাকাশের নীচে যতদূর চাহিয়া দেখ, ধূসর শৈলমালা এবং উচ্চ-নীচ শ্যাম বৃক্ষশ্রেণীর

মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ গিরিতরঙ্গিণী-গুলি ও একপার্শ্বে মাড়বার-মরুবালুর অস্পষ্ট শুভ্র রেখা!

শ্যামাকান্ত পর্ব্বতারোহণে অক্ষম এবং সাবিত্রীদেবীকে সিন্দুরদান স্ত্রীলোকের কার্য্য, সেই জন্য শ্যামাকান্ত সাবিত্রী না গিয়া পুষ্করেই যথাকৃত্য সম্পন্ন করিয়া হ্রদতীরে নির্দ্দিষ্ট বাসাটিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পাওনা-গণ্ডা লইয়া পাণ্ডার সহিত সরকার মহাশয়ের বেশ একটু বিবাদের সূত্রপাত হইল। সেই গোলমালে জমিদার মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গায় উঠিয়া তিনি বধূর আগমন-বিলম্বে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় শান্তি ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার মূর্ত্তি-দুটি জ্যেঠামশায়! আমার ইচ্ছা করছে, আমাদের লক্ষ্মীপুরে অমন দুটি মূর্ত্তি থাকে! আহা, আপনি যদি দেখতেন!"

পরিশ্রমে ঈষৎ ম্লান ও ভক্তির আনন্দে সমুজ্জ্বল বধূর মুখখানির দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া শ্যামাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেন, মা! এই যে তাঁরি ছায়া আমার ভক্তিমতী জননীর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি! এ যে মায়ের অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি! মায়ের সকল মূর্ত্তিই ত আমি আমার এই মায়েতে অনুভব করি, মা! খুব ভাল লাগল, তোমার?"

অতিরিক্ত প্রশংসাবাদে শান্তি লজ্জাকুণ্ঠিত হইল, চোখ নীচু করিয়া সে উত্তর দিল, "খুব ভাল লাগল, জ্যেঠামশায়।"

উজ্জয়িনী হইতে ফিরিবার মুখে আজমীরে যেদিন বিশ্রাম লওয়া হয়, সেইদিন রাত্রে শ্যামাকান্ত একটু জ্বরানুভব করিলেন। শান্তি তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাওয়াইয়া অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত পাখার

বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইল, কিন্তু মনে মনে সে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। যদি জ্যেঠা-মশায়ের অসুখ বাড়ে? এ বিদেশ-বিভূঁয়ে নারী-বাহিনী লইয়া কি বিপদ! সেদিন স্বামীর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি যদি নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজের কথাই শুধু না ভাবিয়া জ্যেঠামহাশয়ের কথা একটু ভাবিতেন!

পরদিন প্রভাতে শ্যামাকান্ত সুস্থ হইয়াই জাগিলেন। শান্তি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোলের ছেলেটিকে সুস্থ হইতে দেখিলে মা যেমন নিরুদ্বেগ হয়, সে-ও সারারাত্রির পর তেমনই শান্তি-অনুভব করিল। শান্তির সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাকান্ত বলিলেন, "যার এমন স্নেহময়ী মা সঙ্গে আছেন, সে কি বেশীক্ষণ অসুস্থ থাকতে পারে? চল মা, আমরা আজই বেরিয়ে পড়ি। রাত্রে বড় ভয় হচ্ছিল, এখন কি তীর্থ ভিন্ন অন্য কোথাও থাকতে আছে?"

শান্তি ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, "জ্যেঠামশায় আপনি একটু সুস্থ না হলে, আমি আপনাকে গাড়িতে যেতে দিতে পারব না। অন্ততঃ দুটো দিনও জিরিয়ে নিন, আবার যদি অসুখ করে?"

সুবোধ বালকের মত ক্ষুদ্র মায়ের বৃদ্ধ ছেলে সম্মতি দিলেন, "আচ্ছা, মা, তাই হোক।"

পরে তাঁহারা কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, ও হরিদ্বার ঘুরিয়া মথুরা-বৃন্দাবন দর্শনে গমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের সুবিস্তৃত ময়দান ও ধান্যক্ষেত্রসকল এখনও সেই সব পুরাতন যুগান্তব্যাপী মহাস্মৃতি বক্ষে লইয়া পড়িয়া আছে। উদার আকাশে মহাগাম্ভীর্য্যময় অব্যক্ত সুর এখনও সেই মহা-ভারতের মহাযজ্ঞের কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে! এদেশের মৃত্তিকা

এখনও সেই স্রোতোবাহিত শোণিতে রঞ্জিত! বাতাস শোক গাথায় ম্রিয়মান! অশ্রুপ্লুতনেত্রে সুদূরের পানে চাহিয়া বালিকা এক অজ্ঞাত ব্যথায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। হরিদ্বারে হিমরাজের ভীমকান্ত শোভা ও ধবলতরঙ্গার অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিয়া শান্তি বিস্ময়-জড়িত এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল।

বিবিধ বর্ণের প্রস্তররাশি! যাঁহার তরল তরঙ্গের মধ্যে কমঠ-মীন কিম্বা যাঁহার দেশে মরুক্ষীণ হইয়া থাকিতেও যোগিরাজ মহা-পুরুষেরও আপত্তি হয় নাই, সেই শৈলজা-জাহ্নবীর অমল সলিলের ভিতর হইতে কি এক বিচিত্র ভাব প্রকাশ পাইতেছে! সেই স্ফটিক-বৎ স্বচ্ছ, শীতল জলধারা দুই পার্শ্বের গণ্ডীর মধ্য দিয়া সুধীরে প্রবাহিতা। বিল্বকেশ্বর ও নীলপর্ব্বত গগনে মস্তকোত্তলন করিয়া যেন জননীর ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত চরণের প্রতি চাহিয়া মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে! জলমধ্যে মৎস্যকুলের নির্ভীক আনন্দ-ক্রীড়া চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী,—তীরে ক্ষুদ্র জনপদ, বাজার দোকান লইয়া পর্ব্বত-গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সংযত। শান্তি মৎস্যগুলিকে আহার দিয়া বানরকুলের হাতে বড়ই বিব্রত হইল।

মথুরায় ধ্রুবঘাটের অদূরে পুলের পাশে যমুনার উপর একখানি ভাল দেখিয়া বাসা লওয়া হইল। সেখানে কিছুদিন থাকা হইতে পারে সম্ভাবনায় শান্তি বাড়ি পরিষ্কারের দিকে বেশী করিয়া মনোযোগ প্রদান করিল। প্রাচীনার দল প্রতিদিন শ্যামাকান্তকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যমুনাস্নান ও মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শ্যামাকান্ত বলিতেন,—"আমার মাকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, মা-ই ছেলেকে সঙ্গে করে পথ দেখিয়ে এনেছেন। নহিলে এ বুড়ের কি

সাহস ছিল!" সলজ্জ রাগে রঞ্জিতমুখী বধূ আশীর্ব্বাদের ধূমে জড়সড় হইয়া পড়িত।

মথুরায় দুই সপ্তাহ কাটাইয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বদিন বিশ্রাস্ত ঘাটে ও সতীঘাটে শান্তি আরতি দর্শন করিয়া আসিল। সতীস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার মন এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভারে নত হইয়া পড়িল। সেই অতুল্য আত্মত্যাগী প্রেম ও সতীত্বের পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিয়া সে আনন্দে নিস্পন্দ হইয়া চাহিল। এ কীর্ত্তি আর কাহারও নহে, শুধু ভারতরমণীর! সাগ্রহে নিজের অন্তরমধ্যে সে চাহিয়া দেখিল! দেখিয়া নিজেই ঈষৎ বিস্ময় ও বেদনা অনুভব করিল। কই পুরাকালীন আত্মদানকারিণী পুণ্যবতী সতীর ন্যায় কি সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে? কিছুই সে ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না, বাসে-বুঝি? কিন্তু কই যদি তাহাই হইত, তবে এতদিন কেমন করিয়া সে স্বামীকে ছাড়িয়া নূতনত্বের আনন্দে বিভোর হইয়া আছে! মণিদিদি হইলে পারিত না, সেজবউ, মেজ ঠাকুরঝি, নির্ম্মলা, মালতী, কেহই পারে না। কই যেমন শুনা যায় দেবতার চেয়েও স্বামীকে ভক্তি করা উচিত, সে কি তাই করে? না, ততদূর কৈ? তবে কি সে স্বামীকে ভালবাসে না? শান্তি সারা পথ গাড়ির মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিল, হাঁ বাসে বই কি! তাঁহার একটু মাথা ধরিলেও ত সে বেদনা বোধ করে! তবে?

বাড়ি ফিরিয়া কাজ-কর্ম্ম সারিয়া শ্বশুরকে ঘুম পাড়াইয়া সে আহারান্তে নিজের ঘরে গিয়া নদীর দিকের জানালা খুলিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে বসিল। একটা নূতন কথা যেন তাহার বেদনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাহাকে বুঝি আর চাপা দিয়া রাখা

চলে না! বুঝি হেমেন্দ্রই তাহাকে ভালবাসে না! বংশমর্য্যাদায় হেমেন্দ্র যে শান্তির পিতা অপেক্ষা অনেক বড়,—ধনে মানে রজনীনাথ যে তাহাপেক্ষা অনেক নীচু এবং এককালে তিনি তাহাদের আশ্রিত ছিলেন, এসব কথা সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করাইতে দিতে হেমেন্দ্র কখনও ভুল করিত না। কই একটি দিনও ত শান্তির একটা কাজকেও তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই! তাহার সকল কার্য্যেই একটু শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের সহিত কখন অল্প কখন তীব্র সমালোচনা করা ছাড়া কখনও কি একটা ভাল কথা বলিয়াছেন? বিদুষী, পণ্ডিত মশায়, এজিটেটার প্রভৃতি শব্দগুলাই ত তাঁহার সাদর সম্ভাষণ! সনিশ্বাসে শান্তি ভাবিল, কেমন করিয়া আমি তাঁহার মনের মত হইব? আজন্মের সমুদায় সংস্কার শিক্ষা না ভুলিতে পারিলে বুঝি ভাগ্যে সে সুখ নাই! কিন্তু তাই কি? কেন পারিব না? চেষ্টা করিলে, প্রাণের সঙ্গে যত্ন করিলে পারিব বইকি। সত্য কি তিনি এতই নিষ্ঠুর! জগতে সকলেই ত আর দেবতা নয়; মানুষ কিন্তু অনেকেই, তিনিও তাহার মধ্যে একজন, যদিও আমার তাঁহাকে দেবতা মনে করা উচিত। তাঁহার মন বুঝিয়া আমাকে চলিতেই হইবে।

দেবতার কথায় আর একজনের কথা মনে পড়িল, তাঁহাকে কারণ থাক না থাক সে দেবতা বলিয়াই মনে করে। সে শুনিয়াছে, মিঃ রায় এখন তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র কতখানি উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনার সমস্ত হৃদয়টাকে সেবাব্রতে নিয়োজিত করিয়া তিনি যথাশক্তি দেশপূজা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শান্তি যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহা ফলে নাই! সে অংশতঃ তাঁহার এই উন্নতির মূল ইহা বুঝিয়া আপনার গোপন বেদনা অনেকাংশে

প্রশমিত করিয়াছিল। সে শুনিয়াছে, বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় তিনি একটি অনাথ আশ্রম ও সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আড়ুয়ার ব্যবসায়ের সমুদয় আয় তাহাতেই ব্যয় করিয়া থাকেন এবং নিজেও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে সংসারের সমুদয় ভোগসুখ ডুবাইয়া অক্লান্ত যত্নে সেখানে অধ্যাপনা করিতেছেন। যোগেন্দ্র বলিয়াছে তাঁহার গুরুদেব একজন অসাধারণ ব্যক্তি। মুগ্ধা শান্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার করিয়া প্রণাম করিল। তার পর সে সাশ্রুনেত্রে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে কহিল, "তোমায় শ্রদ্ধা করতাম, ভক্তি করতাম, এখন পূজা করি। তুমি এত মহৎ! এত উচ্চ! তা জানতাম না।"

পরদিন যাইবার গোলমালের মধ্যেও শান্তির মনটা পূর্ব্বরাত্রের গোলযোগে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া রহিল। শ্যামাকান্ত সেটুকুও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরটা কি ভাল নাই, মা?"

শান্তি চোখ তুলিয়া বিষণ্ণভাবে হাসিল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমিত ভালই আছি, জ্যেঠামশায়।"

বৃদ্ধ চিন্তিত মুখে ভাবিতে ভাবিতে প্রশ্ন করিলেন, "রজনীর চিঠি কাল এসেছে! সুপ্রকাশও ত লিখেছে, মা?"

শান্তি ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "হাঁ৷ জ্যেঠামশায়, তাঁরা সবাই ভাল আছেন।"

শ্যামাকান্ত ঈষৎ ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিলেন, "মা হেম ত আর আমাদের চিঠিপত্র লেখে না!" সে কথায় শান্তির বুকের মধ্যে খানিকটা রক্ত আসিয়া হৃৎপিণ্ডের উপর ছলাৎ করিয়া পড়িল। মুখ ঈষৎ নীচু করিয়া সে অঞ্চলের সূত্র টানিতে

লাগিল, তাহার গাল ও কপালটা একটু যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, পাছে জ্যেঠামশায় তাহা ধরিয়া ফেলেন, তাই ভাবিয়া সে সেই রক্তিমাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শ্যামাকান্ত তাঁহার বড় আদরের বধূর প্রতি হেমেন্দ্রের এমন উদাসীন, অনাগ্রহ ব্যবহারে মনে মনে বড়ই ব্যথানুভব করিতেন। হেম যে তাঁহার সহিতও বেশ সদ্ব্যবহার করিত, তাহা নহে! তবে নিজের প্রতি অসম্মান সহ্য করা যায়, কিন্তু শান্তির অপমান অসহ্য! তবু মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতে হইত। কারণ সে শান্তির স্বামী, —সে যদি তাঁহারই শাসন না মানে, তবে কেমন করিয়া তিনি তাহাকে সংশোধন করিবেন! বিশেষ এখন আর সে মনের বলও নাই, সে চেষ্টা বা উদ্যম কিছুই নাই। সে সবই সেই একজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এমন করিয়া তিনি তাহার সকল অন্যায় সকল আব্দার সহিয়া অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহা যে শান্তির পক্ষেই অধিক ক্ষতিজনক হইতেছে ইহা জানিয়া বুঝিয়াও দৌর্ব্বল্যের বশে কিছুমাত্র প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিতেছিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, শ্যামাকান্তের প্রয়োজন ছিল, শান্তিকে! হেমেন্দ্র তাঁহার নিকট তেমন লোভনীয় নহে। কিন্তু এখন আর তাহা বলা চলে না। সে যে শান্তির স্বামী, শান্তির চিরজীবনের সুখ-দুঃখ যে একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে, এ কথা ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। তাই যখন মনে হয়, লোভপরবশ হইয়া শান্তিকে তিনি অযোগ্য হস্তে প্রদান করাইয়াছেন, তখনই আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। কেমন করিয়া হেমেন্দ্রকে শুধরাইয়া তুলিবেন, কি করিলে শান্তির সুখ অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা

জ্বলে গেলো বোন, জ্বলে গেলো ! কোথাকার একটা হাড় হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেছে। মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে একেবারে জলে ফেলে দিয়েছি !”

মাতঙ্গিনী শিবানীকে একটু ভালবাসিতেন, তাহার কষ্ট আপত্তি অনুভব করিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাব করিলেন, “আজ গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখতে যাবে গা, মাসি ?”

শিবানী মৃদুস্বরে উত্তর করিল, “না”।

“কেন বা না। কোথাও কি যেতে নেই নাকি ? এতো কি ভয়, তোকে শালে দেবে, না শূলে দেবে ?”

শিবানীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটু ক্ষোভের সহিত উত্তর করিল, “তার জন্য আমি ভয় করি না, আমার যেতে ইচ্ছে নেই !”

“এমন জেদী মেয়ে কখনো দেখিনি, একগুঁয়ে, মন গুমুরে মনের কথা পাবার যো নেই। ঠাকুর-দেবতা সব গেলো, কেবল স্বোয়ামি, দেবতার অপমান করে স্বোয়ামী-ভক্তি দেখানো, ওই জন্যেই তো স্বোয়ামীর অভো ছেদ্দা—”

শিবানী উঠিয়া দাঁড়াইল, খোলা চুল জড়াইয়া ধীরপদে রান্না-ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, একটিও কথা কহিল না।

প্রৌঢ়াদ্বয় অবাক হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ তাঁহাদের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তার পর সিদ্ধেশ্বরী গালে হাত দিয়া স্তম্ভিত ভাবে কহিলেন, “দেখলে দিদি, ওইতেই তো সে এতো মাথায় চড়েচে, বলি এতোই কি ভাল ? আমি মা, আমার পরামর্শ নে, আমি তোরি ভালর জন্য বলি, আমার কি কর্ব্বি তোরা ? আমি কারু পিত্যেশী নই ত !”

যতই জটিল হইয়া উঠে, ব্যাকুলতা ততই যেন বাড়িতে থাকে। পুত্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। সে যদি ফিরিয়া আসিত! সেই ত তাঁহাদের সকল দুঃখের মূল! সেইদিনই দেওয়ানকে তিনি পত্র লিখিলেন।

"হেমকে বলিও, সে যেন দুই একদিন অন্তর পত্র লিখে। তাহার হস্তলিখিত পত্র না পাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সে যেন ইহার অন্যথা না করে। সে এখন কোথায় আছে, তাহা জানিনা বলিয়া তাহাকে পত্র লিখিলাম না। তুমি এ পত্র তাহাকে দেখাইও।"

কয়দিন পরে উত্তর আসিল, "ছোটবাবু কলিকাতা হইতে আসিলে তাঁহাকে আপনার পত্র দিলাম। তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন, তাঁহার আজকাল সেরূপ অবসর নাই, সেজন্য চিঠি লিখিতে পারেন না, আপনাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? সংবাদ ত পাইতেছেন। নারায়ণগঞ্জের বাগানে সাহেব ভোজের জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, বোধ হয় ইহাতে পাঁচহাজার টাকা খরচ পড়িবে! রাজরাজেশ্বরী দেবীপ্রতিমা গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয় ভাদ্র পূর্ণিমার সময় দেবী প্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিবে। মন্দিরেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু অতিথিশালা বাড়ান এবং ডাক্তারখানা ও কবিরাজি চিকিৎসালয় শেষ হইতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। যাহা হউক ভাদ্র পূর্ণিমায় সমস্তই একপ্রকার দাঁড়াইয়া যাইবে। সেই সময় মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আপনি আসিলেই সমস্ত প্রস্তুত দেখিবেন এবং নিঃসন্দেহ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। ছোটবাবু স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার সহি দিয়া আসিয়াছেন, শুনিলাম। সাহেবের

প্রশ্নে বলিয়াছেন, 'আপনার ইচ্ছাতেই তিনি ইহা দিতে স্বীকার করিতেছেন।' শুনা যায়, সাহেব আপনার জন্য 'রাজা' খেতাবের চেষ্টা করিবেন।"

শ্যামাকান্ত এ পত্র শান্তিকে দেখাইতে পারিলেন না। সরোষে পত্রখানি ছিঁড়িয়া বক্তব্য কথাটা এক সময় বধূকে বলিলেন। শান্তি খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ঠাকুর কি তেমন সুন্দর হবেন! আমি কিন্তু কাশী থেকে জরি চুমকি এনেছি, তারি কাজ দিয়ে নিজে বেনারসী সাড়ি তৈরি করে পরাবো। আর অনেকগুলি গহনা করাতে হবে, না, জ্যেঠামশায়! না হলে মানাবে কেন? ঠাকুরের মাপ নিয়ে কাকা যেন চুড়ি বাউটি আর সোনার মল গড়িয়ে রাখেন। বাকি আমি নিজে পছন্দ করে গড়াবো। খুব ভাল করে সাজাতে হবে জ্যেঠামশায়! না হলে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি মানাবে কেন? আমাদের মা ত সত্যি কাঙ্গালিনী নন। বাবা বলেন, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগদ্ধাত্রী; তাঁর তেমনি মূর্ত্তি হওয়া চাই ত।"

মুগ্ধ শ্যামাকান্ত কহিলেন, "তুমি যা করবে তার কি কিছু খুঁৎ থাকতে পারে, মা! এতদিন যক্ষের ধন কেবল সঞ্চয়ই করেছি। তার যে এমন সদ্ব্যয় হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার আতুরালয় ও অতিথিশালার বন্দোবস্তও নূতন করে করাচ্ছি। এবার দুজন ভাল ডাক্তার ও একজন কবিরাজের জন্য রজনীকে লিখতে হবে।"

আনন্দে বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, "এবার অনেক লোক থাকতে পাবে ত? সে বেশ হবে। ওটার নাম কি থাকবে, জ্যেঠামশায়? ওর নাম থাক না কেন, রাজরাজেশ্বরীর ভাণ্ডার?"

১৯

বৃন্দাবনে যমুনাতীরে তেমন সুবিধামত ভাল বাড়ি পাওয়া গেল না। সেজন্য একটু দূরে রাস্তার উপরেই এক প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ির একটা অংশ ভাড়া লওয়া হইল। সেদিন বাদলে ঘাটে বেশী লোকজন ছিল না। একটু বেলা করিয়া সকলের কাছে সাম্নুনয়ে সম্মতি সংগ্রহ করিয়া শান্তি যখন প্রাচীনা এবং অল্প-সংখ্যক যুবতী বালিকাদলের সহিত যমুনায় স্নান করিতে আসিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘাটে জনতা করিয়া ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছিল এবং এক পাশে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে কাপড় কাচিতেছিল। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। শান্তি তাহাকে দেখিয়া সানন্দে তাহার মাসতুত বোনকে বলিল, "সেজদি, দেখ, ওই মেয়েটি কেমন সুন্দর? এস না ওর সঙ্গে ভাব করি?" সেজদিদি যুবতীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তাচ্ছল্যভাবে উত্তর করিলেন, "সুন্দর ত কত! নাও, চান করে নাও, কোথাকার কে লোক, আমাদের অত খোঁজে দরকার কি?"

কাপড় কাচিয়া একটা ডুব দিয়া উঠিয়া যুবতী সিঁড়ির উপর হইতে পিত্তলের কলসী তুলিতে গিয়া দেখিল, এক যোড়া উজ্জ্বল কালোচোখ সিঁড়ির উপর হইতে বিস্ময়ের সহিত তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

শান্তির একেই মিশুনে স্বভাব। তাহার উপর এই খোট্টার মুলুকে অল্পবয়স্কা সুন্দরী বাঙ্গালিনী দেখিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ধীরে ধীরে

তাহার কাছে আসিয়া একটু ইতস্তত করিয়াই মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ি কোথা, ভাই!

যুবতী ঈষৎ বিস্মিত ভাবে শান্তির আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উত্তর দিল,"এই ঘাটের উপরেই আমাদের বাড়ি। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ?"

মাথায় নদীর জল একটু ছিটাইয়া দিয়া আলতাপরা-পাদুটি জলে ডুবাইতে ডুবাইতে শান্তি কহিল, "আমাদের বাড়ি, লক্ষ্মীপুরে। আচ্ছা, ভাই, এখানে তোমরাও ত তীর্থ করতে এসেছ ?"

"না, এখানেই আমাদের বাড়ি।"

"বাপের বাড়ি, না শ্বশুর-বাড়ি, ভাই ?"

"বাপের বাড়ি!"

"আচ্ছা, তোমার শ্বশুর-বাড়ি কোথা ভাই ?"

রমণী ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনুচ্চ স্বরে উত্তর দিল, "জানি না।" বলিয়াই ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া মাথা মুছিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া শান্তি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেও সে বিষয়ে তখন কৌতূহল দমন করিয়া রাখিল। কিন্তু অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই সে জানিয়া লইল যে, তাহার নব-পরিচিতার নাম শিবানী, তাহার একটি শিশুসন্তান ও মা ভিন্ন আর কেহই নাই।

শুনিয়া শান্তির বড় কষ্ট বোধ হইল। শান্তির সঙ্গিনীরা তাহাকে 'গুঁড়ি-গুঁড়ি' বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া যাহার-তাহার সহিত বহুক্ষণ গল্প করিতে দেখিয়া মৃদু অনুযোগ করিতে লাগিলেন। মাসিমা বলিলেন, "একি মা তোমার নীলেখেলা! নিজের সোনার শরীরে একটুও কি মায়া নেই গা!"

কাকিমা কহিলেন, "পাগলীর বেটির আমার সকল তাতেই পাগলামী। এমন করে কি তোমার মাঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত, বাছা! নাও, চান করে ঘরে চল, অসুখ-বিসুখ হয় ত আমরা মাথা চাপড়ে মরব তখন।" ঠানদি কহিলেন, "নাত বৌ, তোমার ভাই সকলি বাড়াবাড়ি। যদি ব্যায়রাম হয়, শ্যামাকান্ত আমাদেরই বকবেন, ওঠ।" অপরা আর একটু মাত্রা চড়াইলেন; আঁচল দিয়া বধূর অঙ্গের বৃষ্টির জলকণা মুছাইয়া কহিলেন, "আহা, মা যেন আমার এ পিরথিবির নন! অনাথ আতুর দেখলে, মায়ের আমার কচি প্রাণটি গলে পড়ে। তা যেও গো, বাছা! একদিন আমাদের বাসায় যেও। মায়ের আমাদের দয়ার শরীর।"

শান্তি লজ্জায় মাটি হইয়া গেল। শিবানীর স্থির চক্ষে ঈষৎ কৌতুকের হাসি অত্যন্ত সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিল। সে কলসী লইয়া আবার জলে নামিয়া গামছা কাচিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সলজ্জে চুপি চুপি শান্তি তাহাকে বলিল, "ওঁদের কথায় তুমি কিছু মনে করো না ভাই, মাপ করো।" শিবানীর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটিতে ফুটিতে আবার মিলাইয়া গেল, সে তেমনই প্রশান্তভাবে উত্তর দিল, "কিছু না।" তারপর ভিজা গামছা কাঁধে ফেলিয়া মাজা কলসীতে জল ভরিতে লাগিল।

সঙ্কুচিতভাবে শান্তি কহিল, "আচ্ছা, ভাই, কাল আবার আমি এই সময় স্নান করতে আসবো, তুমিও তখন এসনা? তোমাদের বাড়িত খুবই কাছে!" শিবানীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই ছিল না। সে শান্তির গহনা বস্ত্র ও সঙ্গের লোকজন দেখিয়া তাহাকে 'বড়লোকের বধূ' বলিয়া বুঝিয়াছিল। গরীব শিবানীর প্রতি তাহার

এই সহৃদয় ব্যবহার, যাহা দেখিয়া পাঁচজনের দয়া বলিয়া মনে হয়, তাহা পাইবার জন্য শিবানী কিছুমাত্র উৎসুক ছিল না। পৃথিবীর মধ্যে এই বস্তুটিকেই সে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করে। শান্তির আগ্রহে সেইজন্য সে টলিল না। নিজের অক্ষুণ্ন গর্ব্বের মধ্য হইতে সচল পাষাণ প্রতিমার মত ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়া কোনদিকে আর লক্ষ্যমাত্র না করিয়া পূর্ণকুম্ভকক্ষে ধীরে ধীরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল। পশ্চাতে আর ফিরিয়াও দেখিল না। তাহার আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পদ-চিহ্নগুলি সিঁড়ির ধাপের উপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়া রহিল। ভিজা কাপড় ক্ষীণ দেহে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার ম্লান সৌন্দর্য্যটিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সকলই শান্তির চোখে যেন নূতন ঠেকিতেছিল! সে আকৃষ্টভাবে সেইদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি পটবস্ত্র ছাড়িয়া শ্বশুরকে প্রতিদিনকার মত খাওয়াইতে বসিলে, শ্যামাকান্ত সহসা প্রশ্ন করিলেন, "হেম কি চিঠি লিখেছে?"

শান্তি নীরবে ঘাড় নাড়িল। তাহার নিজের দুঃখে সে তাঁহাকে দুঃখিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক থাকিলেও মিথ্যা কথাই বা কেমন করিয়া বলিবে! শ্যামাকান্ত আর একটিও কথা না বলিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। আজকাল এই ছোটখাট ব্যাপারটি লইয়া তাঁহার মন অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। নিজের দিন ত ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার এই জীর্ণ তরীতে যে ক্ষুদ্র আরোহীটিকে তিনি কূলের আশ্রয় জনপদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন, মাঝনদীতে

তাহাকে তিনি কোন আনাড়ি মাঝির হাতে ফেলিয়া যাইবেন! এ কি করিলেন? নিজের স্বার্থ খুঁজিতে গিয়া শান্তিকে তিনি কি জন্মদুঃখিনী করিয়া ফেলিলেন না কি? হেম এ কি হইয়া উঠিতেছে! মনের দুঃখে সেদিন আহার্য্য যেন তাঁহার মুখে উঠিতে চাহিতেছিল না।

শান্তি তাহা বুঝিতে পারিল। সে তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় অন্য কথা পাড়িতে গেল! গল্প করিবার ভাবে বলিল, "আজ ঘাটে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে দেখে এলাম, জ্যেঠামশায়, আহা, তার মা আর একটি ছেলে ভিন্ন আর কেউ নেই। তার বড় কষ্ট, না, জ্যেঠামশায়?"

শ্যামাকান্ত এ সংবাদে একটু সহানুভূতি দেখান উচিত ভাবিয়া বলিলেন, "সত্যি! বড্ড কষ্ট ত।" কিন্তু মনের মধ্যে মা ও একটি ছেলে ভিন্ন আর কেহ না থাকা যে খুব কষ্টকর তাঁহার এমন বিশ্বাসই ছিল না।

"হ্যাঁ, জ্যেঠামশায়! তার বড্ড কষ্ট বই কি! সে সধবা কি না জানি না, সে কথা কিছু বল্লে না, কিন্তু হাতে লোহা আছে, আর বালা আছে। তাতেই তাকে কত সুন্দর দেখাচ্চে যে! অনেকে গয়না পরলেও অমন হাত মানায় না। তার ধরণও খুব উঁচু। আর মুখখানি কি সুন্দর! চোখদুটি যেন ঠিক সুকুর মত।" শ্যামাকান্ত ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিলেন, "তাকে কি দিতে হবে, মা? সে তোমার সঙ্গে এসেছে, বুঝি?"

শান্তি অপ্রতিভভাবে বাধা দিল, "না, না, সে খুব গরীব নয়। সে কিছু চায় না। আচ্ছা, জ্যেঠামশায়! আমি যদি স্নান করতে গিয়ে তার বাড়ি যাই, তাহলে কিছু দোষ আছে?

ঠিক ঘাটের উপরেই তাদের বাড়ি। আমার তাকে খুব ভাল লেগেছে।”

“কেন মা! তুমি যা ইচ্ছা হয়, করতে পার, কখন ত অন্যায় ইচ্ছা কর না! তাতে দোষ কিসের? তোমার মাসিমাকে নিয়ে যেও।”

এমন সময় নিরামিষ অম্বলের বাটি হাতে মাসীঠাকুরাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগা! কোথায় যাবার কথা বলছেন?”

শ্যামাকান্ত কথাটা বলিলেন, শুনিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া মাসিমা সাতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন,“ওমা, পাগলীর কথা শোন একবার! তুমি সে কুঁড়ের ভেতর কোন দুঃখে যাবে গা, রাণী!” বলিয়া শান্তির চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। “আমার সোণার সীতে! তা চৌধুরীমশাই, আপনার বেটা বৌয়ের কল্যাণে যাহোক পাপমুখে বলতে নেই, যা মনের সাধ ছিল, তা মিটেছে। এখন একবার বন করতে যদি সরকারমশায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন,তাহলেই সাঙ্গ হয়।”

শ্যামাকান্ত স্বীকার করিলেন। তাঁহার চিত্তে যে বিষাদের ঢেউটা আজ কাল ক্রমাগত উঠিতে পড়িতেছিল, তাহা তাঁহাকে কেমন যেন দুর্ব্বল ও খিটখিটে করিয়া তুলিয়াছিল। শান্তির চেষ্টা-করিয়া-পাড়া তাহারই ছোটবেলার কথা কহিতে কহিতে সে বিষাদতরঙ্গ কোন সময়টায় তাহার প্রাণখোলা সরল হাস্য-লহরীর বিভিন্ন গতিতে হৃদয়-প্রান্তে মিলাইয়া পড়িয়াছিল। মানুষ কেবল বন্ধনে জড়িত হইতেই ভালবাসে। বন্ধন-মুক্তির অবস্থাটা ভগবানের দেওয়া যে কত বড় দান, সে কথা সে ভাবিতেও চেষ্টা না করিয়া সেই শুভ সুযোগকে অবহেলায় ফিরাইয়া দিয়া চির-হাহাকার গ্রহণ করিয়া থাকে। রহস্যময় জগতে এ বড় নিগূঢ় রহস্য!

২০

প্রথম প্রথম স্নানের ঘাটে ও তারপর দুপুরবেলা শিবানীর জীর্ণ গৃহেও শান্তি আসিতে আরম্ভ করিল। শিবানী প্রথম প্রথম ইহাতে অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিত। কারণ মানুষ বাড়ি আসিলেই ভদ্রতার খাতিরে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তাহাকে একটু যত্ন আতিথ্য দেখাইতে হয়। কিন্তু শিবানী তাহার নিজের অভেদ্য গাম্ভীর্য্য-বর্ম্ম পরিয়া চারিপাশের পৃথিবীটাকে নিজের নিকট হইতে বহুদূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নিজের অচল ধ্যানাসনে স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। জনসঙ্গ তাহার প্রার্থিত নয়। এজন্য শান্তির অতিরিক্ত আদর তাহার পক্ষে প্রথমটা ক্লেশদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। সাধক তাহার সাধনার ব্যাঘাতে যেমন কষ্ট অনুভব করে, সে তেমনই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কি এক অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে, সে সৌন্দর্য্য বাহিরের বা ভিতরের হোক না কেন, তাহার সংস্পর্শে আসিলেই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট হইতেই হইবে। শান্তির এই উভয় সৌন্দর্য্যই শিবানীর কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। লোহা কাটিয়া যে অস্ত্র গিয়া বক্ষে বিঁধে, তাহার শক্তি বড় সামান্য নহে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গরীবের মেয়ে শিবানী রাজবধূ শান্তিকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিল।

শান্তি অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য সে এপর্য্যন্ত একদিনও তাহাকে তাহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করে নাই, তাহাদের সাংসারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটিও প্রশ্ন করে নাই এবং তাহাকে সাহায্য করিবারও চেষ্টা পায় নাই। আজ যখন

তাহারা পর-পরের অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ছলছুতায় কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, সে তাহার শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়াছে যে, তাহারা একবার শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে! শান্তি বলিল, "আচ্ছা, ভাই, তাঁর নিজের কোন ফটো কি হাতের লেখা কিছুই কি তোমার কাছে নেই? শুধু ওই হীরের আংটি?"

সেই ক্ষুদ্র ঘরের জানালার নিকট বসিয়া দুইজনে কথা হইতেছিল। অদূরে শিবানীর পুত্র সদ্যোপ্রাপ্ত উপহারের চুপড়িটি লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চুপড়ি হইতে রঙ্গিন কাঠের খেলনাগুলা নামাইতে নামাইতে 'এতা খোয়া, এতা গয়ু, এতা হুম্মান।' ইত্যাদি যথেচ্ছ নামে যাহাকে খুসি অভিহিত করিতেছিল, নিজের বুদ্ধির উপর যে তাহার এতটুকু অবিশ্বাস আছে, তাহার কিছুমাত্র লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না।

কথাটা শুনিয়াই শিবানী প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আর কেন? সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, সে স্বপ্ন আর জাগান কেন? তুমি আমায় ভালবাস, আমার উপকার করতে চাইছ, কর, কিন্তু আমি জানি না যে, তাতে আমার ঠিক উপকার কি অপকার হবে। যদি এ বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে যায়, যদি সত্যই জানতে পারি, আমি বিধবা, তবে কি নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকব, ভাই?"

শিবানীর কণ্ঠ শান্তির চিত্তে কঠোরভাবে আঘাত লাগাইল। ব্যস্ত হইয়া শান্তি বাধা দিল, "না ভাই, নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে আছেন।"

"তা বোন, এ কলিকাল! এখন কি আর মা মাসির উপদেশ চলে, এখন নিজেরাই নিজেদের আইনকর্ত্তা।"

"মরুকগে, নিজেই ভুগবেন, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর—তোরি ভালর জন্যে বলে মরি, না শুনিস যা খুসী কর্! মেয়েমানুষের একটু তেজ থাকা ভাল, তোরি ভাত খেয়ে তোকেই যে পায় থেঁতলায়, তোর সহ্যিই বা হয় কেমন করে? চাকুরী করুক, ধরে মাল্লেও সইবি; তা নয়, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলো-পানা চক্কোর! হরি দয়াময়! চলোগো দিদি, আমরা যাই চলো।"

সমুন্নত মন্দিরচূড়াশালিনী সুষুপ্তা নগরীর পদধৌত করিয়া নিৰ্ম্মল-সলিলা যমুনা বহিয়া চলিয়াছে। জ্যোৎস্নায় কালো জলে মাণিক জ্বলিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড মন্দির বা প্রাসাদের ছায়া নদীবক্ষে আরো অন্ধকার ঢালিয়া রাখিয়াছে, কোথাও-বা পুরাতন বটবৃক্ষের পত্রান্তরালে জ্যোৎস্নালোক জোনাকির মত মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

নদীর কোলাহলমুখরিত ঘাটগুলি প্রায় নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। ক্বচিৎ দুই একটা ঘাটে পান্সি বা নৌকায় যাত্রীদের মধ্যে কাহারো সাড়া পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের নিকট শিবানী একা বসিয়া যমুনার দিকে চাহিয়াছিল। জ্যোৎস্নার আলো তাহার সুশ্যাম বর্ণটিকে আরো উজ্জ্বল করিয়াছিল, শান্ত মুখখানিতে পড়ায়, তাহার গম্ভীর মুখ আজ আরো গম্ভীর দেখাইতেছিল! সাইক্লোনের পূর্ব্বে সমুদ্রের যেমন একটা স্তব্ধ ভাব হয়, আজ

শিবানী সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় মৃদুস্বরে কহিল, "তাই বল ভাই, তাই বল, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তবু বল আবার তিনি আসবেন।"

বিদায়-কালে শান্তি ক্রীড়ারত অমূল্যকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিল, "কই সে আংটিটা দিলে না?" শিবানী কাঠের সিন্দুক খুলিয়া একখানি কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফ ও আংটিটি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "এই দুটি তাঁর মার জিনিষ, আমায় রাখতে দিয়েছিলেন, তাঁর আর কোন চিহ্নই আমার কাছে নেই।"

শান্তি অমূল্যকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, শিবানীও তাহার অনুসরণ করিল, গাড়িতে উঠিতে উঠিতে মুখ ফিরাইয়া শান্তি শিবানীর দিকে চাহিল, মৃদু হাসিয়া অমূল্যকুমারকে দেখাইয়া বলিল, "কেমন, তোমার ছেলে নিয়ে যাই?" শিবানী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিল। শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া ছেলেকে তাহার মায়ের কাছে দিয়া বিনীতভাবে বলিল, "একদিন আমাদের ওখানে পায়ের ধুলো পড়বে না?"

"যাব বৈকি" বলিয়া শিবানী চুপ করিল। কোথাও যাওয়া যেন তাহার পক্ষে মস্ত দায়। "তবে কালই যেও ভাই। সকালেই আমি তবে গাড়ি পাঠাব। মাসিমাকেও নিয়ে যেও, তাঁকে আজ বলে যাওয়া হল না।"

"কালই? আচ্ছা," বলিয়া শিবানী ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। সে ছুটিয়া তাহার পরিত্যক্ত খেলেনা লইতে চলিয়া গেল। শান্তি গাড়িতে উঠিতে গিয়া আবার ফিরিয়া

আসিল, "একটা কথা, তোমার স্বামীর নামটা ত জানা চাই।" শিবানী উত্তর দিল, "কাল লিখে দিলে হবে না? কেমন করে বলবো!"

সে রাত্রে শ্যামাকান্তের শরীর ও মন তেমন সুস্থ ছিল না বলিয়া তিনি কিছুই আহার করিলেন না। বধূর সঙ্গেও বেশী কথাবার্ত্তা হইল না, কাজেই সেদিন আংটি ও ছবি বাক্সের মধ্যেই পড়িয়া রহিল।

পর দিন মাতঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া শিবানী সখীর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিল। শান্তি অমূল্যকে ও নিমন্ত্রিতাদ্বয়কে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। শ্যামাকান্ত আহার করিতে বসিলে তাহাদের অন্য ঘরে বসাইয়া রাখিয়া শান্তি অমূল্যকুমারকে কোলে লইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। এমন চাঁদের মত ছেলেটি জ্যেঠামশায়কে না দেখাইয়া তাহার আরাম হইতেছিল না। শ্যামাকান্ত মাথা নীচু করিয়া অন্যমনস্কভাবে আহার করিতেছিলেন, তাহার চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছেলেটি কাদের, মা?"

শান্তি শিশুকে কোল হইতে নামাইয়া পাখা হাতে লইয়া শ্বশুরের কাছে বসিল। অমূল্য সবিস্ময়ে তাহার বড় বড় চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া, শান্তির গায় হেলান দিয়া বৃদ্ধকে দেখিতে লাগিল। শান্তি পরিচয় দিল, "সেই যে মেয়েটির নাম শিবানী, যার কথা আপনাকে বলেছিলেম, ছেলেটি তারই। বেশ সুন্দর, নয়?"

শ্যামাকান্ত একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে চসমা জোড়াটার মধ্য হইতে শিশুকে দেখিতে লাগিলেন। সে অপরিচিত দৃষ্টিতে বালক যেন কেমন একটু

বিব্রত হইয়া শান্তির কাছে আরও ঘেঁসিয়া আসিল, তার পর সেও মুখের মধ্যে একটা অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া গম্ভীর-ভাবে তাঁহার দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। শ্যামাকান্ত হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আবার একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং বুকখানা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, দৃষ্টি যেন সেখান হইতে আর ফিরিতে চাহিতেছিল না। তারপর সহসা একান্ত কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, একে কোথা থেকে নিয়ে এলি মা? আমার সেই ছোট্ট মুখখানি, ওরে, সে যে এখনও স্পষ্ট এই বুকের ভিতর আঁকা রয়েছে! এ যে তারই জীবন্ত ছায়া, এ যে সেই—আমার বিনো! ওরে আমার বিনো! আবার কি তুই তেমনি ছোট্টটি হয়ে আমায় দেখা দিতে এলি রে?" বলিতে বলিতে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত বৃদ্ধ আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন, অত্যন্ত বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "পাগলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছ, মা! কিন্তু সবটাই পাগলামী নয়। একে দেখে আমার একটি ছোট্ট মুখ মনে আসছে! সুন্দর ছেলেরা বুঝি ছোট বেলায় এক রকমই থাকে? বেশ ছেলেটি, এস ত, দাদা, আমার কাছে এস ত, ভাই!" বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি শিশুর দিকে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। শান্তির মৃদু অনুরোধে বালক ঈষৎ ভয়ে ভয়ে শ্যামাকান্তের নিকট এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। শ্যামাকান্ত তাহাকে দুই হাতে টানিয়া কোলে বসাইয়া অতৃপ্ত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। "দেখ মা, খোকার হাতখানি ঠিক তার মত, কপাল, চুল, চোখ;—কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! তোমার নামটি আমায় বলত, দাদা!"

বালক একবার অদূরবর্ত্তিনী শান্তির দিকে চাহিয়া সভয়ে ধীরে ধীরে' বলিল, "অমূয়কুমায় চৌধুয়ী।" সে শান্তির নিকটেই নিজের নাম বলিতে শিখিয়াছিল।

"অমূল্যকুমার চৌধুরী! চৌধুরী? তোমার বাবার নাম কি জান, খোকা?"

বাবা শব্দটা বালকের তেমন পরিচিত নহে! সে ভাল ইহার অর্থবোধ করিতে পারিল না, একবার ইহার একবার উহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল! শান্তি বলিল, "আমি জেনেছি, তাঁর নাম ছিল নীরদকুমার চৌধুরী, তাঁরাও বারেন্দ্র শ্রেণী!"

শ্যামাকান্তের মুখে ঘোর হতাশার চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু শান্তি তাহা লক্ষ্য করিল না; অঞ্চলপ্রান্ত হইতে অঙ্গুরী ও ছবিখানা বাহির করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল, "তাঁর দেশ কোনখানে, সে কথা পর্য্যন্ত তিনি শিবানীকে জানান নি, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'যখন সময় আসবে, তখন নিজেই বলব, এখন মনে কর, আমার অজ্ঞাতবাস।' এই একটি হীরার আংটি ও একখানি ছবিমাত্র তিনি রেখে গেছেন, এ থেকে যদি সন্ধান করা যায়, তাই আমি এ দুটি চেয়ে এনেছি।" বলিতে বলিতে সে মোড়ক খুলিয়া ছবিখানার উপর নেত্রপাত করিল। সে চিত্র একটি মধ্যবয়স্কা সুন্দরী রমণীর। অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও চেহারা চিনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না। ছবির দিকে চাহিয়াই শান্তি চমকিয়া উঠিল, "একি এ কার ফটো! এ শিবানীর শাশুড়ির কেন হবে? এ যে জ্যেঠাইমার!"

"কি? কি বল্লে মা?" আগ্রহতাড়িত উচ্চকণ্ঠে এই কথা

বলিয়া তাড়াতাড়ি শ্যামাকান্ত বধূর হাত হইতে ফটোগ্রাফখানা টানিয়া লইলেন! দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তার পর শিথিল অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া চিত্রখানা ভূমে পড়িয়া গেল।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না, এই অচিন্তনীয় ব্যাপারে শোকাহত বৃদ্ধ এবং চঞ্চলচিত্ত বালিকা উভয়েই মহা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জড়ের মত হইয়া রহিল। তার পর প্রথমে শান্তির অবসন্ন শরীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, সে সেই হীরকাঙ্গুরীয়টা তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে ধরিল, "তবে দেখুন দেখি, এটাও চেনেন কি না! এটা তিনি শিবানীকে যত্ন করে রাখ্‌তে বলেছিলেন।"

শ্যামাকান্ত বিদ্যুৎ-তাড়িতবৎ চমকিয়া উঠিলেন, "আংটি? ঠিক কথা! তার মায়ের নাম লেখা হীরার আংটি একটা তার হাতে থাকৃত, তার মায়ের শেষকালের দেওয়া জিনিষ বলে সেটার তার কাছে খুব আদর ছিল। তাই সে সর্ব্বদা সেটা আঙুলে পরে থাকত, ভিতর দিকে কিছু লেখা আছে কি না, দেখ ত মা! সেটাতে যে তার নাম লেখা ছিল মনে হচ্চে।" শান্তি শ্বশুরের নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিল, অঙ্গুরীর ভিতর দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে "ভুবনমোহিনী" নাম খোদা আছে। আংটিটা শ্বশুরের হাতে দিয়া পুলক-কম্পিত স্বরে কহিল, "আছে"।

শ্যামাকান্ত নামটা পড়িয়া আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, শিশুকে উভয় বাহুর মধ্যে টানিয়া সবলে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখের অবিশ্রান্ত ধারায় হতবুদ্ধি বালকের অনাবৃত অঙ্গ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। সে কিন্তু এই অঘটিতপূর্ব্ব

কাণ্ডে এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাই-তেও ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ক্রন্দন দেখিতে লাগিল !

শান্তি চোখের জল মুছিতে মুছিতে শিবানীর নিকট ছুটিল। তাহার কাছে এই মুহূর্ত্তেই যেন সে নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। ছি, ছি, এ সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত অধিকারিণী যে, সে কি না আজ দীনা অনাথিনীভাবে কোথায় পড়িয়া আছে, আর তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে, কে ? না, সে নিজে !

শান্তির সহিত অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতাপ্রায় শিবানী আসিয়া যখন শ্বশুরের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া নতমুখে বসিয়া পড়িল, তখন শ্যামাকান্ত বক্ষবদ্ধ নাতিকে নামাইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর হাতদুইখানা নিজের কম্পিত শীর্ণ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন, তাহার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, মা, আমার হারানিধি আবার কেন হারালি, মা ! আমার অমূল্যধনকে কেন আমায় এতদিন দিসনি মা ? আমার নয়নতারা হারিয়ে যে আমি অন্ধ হয়ে গেছলুম !" স্বামিহীনা ও পুত্রহারার বিরহসন্তপ্ত চিত্তের অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে উভয়ের একমাত্র ধ্রুবতারার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অমূল্যের আজ অভিষেক হইয়া গেল। সেও কান্না দেখিয়া বেশিক্ষণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সহসা ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শান্তিও সে দৃশ্য আর বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, সুখের হউক আর দুঃখেরই হউক, কাহারও অশ্রুজল তাহার বুকে বড়ই বাজিত। সে নিজের উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিতে করিতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনই পিতাকে যখন সে পত্র লিখিতে বসিল,

প্রথমেই এই শুভসংবাদ দিতে ভুলিল না। অতীত ও বর্ত্তমানের সকল সংবাদ জানাইয়া লিখিল, "বাবা, আপনি কি মনে করিতেছেন? আমার ভাসুর কি বাঁচিয়া নাই? আমার কিন্তু আজ আবার অত্যন্ত আশা হইতেছে। নিশ্চয়ই তিনি বাঁচিয়া আছেন, আবার আসিবেন।"

সেদিন আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসে বিষাদের সুরটাই ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। অশ্রুর উৎস একবার বহিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাকে থামান যায় না। শিবানীর স্থির গাম্ভীর্য্য ঘোর বিষাদের রূপে ঝরিয়া পড়িতেছে। এতদিন সে যেন কোনখানেই এতটুকু আলোক দেখিতে পাইতেছিল না! সমস্ত জীবনটাই যেন তাহার পক্ষে একটা অভেদ্য রহস্যময় জটিল উপন্যাসের মত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বপ্নের স্মৃতি ও বাকী সবটা অন্ধকার লইয়া তাহার শূন্য হৃদয়খানা হাহা করিয়া ফিরিতেছিল। মৃত্যুর যুগান্তরব্যাপী অন্ধকারের মত তাহা যেন তাহাকে একটা অচ্ছেদ্য নাগপাশে আঁটিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কোথাও সে এমন একটু ফাঁক পাইত না যে, সেখান দিয়া তাহার বন্ধনমুক্ত প্রাণটা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত হাল্কা হইয়া বাহিরের বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। আজ সহসা সেই জীবনরঙ্গের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল। আজ সকল প্রহেলিকা তাহার নিকট সত্যের আলোকে পরিষ্কার হইয়া গেল! সেই দুর্জ্জেয় অভিমানও আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সে বাণবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে লুটাইয়া পড়িল! হায়, যে জন রাজ্যেশ্বর রাজা, দরিদ্রা নির্গুণা শিবানী তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে? এই অতুল পিতৃস্নেহও যে অভিমানকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, সে কি শিবানীর প্রেমে প্রতিহত হইবার?

সেদিন মাতঙ্গিনীর বড় আনন্দের দিন। সত্যই তিনি নিরাশ্রয়া বালিকার জন্য মনে মনে বড়ই উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। আজ অকস্মাৎ সেই শিবানী এই রাজ্যেশ্বরতুল্য ধনপতির একমাত্র পুত্রের বধূ জানিয়া, তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "মাগো, তোর যে একটা হিল্লে হল, এ আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই। আমার বিশ্বাস, নীরদ আমার বেঁচে আছেন, আবার তাঁকে তুমি ফিরে পাবে মা, রাজরাণী হয়ে স্বামী-পুত্তুর নিয়ে সুখে ঘর করবে। আহা, দিদি যদি এখন এখানে থাকত, কে জানে ঠাকুরবাড়ী থেকে কতদিনেই ফিরবে, ইচ্ছে করছে যে, ছুটে গিয়ে খপরটা দিয়ে আসি।" শিবানীও তখন মার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইতেছিল।

দিন দুই পরে বনভ্রমণ সারিয়া প্রবীণার দল ফিরিয়া আসিলেন, মাসিমা অর্দ্ধেকটা শুনিয়াই শিবানীর চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক সস্নেহে নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ওমা তাই জন্যেই সেদিন তোমায় দেখে আমার মনটা এমন চঞ্চল হয়েছিল বটে। কদিন ধরেই ভাবছি, বলি উটি বুঝি আমার আর জন্মের মেয়েগো!" তারপর ক্রন্দনজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো বিনুর বৌ যে আমার পেটের মেয়ের বাড়া গো! ওরে বিনু, বাবারে, এমন সোনার প্রীতিমে ভাসিয়ে দিয়ে তুই কোন প্রাণে পালালি রে? ওগো, এমন চাঁদের মত পৌত্তুর থাকৃতে চৌধুরী মশাই কোন্ প্রাণে পুষ্যিবেটা নিলেগো!

শ্যামাকান্ত বলিলেন, "এখন আমার দুজন মা হলেন! মা, বৌমা হবেন বড় মা, আর তুমি ত মা আছই। এবার তবে বাড়ি

ফেরা যাক মা। রাজরাজেশ্বরী-প্রতিষ্ঠার আর ত বেশী দেরি নাই!"

শান্তি একটু ভাবিয়া বলিল, "দিদির মা পুরী থেকে ফেরা অবধি অপেক্ষা করলে ভাল হয় না? এখনও ত দশদিন সময় আছে।"

২১

সে দিন লক্ষ্মীপুরে চৌধুরীবাড়ীতে ভারী ধূম।

ঠাকুরদালানের মোটা মোটা থামের মাথায় দেবদারু পত্রের বিচিত্র ফটক; দ্বারে দ্বারে আমপাতার মালা ঝুলান, রাঙ্গা নিশানে লাগান সরু মোটা নানা আকারের জরিগুলা রৌদ্র পড়িয়া ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছিল। পুরাতন মন্দিরের মধ্যে রূপার দোলনায় রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত; ধূপের পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিতেছিল। মন্দিরের অন্য ভাগে রাধা-শ্যামের পার্শ্বেই এক মর্ম্মরবেদীর উপর রজতকান্তি মহাদেবের বক্ষোপরি বিরাজিতা অসুরনাশিনী মহাশক্তি। কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কণ্ঠের মুণ্ডমালা, হস্তে জ্ঞান-অসি ধারণ করিয়া তিনি অজ্ঞানরূপী দানব সকলকে নিহত করিতেছেন, মার যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পদস্পর্শে শিবও শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। পরমা প্রকৃতি এক্ষণে পরমাত্মা সংমিলনে সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী। শ্যামামন্দিরের বামভাগে নূতন মন্দির উঠিয়াছে, সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত দুগ্ধফেনশুভ্র দেবালয় নির্ম্মল সূর্য্যালোকে সবুজ গাছগুলার মাঝখানে নীল আকাশের প্রান্তে পুঞ্জীকৃত শুভ্র মেঘখণ্ডের মত দেখাইতেছে। পত্রে পুষ্পে মঙ্গল ঘট ও কদলী বৃক্ষে সুশোভিত এই মন্দির শান্তির সাধের রাজরাজেশ্বরীর মন্দির। আজ মহাসমারোহের সহিত এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া গেল। মন্দিরের হোমাদি বহুক্ষণ

হইয়া গিয়াছে, এখনও চণ্ডীপাঠ শেষ হয় নাই। দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে পণ্ডিত হরিনারায়ণ ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে সুললিত ভাষায় পাঠ করিতেছিলেন.

দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য,
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বন্
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য" ॥

ফোঁটা তিলক ও কণ্ঠীধারী ভক্তগণ এবং ছাইমাখা গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী অবধূত অনেকগুলি একত্র হইয়া কেহ রাধাশ্যাম-মন্দিরের দালানে কেহ শ্যামা বা রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে তর্ক-বিতর্ক কলহ-কোলাহলের দ্বারা পূজা-বাড়ি সরগরম রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালায় আজ সুবৃহৎ যজ্ঞের ব্যাপার চলিতেছিল। শান্তি সর্ব্বাগ্রে দেবী দর্শন করিতে আসিয়াছিল। জয়পুরী শিল্পীর ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সেই মর্ম্মর প্রতিমাকে স্বহস্তে অলঙ্কার-বস্ত্রে সাজাইয়া সে ভক্তি ও আনন্দের আবেগে বাক্‌শূন্য হইয়া অপলকে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন চারিদিক হইতে দেবীর অভিষেক-দ্রব্য-সম্ভার আনীত হইতেছে; লোকে লোকারণ্য। শ্যামাকান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মা, যেমন চেয়েছিলে, তেমন পেয়েছ ত?"

বধূ সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া পরে বলিল, "কিন্তু সেদিন ভটচাযি্য মশায়ের কাছেই শুনেছি, তপস্যা দ্বারা প্রথমে মহারুদ্র-রূপিণীকে প্রসন্না করতে পারলে, তবে সাধক তাঁর রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখতে পায়। ঘোর ঝঞ্ঝা অমাবস্যা ও শ্মশান তাঁর সাধনার স্থল,

তাহারো মুখে সেইরূপ ভীম গম্ভীর ভাব। অথচ চোখে মুখে কোথাও একটা চাঞ্চল্য বা ক্রোধের লক্ষণ ছিল না।

এক পার্শ্বে নীরদকুমারের আহার্য্য ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তক্তাপোষের উপর মসারি ঢাকা শয্যা, ঘর জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। দূরে দেবালয়ে ঘণ্টা বাজিয়া গেল। শেঠজীর মন্দিরে দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তাহার পর আবার সব নিস্তব্ধ। শিবানী স্থিরদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল। একটা দুইটা তিনটা বাজিয়া গেল, চাঁদের আলো ক্রমেই অনুজ্জ্বল হইয়া আসিল, শিবানীর মুখের উপর হইতে জ্যোৎস্নালোক সরিয়া গেল, ঘর ক্রমেই অন্ধকারে ভরিয়া আসিতে লাগিল, শিবানী তখনো স্থির চক্ষে অন্ধকার যমুনাবক্ষে চাহিয়া।

ভোরের নহবৎ মধুর স্বরে ভৈরবী রাগিণীর আলাপে জগতে উষাগমন জানাইয়া দিল। শিবানীর ক্লান্ত চোখে ঘুম ও অবসাদ জড়াইয়া আসিল! সে সেই নীল জলের তীর-রেখার উপর উষার গোলাপী সাড়ির ক্ষীণ প্রান্তটুকু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র শুনিতে পাইল, দ্বারে কে করাঘাত করিয়া দ্রুতকণ্ঠে ডাকিতেছে, "শিবানী! শিবানী!"

শিবানী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার স্থির চক্ষে একটা আগুনের হল্কা বাহির হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই সে আত্মসংবরণ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল ও দ্বার খুলিয়া ধীর পদে নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নীচে সিদ্ধেশ্বরীকর্তৃক গৃহদ্বার মুক্ত করিবার শব্দ শুনা গেল, এবং তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, "শিবি এমন সময় কে এলো লা; নীরদ বুঝি?"

ইন্দ্রিয়জয় ও হৃদয়শোণিত-দান তাঁর সাধনা। সেই মহাকঠোর তপস্যা দ্বারা অজ্ঞান-অসুর নাশ হলে তবে তাঁকে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা না করেই যে একেবারে মার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপনা করতে বসেছি, যদি তিনি অপ্রসন্না হন?”

বৃদ্ধ জমীদার বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে ক্ষুদ্র বালিকার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “হিন্দুর সাধনা ত এক জন্মের জিনিষ নয়, মা? তোর যে সব জন্মান্তরের সাধনা করা রয়েছে। আমাদের মত বৃদ্ধদের সারাজন্মের সাধনায় মা বিশ্বময়ী যদি প্রসন্না হয়ে তাঁর পবিত্র নির্ম্মাল্য হতে একটি মাত্র ফুল প্রদান করেন, তাতেই আমরা ধন্য হতে পারি। শান্তি, মা আমার! তোমার রাজরাজেশ্বরী তোমাকে তাঁর সঙ্গে এখানে চিরপ্রতিষ্ঠিতা রাখুন।” বৃদ্ধের স্নেহপরিপূর্ণ হৃদয় বিষাদের ছায়া দূরে সরাইয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কি এক অনির্দ্দেশ্য অন্ধকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

শান্তি মুহূর্ত্তের ভাবনা ভুলিয়া হাসিমুখে বলিল, “জ্যেঠামশায়! আনন্দমঠের মত আমাদের তিনটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলে বেশ হয়। মা যা ছিলেন, যা আছেন, যা হবেন।”

শ্যামাকান্ত হাসিলেন, “মা, এইজন্যেই শাস্ত্রে বলে, লোভ বাড়াতে নাই।”

ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদির সঙ্গে থিয়েটারের জন্য বেশ ঘটা লাগিয়াছিল। বড় বড় পাল খাটাইয়া বাঁশ বাঁধিয়া, বেঞ্চ, কেদারা নাড়ানাড়ি করিয়া চিক খাটাইয়া সতরঞ্চ বিছাইয়া

বাড়ির ভৃত্যগণ, ভাড়াকরা ফরাশেরা ও গ্রামের প্রজাগণ অবধি যেন হিমসিম খাইয়া যাইতেছিল।

বিপুল উদরের ভারে হেলিয়া পড়িয়া মৃদুমন্দ গমনে এখানে ওখানে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে পান চিবাইতে চিবাইতে প্রৌঢ় দেওয়ানজী বিরলকেশ মস্তকে ভিজা গামছা ঢাকা দিয়া সকলকার প্রতি হুকুমজারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কাহাকেও বলিতেছেন, "ওহে গুরুসদয়! তুমি অতি মূর্খ! দেখ দেখি সাতডেলে ঝাড়টাকে ওখানে না দিয়ে এইখেনে কি হিসেবে খাটালে? ওরে মোধো! এখন তামাক খেলে চলবে না, কাজ চাই, তো' বেটাদের সঙ্গে পারবার যো নেই দেখচি, চিলিমটি চড়িয়ে দিব্যি বসে গেছ!" বাড়ীর ও পাড়ার ছেলের দল জড় হইয়া সব চেয়ে বেশী হট্টগোল লাগাইয়া দিয়াছিল। ঝগড়া- মারামারির সঙ্গে কোথাও বা পরাজিতের ক্রন্দন, কোথাও বা বিজেতার জয়ধ্বনিতে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে থিয়েটার আনা হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় করিবে। দূর পল্লীগ্রামের অনভিজ্ঞ জনগণ কৌতূহলে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। হেমেন্দ্রনাথ এই সব ব্যাপার লইয়া আজ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, উপেন্দ্র ও যোগেশের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "দেখলে হে সরকারটার আক্কেল, কোন যুগে হুকুম করেছি, গোটাকতক ভাল ভাল গোলাপের তোড়া বানিয়ে যেন মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এতক্ষণে খবর দিচ্চেন মালি বেটারা সব ভাল ফুল পূজার জন্যে তুলে নিয়েছে। বুড় দেওয়ানটা বড়ই জ্বালাচ্চে! না পারে কিছু ম্যানেজ করতে,

না ছাড়বে কাজ, আবার বলে কি না তুমিত সেদিনের ছেলে! যত সব সেকেলে বুড়র দল! অস্থির করেচে!”

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কর্ত্তার ফিরতে যে এত দেরি হল?”

ঔদাস্যের সহিত ভাবী জমিদার উত্তর দিল, “কে জানে, রাত্রে তখন আমি ঘুমচ্ছিলাম, সকালবেলা গিয়ে দেখি, কর্ত্তার মেজাজটা যেন চটা-চটা। গতিক বড় সুবিধের নয় বুঝে বুদ্ধিমানের মত চটপট সরে পড়া গেল।”

যোগেশ খুব সমজদারের মত মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেল, “তাই ত চাই। শাস্ত্রেই বলেছে, স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন।”

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “দুর্জ্জনই বটে। তার পর অন্দর মহলে? সেখানেও বোধ হয় সুরটা ঠিক কোমল নিখাদে আরম্ভ হয়নি?”

হেমেন্দ্র জয়ের হাসি হাসিল, “আমায় তেমনই আহাম্মক ঠাউরেছ, বুঝি? আজকের এমন আমোদের দিনটা আমি সকল কর্ম্ম ফেলে সেই পাদরী সাহেবের ধর্ম্মোপদেশ শুনতে ছুটলাম আর কি! একে চিঠিপত্র লেখা নিয়ে দুজনকারই মেজাজ গরম হয়ে আছে জানি, তারপর এই থিয়েটারও একটা ছুতো হবে। আবদার দেখ না! ওঁরা এদিক-সেদিক টং টং করে ঘুরে বেড়াবেন, আর আমি শালা নিত্যি নূতন ঠিকানা খুঁজে চিঠি লিখে মরি! আবার ওঁরা রাজ্যের ঠাকুর আর মন্দির তৈরি করে পয়সাগুলো জলে ফেলে দেবেন, পৃথিবী জুড়ে একটা কুড়ের রাজত্ব স্থাপন করে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করলুম ভেবে আমোদে আটখানা হতে থাকবে, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, যত লোকসান হয় আমাকে একটু আমোদ করতে দেখলে! আশ্চর্য্য! বলেন কিনা ও

টাকাগুলো অনাথ আতুরকে দিলে তারা বেঁচে যেত! আরে বাপু, অনাথ আতুরকে বাঁচিয়ে তোর কি উপকার! শুধু পৃথিবীর দারিদ্র্য ও ভারবৃদ্ধি বৈত নয়! ও সব মেয়ে শঙ্করাচার্য্যদের কাছে যাওয়াও আতঙ্কজনক!"

উপেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা উপদেশ জিনিষটা এমন মন্দ কি, বিশেষ অমন উপদেষ্টার মুখে?"

"নাঃ, কিছু না, তুমি যাই বলে তার গুণগান করতে চাও, কর, ভাই! আমি কিন্তু গার্গী লীলাবতীকে কখন ভয় ভিন্ন ভক্তি করতে পারব না। তাঁদের সংস্রব হতে যত দূরে থাকতে পারা যায়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল! বরং ভট্টাচার্য্য মশায় যখন টিকি নেড়ে ধর্ম্মকথা কন, তখন দায়ে পড়ে দুদণ্ড সেখানে তিষ্ঠুলেও তিষ্ঠুতে পারি, তবু স্ত্রীর পণ্ডিতি কোন রকমে বরদাস্ত করতে পারি না।"

উপেন্দ্র ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "হেমবাবু এ তোমার বড় অন্যায়! অমন গুণবতী স্ত্রীরও যদি তুমি নিন্দা কর, তাহলে তোমার নরকেও স্থান হবে না।"

যোগেশ উত্তেজিত উপেন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "নরকে স্থান না হলে এমন বেশি ক্ষতি কি? বি কাম, বি কাম।"

হেম বলিল, "আমার উপর অতটা চটোনা। আমি কি বলছি, আমার স্ত্রী বড় মন্দ? তাহলে আর সে আমার স্ত্রী হল কেন? তবে কি জান স্ত্রীর মত আবদার করবে, মান অভিমান করবে, চাই কি তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে সোনালী রকম! এক-আধ পশলা রৌদ্রবৃষ্টি হয়ে গেল—তবে না সে স্ত্রী!

স্ত্রী ধরবে, বাড়ীতে যাত্রা থিয়েটার দাও, প্রতি শনিবারে গড়ের মাঠে সার্কাস থিয়েটার কিম্বা চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আন; সন্ধ্যাবেলা বসন্তী রংয়ের সাড়িখানি পরে ফুলের মালাগাছি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাবামাত্র মালাগাছি গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত ধরে ভালবাসার কথাবার্ত্তা কইতে থাকবে, তা না গিয়ে দাঁড়াবামাত্র, বাবা লিখেছেন, তোমার এখন থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; কিছু দিন বরং মেডিকেল কলেজে পড়লে হয় না, কত গরীব দুঃখীর উপকার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি! গরীব দুঃখীদের জন্য ত ভেবে ভেবে আমি মারা গেলাম! এদিকে লজ্জাবতী লতাটি, কিন্তু দরকার হলে এনিবেশাণ্টের মত বক্তৃতা দিতেও পিছপাও হন না! তার উপর আবার শ্বশুর যখন আরম্ভ করেন, তখন কোথায় বা লাগেন সুরেন্দ্রবাবু, কোথায় বা থাকেন রবীন্দ্রবাবু! ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়!"

"আহা, হেম! তুমি অনেকখানি অন্যায় বলছ, তোমার শ্বশুর একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি যা বলেন, যা করেন, তোমার নির্ব্বিচারে তা পালন করে যাওয়া কর্ত্তব্য।"

যোগেশ ভূমে পদাঘাত করিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "তোমায় কি কর্ত্রীঠাকরুণ কিছু প্রসাদ পুরস্কারের আশা দিয়েছেন না কি হে? রীতিমত স্তাবক হয়ে উঠেছ যে—"

"আমি—আমি তোমার মত অমন কৃতঘ্ন নই, উচিত অনুচিত বলবার অধিকার স্বয়ং লাটসাহেবও আমার কোল থেকে কেড়ে নিতে পার্ব্বেন না, আমি মোসায়েবি জানি না—"

"কি, আমি মোসাহেব? শোন, হেম, তোমার খাতিরে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু বারে বারে এরকম অপমান হলে ত আর—"

এমন সময় সাধুচরণ ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, তাঁহার শ্বশুর আসিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। বিপন্ন হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিল যে, তিনি এখন অন্তঃপুরে তাঁহার কন্যার নিকটই আছেন। হেমেন্দ্রনাথ বিরক্তচিত্তে বলিয়া উঠিল, "তবেই আজ দেখছি আমার দফা নিকেশ! মণি-কাঞ্চন সংযোগ!" যাইবার সময় বন্ধুদের বলিয়া গেল, "দেখো হে, বন্দোবস্ত যেন সব ঠিক হয়; শালারা ত ফাঁকি দিতে পেলে আর কিছুই চায় না। মেয়েদের যেন কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে না হয়। যোগেশ, তুমি সেখানে যাও, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।"

রজনীনাথ জামাতাকে সম্মুখে পাইয়া প্রথমতঃ তাহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য খুব একচোট তিরস্কার করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, "এই বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে থিয়েটার ও আমোদ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে তোমার চলবে না। আমি তোমাকে উৎসন্নের পথে ছেড়ে দিতে পারব না ত! আমার কাছে থেকে আবার তোমাকে পড়া-শুনা করতে হবে। কালই আমি তোমাকে নিয়ে যাব। অনেকবার তোমায় এ কথা বলেছি তুমি গ্রাহ্য করনি।"

হেমেন্দ্র মনে মনে ভারি চটিল, তথাপি ক্রোধ দমন করিয়া বেশ শান্ত ও বিনীতভাবে কহিল, "আমার চোখের অসুখ, পড়াশুনা করতে গেলেই আমি অন্ধ হয়ে যাব। তাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, বেশ বলুন, আমি যাচ্ছি।"

রজনীনাথ মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "তোমার চক্ষুরোগের কথা আমার মনে আছে! যদিই বা ভুলতাম, কিন্তু চোখের সামনেই

নীল চশমাটা দেখে সেটা ভোলা অসম্ভব। চশমাটা কি সর্ব্বদাই ব্যবহার কর ?, না, আমার সামনে এখন পরে এলে ? সে যা হোক আমার জামাই অন্ধ হয়, অবশ্য সে ইচ্ছা আমার নাই, সে ভাবনাটা তুমি আমার উপরই ফেলে দিয়ে রাত্রের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাক, ছটার ট্রেণেই আমাদের যেতে হবে, দেরি করতে পারব না, আমার কাজ আছে।”

রজনীনাথের স্বরে দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া হেমেন্দ্রের মনে মুক্তির আশা ক্ষীণ হইয়া আসিল, ভারি রাগ হইল, সে ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরেই বলিয়া ফেলিল, “কাল সকালেই আমি কেমন করে যাব ? বাবাকে বলতে হবে, তা ভিন্ন আজ বাড়ীতে কাজ ; আজ রাত্রের মধ্যেই ত সব উদ্যোগ হয়ে উঠবে না, সে একেবারে অসম্ভব ! আমি দু একদিন পরে যাব।”

রজনীনাথ ভ্রূকুটি করিলেন, বলিলেন, “অসম্ভব ! অসম্ভব কিসে ? তোমার বাবাকে আমি সব বলে রেখেছি। আর থিয়েটার তুমি যথেষ্ট দেখেছ ; গোছানর জন্য তোমার ভাবনা নেই, শান্তি সে সব বন্দোবস্ত করবে। বুড়ি, কেমন রে তুই পারবিনি ?”

পার্শ্বের ঘরে দ্বারের নিকট অবগুণ্ঠনবতী শান্তি দাঁড়াইয়াছিল। পিতার আহ্বানে সে ধীর পদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক হেলাইয়া জানাইল, পারিবে।

রজনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন “আমি তোমার বাপের কাছে যাচ্ছি, একটু পরে তুমিও সেখানে যেও, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। বুড়ি, এখন আমি চল্লাম।” বলিয়া রজনীনাথ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শ্বশুর চৌকাট পার হইতে না

হইতেই হেমেন্দ্র পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি আমার নামে শ্বশুর মশায়ের কাছে কতকগুলো লাগিয়েছ ?"

শান্তি অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সে কহিল, "আমি ! সে কি কথা !"

"তুমি নয় ত আর কে ? তোমায় চিঠি পত্র লিখতে ফুরসৎ পাইনি, কাজের ভিড়ে তুমি এসে পর্য্যন্ত দেখা করতে সময় করতে পারিনি বলে বুঝি তোমার রাগ হয়েছে ? তারই শোধ নেবার জন্য বাপের কাছে আমার নামে কতকগুলো মিথ্যা নিন্দা করে আমায় বাড়ী থেকে বিদায় করবার চেষ্টা হচ্চে ? সে কি আর আমি বুঝিনে ? তা বেশ, বেশ ! তুমি খুব ভাল স্ত্রী ! হুচক্ষে তুমি আমায় দেখতে পার না।"

শান্তি শিহরিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। ব্যথিত ভৎর্সনায় তাহার শান্ত চোখ দুইটি পূর্ণ করিয়া সবিষাদে সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমায় এমন নীচ মনে কর !"

সে ধিক্কারে হেমেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। শান্তির কণ্ঠে ইহার পূর্ব্বে সেরূপ স্বর সে শুনে নাই, সে প্রথমটা ঈষৎ লজ্জা বোধ করিয়া মুখ নত করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া যেন শান্তির উপর মমতাহীন হইয়াই বলিল, "নিশ্চয়ই এ তোমার কাজ ! নইলে তিনি আজ রাত্রেই আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করাতেন না। কি গ্রহেই পড়লাম, এমন জানলে আমি তোমাদের সামনে আসতাম না।"

শান্তির বিবর্ণ অধর ঈষৎ কম্পিত হইল। সে তীব্রভাবে কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ আপনাকে সামলাইয়া দ্রুতপদে কক্ষের অপর প্রান্তে একটা জানালার ধারে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

তখন শরতের অপরাহ্ণ ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যার মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। জানালার নীচে উদ্যানস্থ কামিনী বৃক্ষের শ্রেণী হইতে একটা মদিরময় সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে মিশ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। পাখীটার গান গাহিবার সাধ তখনও যেন মিটে নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া জামরুল গাছের মধ্যে লুকাইয়া সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। শান্তি তাহার অনাদৃত, অভিমানাহত হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার কালো চোখে একটা কম্পিত জলের রেখা দেখা দিয়াছিল, সেটাকে সে তাহার অঞ্চলপ্রান্তে ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিল। এমন হৃদয়হীনের কাছে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করাও অপমান! যাহার নিকট তাহার কথার একটা সামান্য মূল্যও নাই!

শান্তির ব্যবহারে এক মুহূর্ত্ত হেমেন্দ্রের মুখখানা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়া দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আবার তাহা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। সে চোখ ফিরাইয়া স্থির দৃষ্টিতে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। গোধূলির সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে, ঈষদ্‌রক্তিম ক্ষীণালোকে সেই অদূরবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত করা সুন্দর চিত্রের মত দেখাইতেছিল। তাহার সুরচিত কবরীর নীচে পীতবর্ণের সাড়িখানি সেই পরিপুষ্ট অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাহার শুভ্রবর্ণের সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। মনে মনে সে যেন ঈষৎ লজ্জা ও পরাভব বোধ করিতে লাগিল, শান্তি তাহার সমালোচনা এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছে নাকি? এই কথাই না সে বন্ধুদের কাছে এইকতক্ষণমাত্র বলিতেছিল? সত্যসত্যই কি তবে সে এতক্ষণ

তাহার মনোমত সাজে সাজিয়া তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পথ চাহিয়াছিল? দুর্ভাগ্যের বিষয় যে উপস্থিত সেখানে একগাছা জুঁই ফুলের গোড়ে ছিল না, আর এই যে দীর্ঘ বিরহের পর দম্পতীর প্রথম আলাপ, ইহাকেও ঠিক প্রেমালাপ বলিতে পারা যায় না। হেমেন্দ্র ডাকিল, "শান্তি!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভ্যাসের বশে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিষাদপূর্ণ ম্লানমুখে বেদনা ও অভিমানের রেখাগুলি পরিষ্কার অক্ষরে ফুটিয়া রহিয়াছিল। অপ্রতিভভাবে হেম কহিল, "শান্তি কাছে এসো, এতদিন পরে দেখা রাগ করোনা।"

সত্য, এতদিন পরে সাক্ষাৎ, শান্তির আজ অভিমান প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। হেমেন্দ্র মিনতিপূর্ণ কোমলস্বরে কহিল, "কাল সকালেই আমি যেতে পারবো না, সে একেবারে অসম্ভব, তোমায় এর কিছু উপায় করে দিতে হবে, লক্ষ্মীটি, আমার এই উপকারটা করো।"

"আমি!" সবিস্ময়ে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি উপায় কর্ব্বো বলে দাও আমাকে, যদি সাধ্য হয় কর্ব্বো।"

হেমেন্দ্র পরামর্শ দিল, "তোমার বাবাকে বলো আজ তোমার শরীর ভাল নাই সেইজন্য কিছু উদ্যোগ করে তুলতে পারলে না, তাহলেই তিনি বিশ্বাস করবেন! তুমি ইচ্ছা করলে কি না হয়! দেখ দেখি কাল আমাদের 'আবুহোসেন' আর 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্লে হবে, কাল আমি কেমন করে যাব, তুমিই বল এ রকম জুলুম করা কি উচিত?"

শান্তি সভয়ে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "না না আমি বাবার কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না, আর কিছু বলো।"

শিবানী আর নামিল না, সে সেই সিঁড়ির উপরেই একটু দাঁড়াইয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক একটিও কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কে তোমার সাতটা বাঁদি সাতদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে যে রাত চারটের সময় উঠে দোর খুলে দেয়, শুনি! দিন রাত খেটে খুটে য়ে রাত্তিরটাতে একটু নিশ্চিন্দি হব, তাও নয়! সমস্ত রাত্তির যেখানে ছিলে, আর দু ঘণ্টা সেইখানেই থেকে একেবারে সকালে এলেই তো হতো। কোথা থেকে আমার হাড় পোড়াতে একটা বওয়াটে মাতাল এসে জুটলো গা।"

নীরদকুমার শ্বশ্রূর বাক্যে একটিও উত্তর করিল না। উপরে উঠিয়া নিজের মুক্তদ্বার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "শিবানী!"

শিবানী উত্তর দিল না। সে সেই জানালায় তেমনই স্তব্ধ তেমনই স্থিরভাবে বসিয়া রহিল, ফিরিলও না! নীরদ চাদরখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। "শিবানী, আমার কথা শুনতে পাচ্চো! আমি তোমার কাছে একটা কথা শুনে যেতে চাই।"

কথার স্বরে জড়তা ছিল না, চলনেও মত্ততা ছিল না। শিবানী মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটুখানি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে সেই আধ-আলো আধো-অন্ধকারে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চিত্ত সেইখানেই যেন গলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বর্ষণোন্মুখ মেঘ যেমন পশ্চিম বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিতে প্রাণপণ চেষ্টা পায়, শিবানীও

হেমেন্দ্রনাথের মুখে গভীর বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল, সবেগে সে ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ ত তোমার দোষ, ঐ জন্যই ত তোমার সঙ্গে আমার বনে না। মিথ্যা কিসে হোল? আমার উপকারের জন্য এটুকুও তুমি করতে পারো না? সাধ করে কি বলতে হয় যে আমি তোমার আপদ, আমায় বিদায় করতে পারলে তুমি বাঁচো।"

শান্তি ক্রুদ্ধ হেমের হাতখানা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি আমাকে কেবল কেবল এমন করে বলোনা, বল আমায় কি করতে হবে, তাই আমি করছি।"

"আঃ, তাই বল, এই ত বেশ ভালমানুষের মতন কথা! বেশি আর কি এমন কর্‌তে হবে, শুধু কাল আমায় যাতে চলে যেতে না হয় তারি কিছু উপায় করো! আমি কাল যাবোনা সেটা নিশ্চিত, তবে তা নিয়ে একটা ঝগড়া বাধান আমার ইচ্ছা নয়।"

বিবর্ণ মুখ ঈষৎ নত করিয়া সে উত্তর দিল, "চেষ্টা কর্‌বো।" হেমেন্দ্র খুসী হইয়া পত্নীকে একটু কাছে টানিয়া লইল এবং তাহার শুভ্র ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাতে পরিস্ফুট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমায় বাঁচালে, দেখ দেখি শ্বশুর মশায়ের অন্যায়, এত পয়সা খরচ করে আমি থিয়েটারটা দেশে আনালাম, আর আজই আমায় যত দরকার পড়ে গেল, এ শুধু আমার উপর আক্রোশ প্রকাশ করা বইত নয়! তবে আমি এখন চল্লাম, দেখিগে ওদিকে কতদূর কি হলো, আবার "নবকুমারের" শরীরটা ভাল নাই, ম্যানেজার ধরেছে

আমায় নবকুমারের পাঠ নিতে হবে। যদিও কলকেতায় বারকয়েক অভিনয় করা গেছে, তবু এখানে একটু যেন বাধ বাধ ঠেকে। ওটা আর কিছু নয় অনভ্যাসের জন্য। না হলে সকলেই বলে 'নবকুমারের' অভিনয় আমি যেমন করেছিলুম তেমন অন্য কেউ পারে না। হ্যাঁ আর একটা কথা,— ম্যানেজার বলছিল যে 'মেহেরুন্নিসার' জন্য ভুল করে লাল রংয়ের সাড়ি আনা হয়েছে, তাতে তাকে মোটে মানাবে না। দাও দেখি তোমার একখানা নীল বা গোলাপি রংয়ের ভাল সাড়ি।"

এক মুহূর্ত্তে শান্তির শান্ত মুখ ঘৃণামিশ্রিত বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসংবৃতা হইয়া এত শীঘ্র পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল যে তাহার এই সহসা অন্তর্ধানে হেমেন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, সে রাগ করিয়া গেল বা ভাল মনে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাহাকে এ সমস্যায় থাকিতে হইল না, অল্পক্ষণ পরেই একখানা ফিকে নীল রংয়ের রেশমী সাড়ি হাতে শান্তি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্র আবার বিস্মিত হইয়া গেল, যে শান্তি উপদেশ দিতে পারিলে আর কিছুই চাহে না, সে আজ স্বামীর মুখের কথা খসিতে না খসিতে তাহার আজ্ঞা পালনে ছুটিল যে! এমন বাধ্য স্ত্রী সে কবে হইতে হইল! পরীক্ষা করিয়া দেখিল সাড়িখানি বহুমূল্য। প্রকাশ্যে বিস্ময় দমন করিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "হাঁ এখানা মেহেরুন্নিসার যোগ্য হবে।" বলিয়া পত্নীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্, কিন্তু দেখো যেন

সে কথাটা ভুলে যেও না।” শান্তির ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত কে যেন লোহিত রাগে রাঙ্গাইয়া দিল।

শ্যামাকান্ত সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু রজনীনাথের অভ্যাস ইহার বিপরীত। মক্কেলদের কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া তাঁহার বাড়ীর ভিতর আসিতেই প্রায় রাত্রি দেড়-প্রহর হইয়া যাইত। আজও তিনি পথশ্রান্ত ও ঈষৎ উত্যক্তচিত্ত। শ্যামাকান্ত বৈবাহিক ও বধূর অনুরোধে একটু কিছু আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলে, রজনীনাথ ভিতরে কন্যার মহলে আহারার্থ আহূত হইয়া আসিলেন। তখন কোলাহলমুখরিত প্রকাণ্ড পুরী অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কনসার্ট থামিয়াছে, ড্রপ্‌সিন উঠিয়াছে, আলোকিত রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বলবেশধারী অভিনেতৃগণের আবির্ভাবে গৃহস্থ ও অভ্যাগত দর্শকমণ্ডলী সেইদিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছিল।

রজনীনাথ আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। নিকটে বসিয়া শান্তিও নীরবে পিতাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল, সেও সহসা কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। পিতার মুখের অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য তাহার স্নেহকোমল বক্ষে কেমন যেন ব্যথার মত বাজিতে লাগিল। তাহার ভাবনাই যে তাহার চিরস্নেহময় জনককে এমন করিয়া ভাবাইয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহার বুঝিতে বাকি ছিল না। অনেকক্ষণ এভাবে আর থাকিতে না পারিয়া সে ধীরকণ্ঠে ডাকিল, “বাবা !”

রজনীনাথ একটু যেন চকিত হইয়া কহিলেন, “কিরে লতি ! তুই যে বড় থিয়েটার দেখ্‌তে যাস্‌নি ?”

সেও ক্ষীণভাবে একটু হাসিল, কিন্তু থিয়েটারের নাম সে মুখ হইতে উচ্চারণ করিতে পারিল না। তবু তাহার পিতা এখনও জানিতে পারেন নাই যে সে থিয়েটারের আজ প্রধান অভিনেতা কে! কথা ঘুরাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল, "বাবা, সুকু এলনা কেন? তাকে অনেক দিন দেখিনি, বড় দেখতে ইচ্ছে করে।"

রজনীনাথ কহিলেন, "তার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, মা, তাই তাকে আন্‌তে পারিনি, সে ত 'দিদি' 'দিদি' করে অস্থির হচ্চে। তোর মাও তোকে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যে।"

শান্তির বিষণ্ণ চোখে আনন্দের জ্যোতি নবোৎসাহে ফুটিয়া উঠিল। সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আমিও মাকে সুকুকে অনেক দিন দেখিনি, বাবা, আমায় কেন আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না?"

রজনীনাথ সস্নেহে কন্যার দিকে চাহিলেন। "তোকে নিয়ে যেতে পারলে ত আমি বাঁচতাম বুড়ি, কিন্তু,—কিন্তু তাত এখন পারব না।" বলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ঈষৎ নিম্নস্বরে পুনশ্চ কহিলেন, "এখন যদি তোকে নিয়ে যাই তাহলে চৌধুরীমশায় হয় ত অন্য রকমও ভাবতে পারেন; সেটা আমি উচিত মনে করি না, কি বলিস, লতি, তোকে পূজার পরই একেবারে কিছুদিনের মত নিয়ে যাবো, সেই ভাল না?"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ"।

নিশ্বাসটা ক্ষুদ্র হইলেও সেটা রজনীনাথের কান এড়াইতে

পারে নাই। তিনি অমনি চকিতনেত্রে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার মনের লেখা যেন কতকটা পাঠ করিয়া ফেলিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "হেমকে কাল আর নিয়ে যাবনা, আজ তোর পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে লতু, আজ তার যাবার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারবিনে, হেম না হয় দুদিন পরেই যাবে এখন। কিন্তু তার যাওয়া চাইই, সে ভার তোমার উপর রৈল, এখন থেকে পড়া ছেড়ে থিয়েটারের দলে মিশলে চলবে কেন?"

শান্তি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাবা কেমন করিয়া টের পাইলেন? যদিও সে একটা মহা দায় হইতে মুক্ত হইল, তথাপি নিজের জন্য একটা উৎকট লজ্জার হাত সে কোনমতেই এড়াইতে পারিতেছিল না। বাবা কি মনে করিলেন, সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যের বশে স্বামীর উন্নতির পথে বাধা দিতে চায়? এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত আবার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় সে তাঁহার সহিত যাইতে ব্যগ্র!

আচমনান্তে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রজনীনাথ কন্যার হাত হইতে পানের ডিবাটা লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর খাওয়া হয়ে গিয়েছে? আচ্ছা, তবে তুই যা, আমি একটু বসি।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতাপুত্রীতে কথাবার্ত্তা হইল। রজনীনাথ বলিলেন, "আমি তোর সম্বন্ধে সমস্ত স্থির করেই এসেছি। তোর অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তুই চৌধুরী মশায়ের কাছে থাকবি। কিন্তু হেম এখন হতে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করবে। সে বেশ বুদ্ধিমান ছেলেই ত ছিল, দায়িত্ব বুঝলে এখনও যত্ন করতে পারে! আমার বিশ্বাস

এই ব্যাপারটা ভগবান তারি মঙ্গলের জন্য ঘটিয়েছেন, তার জন্য আমার বড্ডই ভাবনা হয়েছিল, এমন সময় তোর চিঠি পড়ে আমার ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। এবার সে আবার পড়ুক, মানুষ হবে, কেন হতে পার্ব্বে না!” তারপর একটু চুপ করিয়া আবার বলিলেন, “লতি, তোর মা ভাবছিলেন যে শিবানীর সঙ্গে তোর বনিবনাও হবে কি না! তাঁর ইচ্ছা তুইও আমাদের কাছে থাকিস, আমি কিন্তু বলেছি, লতু আমাদের এমন মেয়ে নয় যে তার সঙ্গে কারও বনবে না! সেজন্য বৃথা ভাবনা। কি বলিস্ বুড়ি! আমি তোকে তোর মার চেয়েও বেশী চিনি কিনা?”

সে মৃদুস্বরে কহিল, “হ্যাঁ বাবা, তিনি আমায় কিনা খুব ভালবাসেন, তাই সবেতেই ভয় পান।” পিতা সস্নেহে কন্যার হাতটা হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অপরহস্তে তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া স্নেহ-কণ্টকিত হইয়া হাসিয়া কহিলেন, “কেন, আমার মেয়েটিকে আমিই কি মোটে ভালবাসিনে? আচ্ছা বুড়ি, বিনোদের শাশুড়ি লোক ভাল তো? আর যদি তা নাই হয়, তাতেই বা তোর ক্ষতি কি? তুই তাঁকে নিজের মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করবি, সকল কাজেই তাঁর পরামর্শ চাইবি, অবশ্যই তিনি তোকে ভালবাসবেন। নিজে ভাল থাকলে কেউ মন্দ হতে পারে না। বিনোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক বোনের মত ব্যবহার করবি, কর্ত্তৃত্বের অধিকার তার হাতে দিবি, অথচ নিজে সব কাজেতেই তার সাহায্য করবি! আমি জানি আমার মাকে আমার বুড়িকে কিছুই বলবার প্রয়োজন নাই, তবুও বাপের একটা কর্ত্তব্য ত আছে, তাই বলছি লতি এইবার তোর পরীক্ষার দিন এসেছে, এই সব ছোট

বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে তবেই প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অচল প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। বিনোদকুমারের বিধবা যেন—"

"বাবা! সত্যি কি দিদি তাই? সত্য সত্যই তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, বাবা?" কন্যার স্বরে রজনীনাথ বেদনা বোধ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কথাটা ফিরাইয়া লইলেন।

"ওটা আমার বলা ভুল হয়েছে বুড়ি! ঈশ্বর জানেন বিনোদ জীবিত কি না, কিন্তু তার ফেরবার আশা তো কিছু দেখি না। হ্যাঁরে হেম ত শিবানীকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে? তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলবো মনে করেছিলাম কিন্তু সে ত আমার সঙ্গে আর দেখাই করলে না। শিবানী বা তার ছেলের উপর তার ত কোন বিরুদ্ধভাব জন্মায়নি?"

শান্তি দেখিল, কথাগুলার শেষে তাহার পিতা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। সে চকিতদৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল, "দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি ত?"

"মোটে দেখাই করেনি, সেটা কিন্তু ভাল করেনি, তাকে বলতে হবে যেন সে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। অমূল্যকুমারের ভার এখন তারি উপর যে! ওরা আসাতে সে সন্তুষ্ট হয়েছে ত?"

শান্তির নত দৃষ্টি আরও নত হইয়া আসিল, ম্লান মুখ অধিক ম্লান করিয়া গভীর লজ্জা ও বেদনার মধ্য হইতে সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "তাত জানি নে।" স্বল্পমাত্র-পূর্ব্বেকার সে অভিনয়টা তখনও তাহার মনের ভিতর শূল বেদনার মত খোঁচাইয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠ ঈষৎ চাপিয়া আসিতে লাগিল।

রজনীনাথ ঈষৎ বিস্ময়পূর্ণ ক্রোধে নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ বিমল

জ্যোৎস্না তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল। ঘুমন্ত জগতের উপর অমৃত বর্ষণ করিয়া প্রকাণ্ড পুরীর এক অংশ হইতে মধুর যন্ত্রস্বরের সহিত সম্মিলিত সকরুণ সঙ্গীতলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল।

"কোলে তুলে নে'মা কালী, কালের কোলে দিসনে ফেলে।"

২২

পরদিন উপেন হেমকে তাহার বিশ্রাম কক্ষে একা পাইয়া নিজের অদম্য কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগটাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ঐ সম্বন্ধে হেমকে কোনরকম উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া সে আন্তরিক বিস্ময়বোধ করিতেছিল। কৌতূহলের বিষয় যে শিবানী, তাহা বলাই বাহুল্য। সে আসন গ্রহণ করিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নতুনগিন্নির খপর কি ?"

"নতুন গিন্নি! তিনি আবার কে হে ? আমি ত বাড়ীর একমেবদ্বিতীয়কেই জানি। ওঃ, তিনি আপাতত নতুন হয়ে এসেছেন, তাই বুঝি ঐ বিশেষণটা দেওয়া হচ্চে, বটে ? না ভাই তাঁর সঙ্গে ভাল করে দেখা সাক্ষাৎ করবার ফুরসৎ এখনও করে উঠতে পারিনি। কখন যাই বল ? রাত জেগে শরীরটে একেবারে বেযুৎ হয়ে রয়েচে, আর এক ঘুম না দিলে ত যুৎ হতে পাচ্চিনে দেখচি। তোমার চক্ষে ঘুম নেই কেন হে ?"

হেমেন্দ্রের প্রশ্নে উপেন হাসিয়া কহিল, "কারণ আমরা গরীব-লোক, খেটে খেতে হয় যে। কুম্ভকর্ণ যদি রাবণ হেন দাদার ভাই না হয়ে আমাদের মত লোকের ঘরে জন্ম নিত, তাহলে সেও দুদিনে অভ্যাস দুরস্ত করে ফেলতে পথ পেতনা। তা ছাড়া আমাদের ঘরের তাঁরাও ছোটবাবু জানেনই—সে আর কি

বল্‌বো, কি জানেন ওসব কপাল করে। তা যা হোক আমি বল্‌ছিলুম,—'নতুন গিন্নি' অর্থাৎ কি না কর্ত্তার বড় বউ,—বিনোদবাবুর স্ত্রীকে দেখলেন কেমন? নেহাৎই নাকি হাবাতে ঘরের মেয়ে? আবার তার মা-টিতো শুন্‌চি খুব জাঁহাবাজ মেয়ে মানুষ! বৌ বলছিল এই ত নূতন এসেছে, এরি মধ্যে যেন সব তারি চিরকালের ঘরকন্না, এমন করে চারদিকে বেড়াচ্ছে। কে জানে, তোমাদের সঙ্গে কেমন বনিবনাও হবে টবে? ছেলেটি কিন্তু দিব্যি চাঁদের মত, দেখলে পরেই মায়া হয়। বড় গিন্নি নিজে লোকটা কেমন?"

"বিনদার স্ত্রী!" শয্যাশায়িত হেমেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বসিল, বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বক্তার পানে চাহিয়া রহিল। এ আবার কি কথা! এ সব তামাসা যে শুনলেও আতঙ্ক হয়।

উপেনও বিস্মিত হইল, "তামাসা! তুমি কি নিজের বাড়ীর কোন খবরই রাখোনা নাকি? এত বড় কাণ্ডটা, তার কোন খপর পাওনি? অথচ পাড়ায় পাড়ায় আজ ত এই কথানিয়েই তুমুল আন্দোলন চলছে। এর মাঝখানে তোমার এত সাধের থিয়েটার কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু হেম! মতি বিবির গলাটি কি মিষ্টি! মন যেন কেড়ে নেয়। "আহা, প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি যত্নে এঁকেছ।" কি সুন্দর গাইলে। হেমের মাথার ভিতর তখন অভিনয়ের দৃশ্যপটটার উপর একখানা তীব্র ঈর্ষার ড্রপসীন পড়িয়া গিয়াছে। সে উপেনের শেষ কথাগুলায় পূর্ব্বের মত গদ্গদ হইয়া উঠিল না বরং ঈষৎ উত্যক্তভাবে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া অধৈর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিল, "বিনদার আবার বউ ছেলে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল? তোমার এ সব

হেঁয়ালীর ছন্দ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, একটু স্পষ্ট করে বল দেখি, যাতে বেশ বোধগম্য হয়।”

“এর চেয়ে আবার স্পষ্টাস্পষ্টি কি আছে? বিনোদবাবু বৃন্দাবনে এক অনাথা বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন, সে এতকাল পরে তার শ্বশুরের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে ছেলে ও মা সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হয়েছে, এতে ‘অস্পষ্ট’ কোনখানটায় বোধ করচো?”

হেমেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। নিদ্রাটা তাহার মুদিতপ্রায় চোখ দুইটাকে ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না! আজিকার মতই গেল, কি কতদিনের জন্য গেল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এমন সময় বাহিরে চটিজুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যোগেশ ডাকিয়া বলিল “কি হে ভিতরে যেতে পারি? জেগে, না ঘুমিয়ে?”

হেমেন্দ্রের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উপেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “বন্ধুদের জন্য এখানকার দ্বার অবারিত, তুমি স্বচ্ছন্দে আসতে পার।”

যোগেশ প্রবেশ করিয়া হেমের এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে উপেনের দিকে চাহিল।

“যোগেশ, তুমি বিনোদবাবুর ছেলেটীকে দেখলে? হেমবাবু এখনও তাকে দেখেননি, তারা কর্ত্তার সঙ্গে এসেছে, সে কথা জানতেনও না।”

একখানা চেয়ার হেমেন্দ্রের সোফার নিকট টানিয়া আনিতে আনিতে যোগেশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, “বিনোদবাবুর ছেলে

তাহার অন্তর্দৌর্ব্বল্যের সহিত সেইরূপ নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

নীরদ কাছে আসিয়া শিবানীর হাত ধরিল, কহিল, "আমি দুর্ভাগ্য, আমি অক্ষম, সবই সত্য, তবু আমি তোমার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। আমি জানি, পৃথিবী আমাকে ঘৃণা করে—শুধু আমি ছাড়া, তাই আমি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে দিয়ে আবার তোমাকেই গ্রহণ করেছিলাম, আজ তুমিও...কি আমায় ঘৃণা কচ্চো ?"

"হাঁ" !

বৃষ্টির পূর্ব্বে মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি হইয়া যেমন বিদ্যুদগ্নি বর্ষণের সহিত গর্জ্জিয়া উঠে, শিবানীর স্তব্ধ মৌন অধর ভেদ করিয়া আকস্মিক বজ্র উদ্যত হইয়া উঠিল, "হাঁ" ! নীরদ তাহার দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল, পূর্ণ অবিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "রাগ করে নয়, তোমার মনের কথা আমি শুনতে চাইচি। ঠিক করে বলো।"

শিবানী হাত সরাইয়া লইল না, সে তাহার স্থির দৃষ্টি উন্নত করিয়া স্বামীর মুখে স্থাপন করিল, "কি বলবো ?"

"তুমি আমায় ঘৃণা কর কিনা ?"

"করি"।

নীরদ শিবানীর হাত ছাড়িয়া দিল। পাথরের পুতুলের মুখে যেমন ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি অপরিবর্ত্তিত মুখভাবে শিবানী দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্ধকারমুক্ত গোলাপি-আলোক-উদ্ভাসিত-বক্ষ যমুনার পানে চাহিয়া রহিল।

"শিবানী ! আজ থেকে মনে করো, তুমি বিধবা ! আজ থেকে

কি কার ছেলে, জানে কে ? কর্ত্তা যেমন ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে তুমি আমিও যদি বিনোদ নাম দিয়ে এসে দাঁড়াই, তাহলেও হয় ত তিনি তা বিশ্বাস করে কাছে টেনে নেন।"

উপেন ও হেমেন্দ্র উভয়েই যোগেশের পরিহাসে সহসা চমকিয়া উঠিল। উপেন বলিয়া উঠিল, "কি বল যোগেশ ? কর্ত্তামশাই নাকি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ না নিয়ে বউ নাতি ঘরে এনেছেন ? হেমের জ্যেঠাইমার আংটি ও ফটোগ্রাফ ওঁদের কাছে পাওয়া গিয়েছে।"

যোগেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসিল, কহিল, "মস্ত প্রমাণ ! ও বিনোদের স্ত্রী কি না, তা আমি বলতে পারি না, সেটা বরং হলেও হতে পারে। কিন্তু ও ছেলে যে বিনোদবাবুর নয় তা আমি হলফ করে বলতে রাজি আছি। ও ছেলে সে চলে যাবার পরে হয়, না ? ছেলের মা ভাল মেয়ে হলে বিনোদবাবু কখনো শুধু শুধু স্ত্রী ত্যাগ করে চলে যায় ? সে তেমন পাষণ্ড ছিল কি না—" যোগেশ মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আহা, যোগেশ ! তুমি ভুলে যাচ্চো নাকি যে সে তার বাপকে ছেড়ে চলে গেছে ! বাপের চেয়ে কি স্ত্রী বড় হল ? যে পিতৃস্নেহ ত্যাগ করতে পারে, সে এটাও পারে।"

ভুলিনি হে ভুলিনি, কিন্তু তোমার এ আরগুমেণ্টটা যে ঠিক পুলিশের মত দেখছি ; যেখানেই কেন চুরি হোকনা, সে তার কয়েদ-খালাসী দাগীচোরকে ধরবেই। বিনোদবাবু বাপের উপর রাগ করে গিয়েছেন, তবে আর কি তিনি স্ত্রীও ত্যাগ করেছেন। এ তাঁর করাই উচিত। ছুতা পেলে তোমরা এমনি করেই লোককে চেপে ধর বটে ! হা হা হা।"

হেমেন্দ্রের মুখটা অসাধারণ- বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার কম্পিতবক্ষে হস্তবদ্ধ করিয়া স্থিরকর্ণে যোগেশের কথার প্রত্যেক বর্ণটি পর্য্যন্ত যেন পেটুকের মত গিলিতেছিল। মানুষ কুপরামর্শটি যেমন মনঃসংযোগপূর্ব্বক শুনিতে পারে, সুপরামর্শটি তেমন পারে না। শিবানীর আগমন-সংবাদে হেমেন্দ্র নিজেকে যে মুহূর্ত্তে বিপন্ন বোধ করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় বন্ধু-বেশী শনিগ্রহ আসিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া দিল, নিজের স্বত্ব পরকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে তাহার কোথায় কি খুঁৎ বাহির করিতে পার খুঁজিয়া দেখ, বোকামি করিয়া নিজেকে যেন বঞ্চিত করিয়া ফেলিও না।

অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা ডুবো চরও বুঝি পায় ঠেকিল। হেমেন্দ্রের সুখ সীমাতিক্রম করিয়াছিল। অতুল ঐশ্বর্য্য, অপর্য্যাপ্ত সম্মান, স্নেহ প্রেম ও ত্রুটিহীন সেবা কিছুরই অভাব ছিল না। সংসার তাহার মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে অপূর্ব্ব স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিল। সহসা বিনামেঘে একি বজ্রপাত! বিনোদের পুত্র! সত্যই ত সে এই বিপুল সম্পদের অধিকারী। হেম কে?

ভোজবিদ্যাবলে যেমন রাজপ্রাসাদ অরণ্যে, আবার অরণ্য রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়, হেমেন্দ্রের ভাগ্যেও যেন তাহাই ঘটিল। গরীব হেম তাহার দরিদ্র গৃহে ক্ষুদ্র পাঠাগারে মলিন জীর্ণ পুস্তকরাশিবেষ্টিত হইয়া কঠোর অধ্যয়নে জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডুবাইয়া দিয়া নিজেকে ঐশ্বর্য্যময় জগৎ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। সে ত স্বপ্নেও এই ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্রত্বপদ কামনা করে নাই। তবে কেন তাহাকে

তাহার অভ্যস্থ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া দুদিনের জন্য ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করাইয়া সুখের তীব্র গরল আস্বাদ জানাইয়া দিয়া আবার গভীর অন্ধকার দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করা! এ যে আরবা রজনীর অলৌকিক ভাগ্যবিপর্য্যয় কাহিনী। তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, হেমেন্দ্র ঘুমাইবার ছলে বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিয়া উঠিয়া বসিল।

ঘরে আলোকাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, টানা পাখা চলিতেছিল, ক্ষুদ্র ত্রিপদীর উপরস্থ রৌপ্যাধার হইতে তাজা ফুলের গন্ধ আসিতেছিল। মর্ম্মর টেবিলের পাশে সবুজ ভেলভেটমণ্ডিত মেহগ্নি চেয়ারে বসিয়া চিন্তাহীন হেমেন্দ্র আজ আকাশ পাতাল ভাবিয়া পাইতেছিল না। দেওয়ালগিরির আলো দর্পণে, দর্পণ হইতে বৃহৎ বৃহৎ চিত্রে নিপতিত হইয়া ঘর আলোকময় করিয়া তুলিয়াছে। গালিচাবৃত কক্ষভূমে বহুমূল্য বিলাতী ফ্যাসানের কৌচ কেদারা মূল্যবান রেশমঝালরযুক্ত সুদৃশ্য আবরণে আবৃত হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। বাতাসে দ্বারের বহুমূল্য সুচিত্রিত পর্দ্দা কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, সমস্তই যেন আনন্দময়।

হেমেন্দ্র একবার চাহিয়া সেই সব দেখিল। এই সুখের মাঝখান হইতে নামিয়া আবার তাহাকে কোথায় দাঁড়াইতে হইবে। কল্পনানেত্রে একবার সেই গোময়-মৃত্তিকালিপ্ত ক্ষুদ্র অঙ্গন-পার্শ্বে চুণবালি-খসিয়া-পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার-জানালাবিশিষ্ট সেই অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহখানি উদিত হইল। পুরাকালীন তক্তপোষের উপরে সেই যুগেরই একখানি মাদুর পাড়া এবং তাহার উপর চারিদিকে পুস্তকরাশি ছড়াইয়া বসিয়া কঠোর অধ্যয়ন। তখন তাহাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন?

হেমেন্দ্র অনেকখানি ভাবিল, সত্য কিছু আর শ্যামাকান্ত তাঁহার পৌত্রকে পাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না। যথাসর্ব্বস্বের 'মালিক' হইয়া যেখানে সে চারি পাঁচ বৎসর কাটাইল, সেখানকার দাবী দাওয়া শেষ হইলেও দয়াদাক্ষিণ্যের এখনও কিছুমাত্র অভাব ঘটিবে না। বিশেষতঃ, হেমেন্দ্রর জন্য যতটা না হউক, শান্তির জন্য অবশ্যই তিনি তাহার একটা কিছু উপায় করিয়া দিবেনই। হেমের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল। দয়া! যে বাড়িতে সে প্রভু ছিল, সেখানেই কিনা সে একজন প্রতিপাল্যগণ্য হইয়া থাকিবে?

হেমেন্দ্র একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ভাবিল, যোগেশত বড় মন্দ কথাও বলে নাই! তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে যাহারা নিজেদের প্রকৃত 'ওয়ারিষ' বলিয়া জাহির করিয়াছে, সত্য সত্যই তাহাদের সে অধিকার আছে কি না তাহার একবার ভাল করিয়া প্রমাণ লওয়া উচিত নয় কি? শ্যামাকান্ত নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের নামে জ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তাঁহাকে প্রতারিত করা এমন-কিছু কঠিন নহে, কিন্তু তাই বলিয়া কোথা হইতে কে আসিয়া বলিল, আমরা বিনোদের স্ত্রী আর ছেলে, অমনি সে তাহাদের—তাহারই অতুল ঐশ্বর্য্য ধরিয়া দিয়া নিজে পথে গিয়া দাঁড়াইবে! ইহা হইতেই পারে না।

হেমেন্দ্র চিন্তাকুলভাবে টেবিলের উপর উত্তপ্ত ললাট রক্ষা করিল; কতক্ষণ সে এভাবে ছিল তাহা সে জানে না, সহসা পৃষ্ঠে কাহার মৃদুকরস্পর্শ হওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। "তোমার কি অসুখ করেছে? সাধু গিয়ে বল্লে অনেকক্ষণ এমনি করে রয়েছ হয় ত অসুখ করবে।"

হেমেন্দ্র এই ঔৎসুক্যপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নে মুখ তুলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নীর পানে ফিরিয়া চাহিল। শান্তির বড় বড় কালো চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ও সুন্দর মুখের উদ্বিগ্ন ভাব আজ সহসা অপ্রয়োজনেও হেমেন্দ্রনাথের বক্ষে আঘাত করিল।

হেমেন্দ্র আজ এতদিন পরে নূতন করিয়া অনুভব করিল যে, এই উদ্বিগ্ন হৃদয়খানিই এখন কেবল তাহার নিজের! এখানে ইহা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই তাহার আপনার বলিয়া দাবী করিবার অধিকার নাই। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "অসুখ হয়নি শান্তি, ঈশ্বর আমাদের উপর নিদয় হয়েছেন তাই ভাবছি।"

ঈশ্বর? ঈশ্বর আমাদের উপর যত সদয় এমন দয়া তাঁর অল্প লোকেই পেয়েছে। তোমার কপালটা গরম হয়ে উঠেছে যে! কাল রাত্রে ঘুম না হওয়াতে বোধ হয় শরীরটা ভাল নেই। আজ আর বাইরে যেও না, আজ রাতটা ভাল ঘুম হলেই সব সেরে যাবে এখন। এসো, আমার দিকটায় গোলমাল অল্প,সেখানে ঘুমোতে পার্ব্বে।" সপ্রেম চক্ষে স্বামীর পানে চাহিয়া সে তাহার স্কন্ধের উপর একটা হাত রাখিল। আজ সে সরম সঙ্কোচে নিপীড়িতা লজ্জাশীলা বধূ নহে, কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নীরূপে নিজের অকুণ্ঠিত অধিকারের গর্ব্বে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। হেমেন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত হইয়া শান্তির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে কি বুঝিতে পারে নাই? এ ঘটনায় তাহার মনে কি একটা আঁচড়ও লাগে নাই? অথবা সে তাহার সহিত ছলনা করিতেছে? আবার একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আর ঘুমিয়েছি শান্তি, ঘুমের দফা আজ থেকে শেষ। শুনছি, একটা মাগি নাকি বিন্দার স্ত্রী সেজে এসেছে?"

শান্তির সমস্ত মুখখানা ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চমকিয়া উঠিয়া স্বামীর কাঁধের উপর হইতে হাতখানা টানিয়া লইয়া দুই পা পিছু হটিয়া গিয়া লজ্জায় ক্ষোভে মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গিয়া ধিক্কারের সহিত সে বলিয়া উঠিল, "কি বলছো? তিনি যে অমুর মা, আমাদের দিদি, তিনি তোমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী।"

"তিনি যে কে তার ঠিকানা কি? বিনুদা এমন লোকই ছিল না যে যেখান সেখান থেকে একটা কুড়ুনে মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে! তার তেজ, গর্ব্ব, মর্য্যাদাভিমান যে জানে সে একথা কখনই বিশ্বাস করবে না। বাবা এখন তার নামে পাগল, সেইজন্য তার নাম করে যে যা বলে তাতেই বিশ্বাস করে বসেন। তাবলে আমি কিন্তু সহজে ছাড়বো না, আমি এর বিশেষরূপ তদন্ত করব। নিশ্চয়ই বিনুদা ঐ হীন স্ত্রীলোকটার ফাঁদে পড়ে মৃত্যুকালে ওদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন, সে তাঁর কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে সেই আংটি ও ছবির জোরে জাল ওয়ারিষ সেজে এসেছে। আমি অবশ্য আমার প্রাপ্য সম্পত্তি অমনি ছাড়ছি না—"

শান্তির কম্পিত অধর ভেদ করিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল, "কি সর্ব্বনাশ!" ফুটন্ত গোলাপ যেন মুহূর্ত্তে শ্বেতপদ্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভীতা শান্তি একখানা কেদারার উপর বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এমন কথা তুলে দিদিকে তুমি অপমান করোনা। না, না এমন কাজ করোনা। ওগো তোমার পায় পড়ি, চুপ কর, তাঁর কাছে তাহলে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।"

"শান্তি, তুমি ভারী নির্ব্বোধ! এই রাজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ কর্ব্বে

তুমি কি আমায় সেই বাসড়ার জঙ্গলে আবার ফিরে যেতে বল? তুমি কি চাও আমি এই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে 'ভাস্করানন্দ' স্বামীর মত সংসার ত্যাগ করে যাই, নয় দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াই? তোমার কি? তোমার বাপ আছে। সেখানে গিয়ে দিব্যি আরামে বসে থাকবে, তুমি বল্‌বে না কেন?"

শান্তির রক্তহীন মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল। "আমি কি তাই বল্লুম? কেন, আমরা এখানে যেমন আছি, তেমনি থাকবো, তাতে কেউ ত আমাদের বাধা দিতে চায় না। অমূল্য ছেলে-মানুষ, তুমি তার কাকা। তাকে তুমি যত্ন করে পালন কর। এ বাড়ীতে আমাদের সেই পূর্ব্বের মত সবই আছে, কেবল বেশীর মধ্যে আর একটা কর্ত্তব্য—"

"আমায় আর কর্ত্তব্যের লেকচার শুনিয়ে কাজ নেই, কর্ত্তব্য নিয়ে তুমি বসে থাক, আমার কর্ত্তব্য আমায় কর্ত্তে দাও। আমি ত তোমার মতন ক্ষেপিনি যে ওই জালিয়াৎ মাগির তাঁবেদার হয়ে থাকব। তা আমি কিছুতেই থাকছি না, আমি হয় এস্পার, নয় ওস্পার একটা কিছু চাই, তা তুমি জেনে রাখো। দয়ার প্রত্যাশী,—এ চৌধুরী বংশের রক্ত নিয়ে এপর্য্যন্ত কেউ হয়নি।"

শান্তির সমস্ত শরীরের রক্ত যেন গরম জলের মত টগবগ্‌ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে একমুহূর্ত্তে ফুটিয়া উথলাইয়া উঠিতে লাগিল, সে দুই হাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া নিরুদ্ধশ্বাসে সকাতরে কহিল, "আমি কখনো তোমায় কোন অনুরোধ করিনি, আজ একান্ত অনুনয় করছি, আমার কথা রাখ। সতীসাধ্বীকে অপমান

করোনা, কর্‌লে কখনই আমাদের মঙ্গল হবে না। ঈশ্বর কখনই তাহলে আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদের প্রতি তিনি অনেক দয়া দেখিয়েছেন, তাঁর সে অসীম দয়ার জন্য আমাদেরও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা যদি সে অমূল্য দান বৃথা দর্পে নষ্ট করে ফেলি, তাহলে আর এর পরে সে দয়া পাব কেন? আমার মিনতি রাখো, দিদির সঙ্গে বিরোধ করোনা, অমূল্যকে স্নেহ করো, তিনি আমাদের প্রতি যেমন দয়া করছেন, তেমনিই কর্ব্বেন।"

২৩

সকালবেলা পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে হরিদাসী বিম্‌লীকে সম্বোধন করিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো নূতন মুনিব লোক কেমন লো? তুই ত দশদিন নিয়ে ঘর করে এলি।"

বিমলদাসী কর্ত্রীর কাপড়খানা জলে প্রসারিত করিয়া দিয়া একটু চাপা স্বরে এদিক ওদিক চাহিয়া উত্তর করিল,"মন্দ কি! আমাদের এখানেও ঘাসজল, সেখানেও ঘাসজল! গতর খাটাবো খাবো, তার আবার ভাল মন্দ! এই যে বলে অন্ধ জাগোরে, না কিবে রাত্তির কিবে দিন।"

"তবে যে তারিণী বল্লে মাঠাকরুণের মত অমন নাকি মিলুনে মিশুনে নন? একটু যেন ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে, বাব্বাঃ মা-টি তো একটি সরদারনি! উনি যদি এ ভিটেয় ঢুকে বসেন, তাহলেই লক্ষ্মীপুরের হাড়ের লক্ষ্মী ছাড়াবেন, তা আমি বলে রাখ্‌লাম্ দেখে নিও।"

বিমলা একটু বেশী সাবধানী। সে আর একবার সেই

আম্রবৃক্ষচ্ছায়ায় ঢাকা সরল রেখান্বিত সুদূর পথপ্রান্ত পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল, চারি পাড়ের তাল, আম ও বাতাবীলেবুর ছায়ায় স্নিগ্ধ ঘাটের দিকে চকিত দৃষ্টি ফিরাইল। উত্তর পাড়ে কলমীদলের নিকটে জলের ধারে একটা বিরাগী বক ছাড়া আর কেহ কোথাও নাই, বকটি চোখ বুজিয়া পরমার্থ চিন্তা করিতেছে কি মৎস্য প্রত্যাশা করিতেছে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তখন আশ্বস্ত হইয়া গলার কাংস্যবিনিন্দিত স্বর মৃদুতর করিয়া বলিল, "তা কিছু মিথ্যে বলেনি বোন, নতুন গিন্নির ভারি দ্যামাক, দুনিয়ার মনিষ্যির সঙ্গে কথাবার্ত্তাই কন না। আহা, মা আমাদের যেমন মাটির মানুষ, তেমন ধারা কি সবাই হতে পারে, না অমন আর আছে? তা দ্যাখো আমাদের পোড়া অদেষ্টে আবার কি ঘটে। তখনি বুঝেছি,—বলি নিত্যি নিত্যি কাল পেঁচাই বা ডাকে কেন?" বিমলার স্বরে কোন প্রচ্ছন্ন রহস্যের আভাষ পাওয়া গেল। হরিদাসী বগ্‌নো ঘর্ষণে বিরত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখ তুলিয়া সঙ্গিনীর পানে তাকাইয়া বলিল, "কি লা বিমলি, ব্যাপারখানা কি? তারিণী বলছিল, বড়গিন্নির মা নাকি মাঠাকুরুণকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, হ্যাঁ লা সত্যি? এসেই নাকি বলছিল বাড়ী ঘর সবত আমার মেয়ের, ওরা এখন থেকে কোথায় থাকবে? তা আমাদের বাড়ীর খোসামুদিরাও তেমনি বলেছেন নাকি নিজের পথ খুঁজে নেবে। সব যে হচ্ছে তা কর্ত্তাবাবু কিছু বলেননি? ব্যাপারটা কদ্দুর গড়ায়, কে জানে!"

বিমলা সুন্দরী কাচা কাপড়খানা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর ব্যাপার! ব্যাপার অনেক দূরই গড়িয়েছে। এঁদের ত এই কাণ্ড, ঐ

দিকের খবর. শুনিস্‌নি কিছু? কাল রাত্তিরে ছিরাচার মিরাচার ফেলে ছোটবাবু নাকি কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে কুলুক্ষেত্তর কাণ্ড করেছেন। নবুনে বলছিল বাবু নাকি বেশী কিছুই বলেননি ছোটবাবুই মুখ চোখ রাঙ্গিয়ে তাঁকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়েছেন, বুড়মানুষ নাকি মনের দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল।”

শ্রোত্রী উথলিত আগ্রহে নিরুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, “বলিস কি লো! এমন আশ্চর্য্য কথা ত কখনো শুনিনি। তা’পরে হলো কি? ওমা বলে ‘যার শিল তারি নোড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।’ এযে তাই করলে! ‘ওমা কার দৌলতে এত! হ্যাঁ, দেখিনি ত আর কিছু, পেরথম যখন বাবু নিজের ঘর থেকে এলেন, তখন মুখে রা’টি নেই, ময়লা টেনারত্তি পরনে, দেখতে দেখতে নবাব খাঞ্জেখাঁ। কে জানে বোন্ আর ত কিছু শুনিনি, তা আমরা আদার ব্যাপারী আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? চুপ, কে যেন আসচে! কেগো দিদিঠাকুরুণ যে! আজ যে আপনার এস্‌তে এত বেলা হল?”

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দোক্তাপোড়া টেপা অধরে সৌজন্যের মৃদুহাসি হাসিয়া গাত্রমার্জ্জনী হস্তে ঘাটের পৈঠায় দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন, “কাল নাটক দেখে ঘুমুতে ত পাইনি, আলিস্যিতে শরীর যেন মাটি মাটি করতে লেগেছে। শিবি কোথা গেল গা? উঠেছে?”

“কোন যুগে! নূতন মাঠাকরুণের সঙ্গে বুঝি পূজো করতে গ্যাছে, তা দিদি-ঠাকরুণ! দুটি যা’য়েতে খুব মিল হয়েছে বাবু, আজ্‌কালকার সব যেমন হয়েছে তেমন নয়।”

কথাটা সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর তেমন মনঃপূত হইল না। তিনি

তোমাদের সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক্,—আমি একবার মরেছিলাম, এ আবার আমার দ্বিতীয় মৃত্যু! জন্মের মত চল্লাম, অনেক সহ্য করেছি, আর না।”

নীরদকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চাদরখানা ভূমিতেই পড়িয়া রহিল; সে উঠাইয়া লইল না। শিবানী পূর্ব্বের মত বসিয়া রহিল, পাথরের মত কঠিন তাহার মুখে একটিও রেখা পড়িল না। একটুও ভাব বদলাইল না।

নীরদ বাটী হইতে বাহির হইলে সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন, “শিবি! নীরদ আবার এখন গেল কোথায়, জানিস্?”

শিবানী উত্তর দিল, “না।”

“সকাল সকাল মুখ-হাত ধুয়ে ডুটো খেয়ে গেলেই হতো! এর দোরে তার দোরে টোক্‌লা সেধে বেড়াতে তো ভালও লাগে! বাড়ীর ভাত-বেন্নুন তো ভাল লাগে না! তা বারণও কল্লিনি—চলে গেল?”

শিবানী এবার মুখ ফিরাইল। ফাঁসীর আসামী যেমন করিয়া জজের পানে চাহে, তেমনই করিয়া সে মায়ের পানে চাহিল, বলিল, “না”।

“ধন্যি মেয়ে, তুমি বাছা, কেমন বা শ্রদ্ধা-ভক্তি, আর কেমনই বা মায়া-মমতা, তা কিছু বুঝতে পারিনা! ঢের মেয়ে দেখেছি এমন মেয়ে আমার বাপের জন্মে দেখিনি, বাবা। মরুকগে, যা খুসী সব করগে যাও! আমার কি?” বলিতে বলিতে তিনি নামিয়া গিয়া, সংবাদটি মিতিন ও মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর করিবার লোভে সকাল সকাল তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিলেন।

ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া শ্লেষের স্বরে কহিলেন, "অমন বোকা যা পেলে সবারি মিল থাকে, পোড়া মেয়ে চারকালই নিজের ভাল বুঝলে না।"

ক্রমে ক্রমে মাসীমা মামীমা পিসিমা খুড়িমাতে পুকুরঘাট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। থিয়েটার ও হেমেন্দ্র শিবানীর আলোচনায় তাঁহাদের প্রাভাতিক মিটিংটি মন্দ চলিল না।

যেদিন ৺পুরীধামপ্রত্যাগতা সিদ্ধেশ্বরী নিজের জনহীন গৃহে প্রবেশ করিয়া হতবুদ্ধি হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই মহাপ্রসাদের ডালাখানি, কন্যার কটকী চুড়ি ও জোড় খোকার একটি জগন্নাথের বাটী হাতে মাতঙ্গিনীর সহিত বিস্ময় ও আনন্দে নিরুদ্ধবাক্ হইয়া বৈবাহিকের সুবৃহৎ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিনকার চেয়ে এই লক্ষ্মীপুর জমীদারভবনে পা দিয়াই তাঁহার আনন্দ ও অহঙ্কার শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মাসীমাতা ও মাতুলানীর নিকট সিদ্ধেশ্বরী নিজের ভবিষ্যদর্শনজ্ঞানের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে বিস্ময়কর গল্প বলিয়া বলিয়া তাঁহাদের বিস্ময়পূর্ণ শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছিলেন, নিরুদ্দিষ্ট জামাতার জন্য মধ্যে মধ্যে শোক প্রকাশ করিতেও ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তার চেয়ে তাহার বোকামির প্রতিই ক্রোধটা বেশী করিয়া হইতেছিল। এত বড় আহাম্মক দুনিয়ায় কখনো কি জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এত বড় বিষয় সম্পত্তি সে কিনা মাটির ঢেলাটার মত ছাড়িয়া দিয়া গেল? গেলই যদি, তবে তাহাদের কোন্ নিজের পরিচয়টা দিয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে কোথা হইতে একটা আপদস্বরূপ পুষ্যি বেটা কি জুটিতে পারিত! তার উপর আবার এও কি এক দুর্গ্রহ! মূঢ় শিবানী কোথা নিজের ধন পরের হাত হইতে বুঝা পড়া করিয়া লইবে, তা'না করিয়া তাহাকে লইয়াই

আহ্লাদে একেবারে তদ্‌গত হইয়া উঠিল। কি মূর্খকেই তিনি গর্ভে ধরিয়াছিলেন! সেদিন সিদ্ধেশ্বরী সেই কথার আভাস দিতে গিয়া কন্যার নিকট অনেক তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া হার মানিয়া বুঝিয়াছেন যে, কন্যাকে নিরাপদ করিবার ভার সে না লইলেও তাঁহাকে লইতে হইবে! নহিলে সে এত বড় শ্বশুরের বধূ হইয়াও এ সংসারের একপ্রান্তে অনাথার ন্যায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইবে মাত্র। ছেলেটির নাজানি কি অবস্থাই ঘটে? কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের যে হকে'র ধন অন্যে কাড়িয়া খাইয়া তাহাদের এমন হাল করে সেটাও তাঁহার সহ্য হয় না। কাজেই পরামর্শ চাহিবার জন্য হিতৈষিণী বৈবাহিকাগণের শরণাপন্ন হইলেন। হাজার হউক শিবানী তাঁহাদের সহিত শোণিত সম্পর্কে সংযুক্ত আছে, শান্তির সম্বন্ধটা ত কেবল গৃহস্বামীকে খুসীর খাতির বই ত না।

সেদিন প্রভাত সমিতির প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "যাইহোক বাবু মেয়েটা আমার বড়ই বোকা, নিজের ঘরে এলি বাপু নিজের সব বোঝা পড়া করে নে, তা নয় যেন চোর, এ কোণে ও কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর তিনিই যেন সর্ব্বে সর্ব্বময়ী হয়ে আঁচলে চাবির গোছা ঝুলিয়ে মদগর্ব্বে চারটে হয়ে ফুলে উঠেছেন। তোরও ত অন্যায় বাবু, তুই বা কি হিসেবে পরের ধনে পোদ্দারি করিস!"

মামীমা বলিলেন, "তাই ত, ও যেমন দেবা তেমনি দেবী, কেউ উনিশ বিশ নন।—বাপও কি সামান্য তুখোড় নাকি? দেখলে না সারারাত্রির আমোদ পেরমোদ সব ছেড়ে ছুড়ে মেয়ের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ গুজগুজ। মেয়েকে বুঝি আইনের কানুন শেখান হচ্ছিল।

আহা মেয়েটা আমার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে, সহরে মেয়ের কাছে ও পারিবে কেন বল?" ইহা বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আহা, বাছা আমার কারো ভালয়ও নেই, মন্দয়ও নেই; লোকে যে কেন তাকে বঞ্চিত কর্ব্বার জন্যে ফন্দি এঁটে বেড়াচ্ছে তা জানিনে। তা দেবতা আছেন, কলিকাল হলেও অতটা অধর্ম্ম কখনো সইবেনা। এই দেখনা ওরি শাশুড়ির ত অতটা গহনা, তা সেদিন বল্লুম যে বলি মেয়েটা নোয়া সার করে রয়েছে তোমার হাতের চুড়িগুলো খুলে ওকে পরিয়ে দাও, তা পারলেন না, ··র বেলায় বুক টন্ টন্ করে উঠলো। এদিকে আবার দিদি বলে নাকে কেঁদে খুন।

পিসিমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি একটু ন্যায়বাদী। এবার বাধা দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "অমন কথা বলোনা বো'ন, ছোট বৌমা তখনি ত চুড়ি খুলে বড় বৌমাকে পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তিনি কিছুতেই পারলেন না। পরশুদিন এসেই অন্য চুড়ি বার করে পরাতে গেলেন, বৌমা কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন, আমার কি এখন সখের দিন এসেছে? তা ছাড়া ওসব গহনা তাঁর বাপের দেওয়া। বৌমা আমাদের লক্ষ্মী, তাঁর নিন্দে করোনা। হেমাটা পাজি বটে তা দু'শোবার বল্‌বো।"

সিদ্ধেশ্বরী মুখ টিপিয়া একটু ইঙ্গিতের হাসি হাসিয়া মাসীমার পানে চাহিয়া দেখিলেন, মাসীমা ইসারা বুঝিয়া শুধু খাতিরে একটু ক্ষীণ হাঁসি হাসিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "ওগো তোমরা বোঝনা, ইনি হচ্চেন মিটমিটে, ভিতরে যেন কতই ভালমানুষটি, ভাজামাছখানি উল্টে

নিতে জানেন না, কিন্তু ওসব কলকাতার মেয়েদের পেটে পেটে বুদ্ধি, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি ; ওদের চেনবার যোটি নেই। 'হেমের দোষ দিচ্চ ? সে কি করেছে ? সেটা হাঁদা, তার অমন কুটকচালে বুদ্ধি নেই, তাকে যেমন পরামর্শ দেবে তেমনি করবে বৈত নয়। ওটা কি একটা মানুষ ? দেখলে না কি রকম মেয়ে, কাল সেই লোকারণ্যির মধ্যে যেমন সেধো এসে বলেছে, ছোটবাবুর বোধ হয় অসুখ করেছে, অমনি মেয়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বৈঠকখানাতেই ছুটে গ্যালো ! ধন্যি বাবা কলিকাল ! তোমার পায়ে হাজারবার গড় করি ! আমরা হলে শ্বাশুড়ি ননদে তখনি পাঁশ পেড়ে কেটে তুখান করত। ওকি বউ মানুষ !"

মামীঠাকুরাণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া চিন্তিত ভাবে প্রকাশ করিলেন, "হিংসের চোথ থেকে বিনোদের গুঁড়োটুকুকে যে কেমন করে রক্ষে করবো তা বুঝতে পারছিনি।"

সিদ্ধেশ্বরী সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যেদিন দেখেছি ঘরে শত্তুর জিয়োন আছে, সেদিন হতেই ওর আশা আমি ছেড়ে দিয়েচি। বাছাতো আমার এখন অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে, না না, ওসব লোক ঘরে থাকতে আমার আর কিছুই আশা ভরসা নেই।"

বিনোদের মাতৃস্বসা মুণ্ডিত মস্তক ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে মাথায় অঞ্জলি করিয়া জল দিতে দিতে দুঃখের চরমে উঠিয়া বলিলেন, "হুঁঃ ও আবার বাঁচবে ! ওকি বাঁচতে এসেচে, ও শুধু আমাদের ছলতে এসেচে বই ত না। বিনু যেমন জ্বালিয়ে গ্যাছে, ও-ও তেমনি আমাদের জ্বালিয়ে যাবে। দেখচোনা ওকি বাঁচবার ছেলে ? এই বয়সে কত কথা কত বুদ্ধি। আমায় বলে 'দিদি', চৌধুরী মশাইকে বলে 'দাদা', যেন কতকালের চেনাশোনা"—

কাদম্বিনী গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ঈষৎ ক্রন্দনের সুর তুলিলেন, "ওই জন্যেই তো ছেলেটার পানে তাকাইনে মাসী! বলি ওতো বাঁচবেইনা, তবে মিথ্যে কেন দেখে শুনে মায়া বাড়াবো?"

সেদিনকার সকাল বেলাটা শান্তির পক্ষে বড় মধুর হইয়া আইসে নাই। রাত্রে হেমেন্দ্র তাহার সহস্র অনুনয় ঠেলিয়া, তাহার অজস্র অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া শ্যামাকান্তের সহিত কলহ করিয়াছে। সে তাঁহার সব চেয়ে আপনার ধন অমূল্যকে জাল বলিয়া তাঁহাকে ভয়ানক আহত করিয়াছে; সে লজ্জায় সে যেন মরিয়া গিয়াছিল। সারারাত্রি সে তাহার নির্ব্বাপিতালোক শয়নকক্ষে একা বিছানায় পড়িয়া ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিয়াছে, একবারও বিছানা ছাড়িয়া উঠে নাই, অথবা ঘুমাইতে পারে নাই।

সেদিনকার সমুদয় কর্ম্মবন্ধনেও যেন সে তাহার উৎক্ষিপ্ত চিত্তকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সে সংসারের কর্ত্রী, আজ তাহার বাড়ী নিমন্ত্রিতে পূর্ণ, আজ তাহার কত কাজ, কত দায়িত্ব, কিন্তু কিছুতেই সে তাহার সংযত হৃদয়খানিকে কোন সান্ত্বনা দিয়া অপরাধের গণ্ডী হইতে আত্মচরণ ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছিল না। স্বামীর অপরাধের সেও ত অংশভাগিনী? থিয়েটারের কনসার্টে তাললয়সমন্বিত মধুর স্বর-লহরী, সঙ্গীতের প্রত্যেক পদটি পর্য্যন্ত কক্ষমধ্যে ধ্বনিত করিতেছিল। বৃষ্টিহীনা জ্যোৎস্না রাত্রির নির্ম্মল শোভাটুকু মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার চোখের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তির মনে প্রাণে যেন সে সব কিছুই পৌঁছিতেছিল

না। নিজের জন্য, স্বামীর জন্য ক্ষণে ক্ষণে ঘোর লজ্জা অনুভব করিয়া সে সেই অন্ধকারের মধ্যেও আপনার নিকট আপনি আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কি দিয়া যে এই অবক্তব্য লজ্জা ঢাকিয়া ফেলিবে, তাহা সে কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিল না। সকালে উঠিয়া সে কেমন করিয়া জ্যেঠামশায়ের কাছে মুখ দেখাইবে? শিবানীর চোখের উপর চোখ রাখিবে কেমন করিয়া! এমন কি অমুকে আদর করিবার অধিকার শুদ্ধ যেন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

ভোরের বেলা স্বপ্নপূর্ণ তন্দ্রার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে শুনিতে পাইল তাহার ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া অমূল্য ডাকিতেছে "কাকীমা?" "কি মাণিক!" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। দ্বার খুলিতেই নগ্নকায় সুন্দরকান্তি শিশু তাহার জানু জড়াইয়া ধরিল, সদ্যজাগ্রত পাখীটির কলকাকলীর স্বরে কহিল, "আমি পাইয়ে এসেচি।"

শান্তির প্রথম সঙ্কোচ এমন করিয়া কাটিয়া গেল। সে সানন্দে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে জোরে জোরে তাহার ললাটে গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন অর্দ্ধেকটা হৃত শান্তি ফিরিয়া পাইল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "অমু তুই যে এত ভোরে উঠেছিস? তোর মা কোথায়?"

অমূল্য তাহার কচি কচি হাত দুইখানি দ্বারা কাকীমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সানন্দে তাহার চুম্বন প্রতিদান করিয়া কহিল, "মা ঘরে আছে, আমি বাজনা দেবেবা, লাত্তিরে বাজনা বাজছিল।"

"সে বাজনা যে চলে গেছে ধন! আচ্ছা আমি তোকে

একটা ভাল বাজনা দিই আয়। এই নে একটা বাঁশী নে। অমু, চল্ তোর মার কাছে যাই।" যাই বলিয়াও শান্তি যাইতে পারিল না। এতক্ষণে হয় ত শিবানী সব কথা শুনিয়াছে। সংসারের শুভার্থী লোকদিগের কল্যাণে এ সকল সংবাদ প্রচার হইতে বড় অধিক সময় লাগে না। এতক্ষণ সে তাহাদের কথা কি মনে করিতেছে, কে জানে? সে কি মনে করিতেছে না যে সেও ইহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আছে? সে কি ভাবিতেছে না, তিনি শান্তির স্বামী!

এমন সময় শিবানী আসিয়া ডাকিল, "শান্তি এখনও উঠিস্ নে নাকি?"

সন্ধ্যাবেলা যখন হেমেন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শান্তি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, তখন হইতেই শিবানী একা। এত বড় বাড়ী, ইহার ভিতর এত সব লোকজন ও তাহার প্রতি তাহাদের অযাচিত স্নেহ করুণার উৎস সহস্রধারে প্রবাহিত থাকা সত্ত্বেও সে একমাত্র শান্তিবিহনে একা। রাত্রে সে ফিরিল না দেখিয়া দেবরের শারীরিক সুস্থতার সংবাদ লইতে যাইবার জন্য একবার তাহার নিস্পৃহচিত্তে একটা প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যদিও হেমেন্দ্র তাহার নিকটতম আত্মীয় এবং প্রিয়তর স্নেহাস্পদ, তথাপি তাহারা এপর্য্যন্ত অপরিচিত, পর, সহসা অচেনা লোকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, শিবানীর পক্ষে অসম্ভব। তাই সে ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না।

শান্তি ঠিক আঁচিয়া ছিল। হেমেন্দ্রের সহিত গৃহস্বামীর বচসার একটা অতিরঞ্জিত আলোচনা সেদিন কর্ম্মগৃহের সমুদয় নর এবং নারীর মুখে মুখে বিস্তৃত পল্লবিত হইয়া

পড়িতেছিল। শিবানী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপোর অসুখ করেচে, শুনেছিলুম না ?"

দাসী মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "হুঃ, অসুখই বটে !"

"তবে কি হয়েছে ?"

"হবে আবার কি, আমাদের খোকাবাবুকে দেখে হিংসেয় জ্বলে উঠেচেন, এই কথা নিয়ে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে নাকি কুলুক্ষেত্তর হয়ে গেল। নবনে বলছিল, তিনি নাকি বলেছেন, তুমি আমাদের দাদাবাবুর ইস্তিরি নও। ওমা ! ইকি কথা গো, অবাক কল্লে যে !

শিবানী সহসা আর্ত্তভাবে বাধা দিয়া বলিল, "বিমলা, বিমলা থামো। শান্তি কোথায় ?"

বিমলি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, "কি জানি বড় মা, মাঠাকরুণ বোধ হয় কর্ত্তাবাবুর ঘরে, কি ছোটবাবুর ঘরে কোথায় আছেন। তা হ্যাঁগা, তুমি যে বড় থিয়াটার দেখতে গেলে না ? পাড়ার মেয়েরা সব এয়েচেন, তোমায় সবাই খুঁজতে নেগেচেন যে।"

শিবানী বলিল, "বলগে আমার অসুখ করেছে।"

"ওমা সেকি গো ! মাঠাকরুণ গেলেন না, তুমিও যাবে না, নোকে বল্‌বে কি ? তা তুমিই এখন হলে বাড়ীর গিন্নি, তুমি 'নোক নৌকতা' না রাখলে চলবে কেন ?"

শিবানী ত্বরিৎপদে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা আমি যাচ্চি তুমি যাও।" তাহার চোখ দুইটা ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে এ বাড়ীর গৃহিণী ! কেমন করিয়া ? কেহ কি তাহাকে সে অধিকার দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল ? না। যে এ অধিকার

দিতে পারিত, সে ইহা হইতে তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল ? সে এ বাড়ীর কে ?

ভোর হইতে না হইতে শিবানী আর থাকিতে না পারিয়া শান্তির গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। যদি সেখানে হেমেন্দ্র থাকে এ সম্ভাবনাও আর তাহাকে সঙ্কোচ দিতে পারিল না। শিবানীকে দেখিয়া শান্তি তাহার গভীর সঙ্কটাবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "কে দিদি ? এস ভাই, আমরা এই তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

আসন গ্রহণ করিয়া শিবানী বলিল, "অমুটা ঘুম ভাঙ্গতেই পালিয়ে এসেছে, কিছুতেই ওকে আটকে রাখতে পারিনা, ঠাকুরপো আছেন মনে করে তবু অনেকক্ষণ উঠ্‌তে দিইনি।"

এই কথায় শান্তির গাল দুইটা হঠাৎ লাল হইয়া আসিল। সে মুখখানা একটু নত করিয়া ক্রোড়স্থ অমুর কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলা হস্ত দ্বারা নাড়িতে লাগিল। বালক তখন নূতন বাঁশী পাইয়া কাকীমার কোলে বসিয়া বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অবাধ্য বাঁশী তাহার মুখে ভাল বাজিতেছে না।

স্নানান্তে পট্ট-বসনা বধূদ্বয় দেবালয়ের ঘেরা দালানে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। শান্তির নিপুণ হস্তে ইহারি মধ্যে দুইগাছা গোড়ে তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবানী এ পর্য্যন্ত একগাছি ভিন্ন গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই। তখনও দেবালয়ে লোকসমাগম হয় নাই। দেব-সেবক ব্রাহ্মণদ্বয় পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল, আর একজন বিধবা আত্মীয়া অদূরে বসিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন।

মনের উপরকার বেদনার ভারটা অল্পে অল্পে কোন সময় যে নামিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে কার্য্য হইতে চোখ তুলিয়া সে শিবানীর পানে ফিরিয়া বলিল, "ও দিদি! তোমার এখনও সেই মালাটা শেষ হয়নি?"

শিবানী অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি ভাই বড্ড কুড়ে। এরি মধ্যে তোর তিন গাছা গাঁথা হয়ে গেল?"

শান্তি সমাপ্ত মালাগাছার মুখে গ্রন্থি দিয়া অবশিষ্ট সূতাটুকু কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া ফেলিয়া তাহা অন্য মালাগুলির পার্শ্বে তাম্রপাত্রে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "কিন্তু দেরি হলে কি হয়, আমার মালার চেয়ে তোমার মালার গাঁথনি অনেক পরিষ্কার হয়েচে। দিদি তুমি বিনা সূতার মালা গাঁথ্‌তে জান?"

সূঁচের মুখে পুষ্প প্রবেশ করাইয়া সেইদিকে চোখ রাখিয়া শিবানী উত্তর দিল "জানি কিন্তু বড্ড দেরি হয়।"

"তা হলেই বা,—এসো রাধাকৃষ্ণের জন্য দুজনে দুগাছি কৃষ্ণকলির মালা গাঁথি। আহা সেদিন যদি গেঁথে দিতুম, কেমন সুন্দর দেখাত। আমার রাজরাজেশ্বরীর জন্য পদ্ম পাপড়ি দিয়ে একগাছি নতুন রকম করে মালা গাঁথতে হবে। এই বড় লাল গোলাপটি তার মধ্যে দেবার জন্য থাক।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "পদ্মফুল কোথায় পাবি?"

শান্তি তাহার সরল স্মিতহাস্যে প্রভাতপবনে ঝঙ্কার তুলিয়া কহিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি কিছুই দেখ না, খিড়কির পুকুরে উত্তর দিকটায় অনেক পদ্ম ফুটে আছে ত, দাঁড়াও মালা গাছটা শেষ করে তুলে আনা যাবে।"

"ওমা এরি মধ্যে তোর প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়ে এল যে!

৩

লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ, ক্রিয়াকাণ্ড দানধ্যানে বেশ একটুখানি নামার্জ্জনও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জমিদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর নামে যদিও অনেকে কৃপণ অপবাদ দিয়া থাকে, তথাপি দোল দুর্গোৎসবে ও গৃহে নিত্য অতিথি-সেবার সুবন্দোবস্তে কেহ কখনও তাঁহার ত্রুটি ধরিতে পারে নাই। জমিদার-বংশধরের মত বিলাসিতার ব্যয় অথবা বিশেষ করিয়া একটা দান ধ্যান করিয়া নামার্জ্জন ও লোকহিতসাধন এ দুইটার কোনটাই তাঁহার পছন্দমত ছিল না। কি করিলে জমিদারীর আয় বাড়িবে, নগদ টাকাগুলা কেমন করিয়া খাটাইলে শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, এবং কাহার কোন জমিদারীখানা অল্পমূল্যে নীলামে চড়িতেছে, এই সকল ভাবনা ও তাহার জন্য চেষ্টা করা তাঁহার জীবনের যেমন একটা প্রধান কার্য্য ছিল, তেমনই আর একটা বিষয় তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে কর্ত্তব্য, তাঁহার একমাত্র মাতৃহীন পুত্র বিনোদকুমারকে মনের মত গড়িয়া তোলা।

শ্যামাকান্তের অনেকগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে অবশিষ্ট একটি মাত্র সন্তান। বিনোদকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া বিনোদের মা যখন কালের অকাল আহ্বানে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই তাঁহার সাধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন বিনোদ দশ বৎসরের বালকমাত্র।

'মরা-হাজা' বলিয়া জন্মাবধি সে সকলকার নিকটে পাওনার অধিক পাইয়া আসিয়াছে। তাহার পায় চোরের বেড়ি ও লৌহ

শান্তি আমি ভাই বড় অকর্ম্মা, আমায় তুই একটু কাজের লোক করে নে না ভাই।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "তাই ত, আমি যেন বড্ডই কর্ম্মা! মা বলতেন, আমার কাজ তাড়াতাড়ির জন্য তেমন পরিষ্কার হয় না, তোমার সকল কাজই আমার চেয়ে কেমন পরিষ্কার!"

"ভারী পরিষ্কার! আমি জানিই বা কি? কাল রাত্রে আমার সে বইখানা শেষ হয়ে গেছে, আর একখানা কিছু দিস্, রাত্রে ত সব দিন ঘুম হয় না।"

শান্তি বলিয়া উঠিল, "এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে? তবে নাকি তুমি ভাল পড়তে জাননা? আচ্ছা 'অনাথবন্ধু' তোমার কেমন লাগল বল?"

শিবানী ঈষৎ ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ লাগল শান্তি, কিরণশশি বড় দুঃখী, দুঃখীর মনে দুঃখের কথাই বেশি লাগে; কিন্তু শেষটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে, ভাল বোঝা যায় না।"

"শেষটাতে হিন্দু গৃহস্থের জানবার উপযোগী অনেক ভাল কথা আছে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বদেশহিতৈষিতার মধ্যে আমাদের সংসার কেমন করে গঠিত হতে পারে, এ বইখানি ভারি একখানি সুন্দর উপদেশপূর্ণ চিত্র। বাবা সুকুকে বলেন, অনাথবন্ধুর নায়ক অনাথবন্ধুর মত হও—সুকুর পক্ষে আমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ কিছুই মনে করিনা, তা দিদি সুকুও বোধ হয় অমনি ভাল হবে। এখন থেকে সে বিদেশী জিনিষ স্পর্শ করে না, পরের উপকার করতে পারলে এত আনন্দিত হয় যে, সেজন্য নিজের কোন ক্ষতিকেও সে গ্রাহ্য করে না। অনাথবন্ধু পড়বার পর

'পারিবারিক প্রবন্ধ' পড়লে বেশ ভাল করে বুঝতে পারা যায়। ও বইখানি বোধ হয় তুমি পড়নি?"

"না ভাই, আমি কাশীদাসী মহাভারত, আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভিন্ন কিছুই ত পড়িনি।"

"আচ্ছা, তবে তুমি পারিবারিক প্রবন্ধখানা পড়, বাবা বলেন, পারিবারিক প্রবন্ধ আমাদের দ্বিতীয় 'মনু'।"

শিবানী মনুর সংবাদ জানিত না, সে পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠ করিবার লোভে অত্যন্ত প্রলুব্ধ হইয়া রহিল।

এমন করিয়া দুঃখের যে ভারি মেঘখানা অম্লান পুষ্পকোরকের মত ক্ষুদ্র বক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়া আবার আনন্দের স্নিগ্ধ আলোটুকু যখন তরুণ হৃদয়ের একটি প্রান্ত দিয়া সবেমাত্র মুক্ত দ্বারপথে ঊষালোকের স্নিগ্ধমধুর হাস্যচ্ছটার মত তাহার হৃদয়প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একটা আসন্ন ঝটিকা অকালোত্থিত ঝাপটায় সজোরে সেই দ্বারখানা আলোটুকু সব চাপিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

মানুষকে সাপে কামড়াইলে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, পুষ্করিণীতে পদ্ম তুলিতে গিয়া শান্তি তেমনি নীলমাড়া বিকৃতমুখে সবেগে মাটিতে বসিয়া পড়িতে গেল। সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে অপূর্ব্ব তালে নৃত্য করিয়া উঠিল। এত ভালবাসার এই পরিণাম! এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পৃথিবী!

একটা টগরগাছে কতকগুলা টগরফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া আছে দেখিয়া শিবানী আর এক ছড়া মালা গাঁথিবার লোভে ফুল তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু ফুলকয়টা লইয়াই সে ফিরিয়া

আসিতে পারিল না। কারণ পঞ্চমুখী জবাগুলা বিবাহের কনের মত যে লাল চেলিতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে, উহাদের সে স্থান হইতে কোমল করের চতুর্দ্দোলে তুলিয়া লইয়া গিয়া যদি শ্যামা মায়ের কালো পা দুটিতে অঞ্জলি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে মানায়ও বেশি, আর তাহাদের পুষ্পজীবনটাও সফল হইয়া যায়।

শিবানী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, একটা বাতাবীলেবুর গাছে পিঠ রাখিয়া চুপ করিয়া শান্তি দাঁড়াইয়া আছে, ফুল তুলিবার কোন চেষ্টা বা উৎসাহই নাই। সে ঈষৎ বিস্মিতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফুল তুল্‌তে গেলি না যে ?" তারপর তাহার বিবর্ণ মুখের পানে তাকাইয়াই সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে শান্তি ?"

শিবানী পত্রপুটে আনীত ফুলগুলা ফেলিয়া দিয়া সস্নেহে তাহাকে দুই হাত দিয়া বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "শান্তি, শান্তি, কি হল ?" "দিদি" বলিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত ব্যাকুলভাবে শান্তি তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল, তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া যে জল আসিয়াছিল, তাহা আর লুকান রহিল না। শিবানী কিছু না বুঝিলেও ইহা সে বুঝিল, যেমন করিয়াই হউক সরলা শান্তি মনে কোন গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। আর সে আঘাতের কারণ হয় ত সে নিজেই। কাতর হইয়া দুইহস্তে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদচিস বোন ?" অশ্রুসিক্ত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া সে হাসিতে গেল। "কাঁদিনি দিদি, এস বাড়ি যাই।"

"মালা গাঁথবিনি শান্তি ? তোর রাজরাজেশ্বরীকে পরাবি না ?"

বৃষ্টির পরেই গাছপালার উপরে রবিরশ্মি যেমন ঝিকমিক করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই একটা সকরুণ হাস্যের আভাতে শান্তির অশ্রুচিহ্নিত গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "না দিদি, আজ থাক।"

২৪

শান্তির বিবাহের পর যোগেন্দ্রনাথ একাই মাদুরায় ফিরিয়া আসিল। ঘরদ্বার সব শূন্য, কিছুই ভাল লাগে না। স্ত্রী গৃহে না থাকাটা তাহার যেন একেবারেই অনভ্যাস ছিল। সেই ষোল বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ত্রিশের উপর সংখ্যা পাঁচ, ছয় হইতে চলিয়াছে, এই বস্তুটি তাহার সংসার-অরণ্যের একমাত্র সঙ্গিনীরূপে তাহার জীবনের সঙ্গে এমনই মিশিয়া গিয়াছিল যে, একটির পরিবর্ত্তে আর একটি আসিলেও তাহার কিছু-মাত্র বাধে নাই, কিন্তু যে কয়মাস একটিও ছিল না সেই কয়টা মাস তাহার সংসার অচল হইয়া পড়িয়াছিল। এবার চারিদিককার বিদ্রূপের জ্বালায় ও নূতন-গৃহিণীর আবদার এড়াইতে না পারিয়া সে শ্বশুরঘর হইতে নিঃসঙ্গই ফিরিয়াছিল।

সংবাদ লইয়া জানিল মিঃ রায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এবার আসিয়া অবধি বড় একটা কাজকর্ম্ম দেখেন শোনেন না। একজন নূতন ম্যানেজার রাখা হইয়াছে, তাহাকে বুঝাইয়া শিখাইয়া দিতে মধ্যে মধ্যে যা অফিসে যাওয়া আসা করিতে হয়, তদ্ভিন্ন বাকি সময়টা নিজের সেই নির্জ্জন বাসার মধ্যে নিজেকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বন্ধুরা কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্বারের প্রহরী ভৃত্য Not at home গোছের একটা উত্তর দিয়া

তাহাদের ফিরাইয়া দেয়। গুজব যে রায় সাহেব সহসা ভোল্ বদলাইয়া সন্ন্যাসী সাজিবার মতলবে আছেন। সেজন্য চিম্‌টা ও কমণ্ডলু ক্রয় করিতেও কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

যোগেন্দ্রর ছুটীর তখনও একদিন বাকি ছিল, সে তৎক্ষণাৎ জুতা ও উড়ানি পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

সম্মুখের বাগানে পুরাতন মালিটা ঝারি করিয়া গাছে জল দিতেছিল। সে যোগেন্দ্রকে দেখিয়া সেলাম করিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব বাড়ী আছেন?" উত্তর পাইল, "বাবু ঘরেই আছেন।"

সম্মুখের হলে কাহাকেও না দেখিয়া সে একেবারে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরে প্রথম সন্ধ্যাতেই একটা অনুজ্জ্বল দীপ জ্বালাইয়া মেজের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া নীরদকুমার সম্মুখে কাঠের একটা ছোট চৌকির উপর খেরো বাঁধা এক পুঁথি রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিতেছিল। যোগেন্দ্রর সশব্দ প্রবেশও সে জানিতে পারিল না।

যোগেন্দ্র একবার ঘরখানার চারিদিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে ঘরখানা প্রতিমাবর্জ্জিত চণ্ডীমণ্ডপের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। সে গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিল, "জিনিষপত্র-গুলো সব গেল কোথায়? আলোটার এমন দশাই বা কেন?"

সম্বোধিত ব্যক্তি একটু বিস্ময়ের সহিত মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি দশা?"

"চরম দশা আর কি! ল্যাম্পটা বুঝি চাকরেরা ভেঙ্গে ফেলেছে? বেটাদের জ্বালায় কিছু ত টিঁকতে পাবে না। তা যাহোক এলে কবে?"

নীরদ উত্তর দিল, "মিথ্যে চাকরদের গাল দিচ্চ কেন, তারা ল্যাম্পটা ভাঙ্গেনি, রাজার দেশের আমদানি, তাই তাকে খাতির করে তুলে রেখেছি। কি জানি কোন্‌দিন কি ত্রুটি পেয়ে চটে টটে ওঠে। তুমি এলে কবে?"

"আমি আজই এসেছি। বাঃ, আমার প্রশ্নটার উত্তরই দেওয়া হল না। কোথায় যাওয়া হয়েছিল বল ত?"

নীরদ পুনশ্চ আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পুঁথির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাতাখানা উল্টাইয়া কহিল, "রামনাদ।"

"কি জন্য?" নীরদ হাসিয়া বলিল, "পুলিসের মত জুলুম আরম্ভ করলে যে? দোহাই দারোগা সাহেব! তোমার সোনার 'দোত কলম' হক, তুমি বিলক্ষণ জানো সেখানে কাজের জন্য আমায় মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।"

যোগেন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "একটা খাট বা কেদারা কিছুই নেই, বসা যায় কোথা?"

নীরদকুমার তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "কেন ঐ ত বিছানা পাতা রয়েছে বস না।"

যোগেন্দ্র বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল, "ওটা একেবারে অনভ্যাস হয়ে পড়েছে, নিচু হওয়া পোষায় না। চল অন্য ঘরে যাওয়া যাক।"

নীরদকুমার জিদ করিয়া বলিল, "দুদিন কেরাণীগিরি করে চিরকালের অভ্যাস একেবারে জন্মের মত ফুরিয়ে গেল? ওগো মশায়! বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গলা চালই ভাল। মা ধরিত্রীর কোলে বসে দেখ দেখি কত আরাম পাও।"

"ইস্! এক মাসে একেবারে সত্যানন্দ হয়ে উঠেচ যে ? তুমি যা করবে তাতেই বাড়াবাড়ি।"

নীরদ না হাসিয়া গম্ভীরভাবে তামাসাটা গায় লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, তাই যেন হতে পারি।"

অগত্যা যোগেন্দ্রকে তাহার বিপুল দেহভার ভূমিতেই ন্যস্ত করিতে হইল। আজ তাহার অনেকগুলা ঝগ্‌ড়া জমা করা আছে, তাহা লইয়া তীক্ষ্ণ শ্লেষের শরবর্ষণে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আসিয়াছিল; তাই তাহার সহিত আর নূতন একটা তর্ককে জড়াইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল না। নহিলে তর্ক করিতে সে কম মজবুৎ নহে।

সে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "পিসেমশায়ের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছিল, তুমি আমায় কি অপ্রতিভটাই না করলে! তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।" ইচ্ছা করিয়াই যোগেন্দ্র কথাগুলা যথাসাধ্য কড়া করিয়া বলিল। কিন্তু শ্রোতা তাহাতে উত্তেজিত হইল না, ঈষৎ চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ব্যবহারে ? কেন ?"

"কেন ? সেদিন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কি রকম অভদ্রের মত হঠাৎ চলে এলে, ভুলে গেছ ? তারপর সহসা একেবারে নিরুদ্দেশ! যেন কোন দাগী আসামী পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে ফিরচো এমনি ধরণটা। তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয়, অথচ তাঁর সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত নয়, এর মানে কি ?"

নীরদকুমার কোন উত্তর প্রদান করিল না। মুখটা একটু নীচু করিয়া নীরবে পুঁথির খোলা পাতাখানা দেখিতে লাগিল। দীপ ছায়ায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া

যোগেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "তাঁর কাছে আমি তোমার কত সুখ্যাতিই করে রেখেছিলাম, আর তুমি কি অদ্ভুত ভাবেই প্রকাশ হলে!"

ধিক্কারের সহিত হতাশার সুরটুকু অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিল। এবার নীরদ মাথা তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "আমি ত তোমার কাছে সার্টিফিকেট চাইনি, বাজে খরচটা কেনই বা করতে গিয়েছিলে? যাকে নিজেই ভাল করে চেননি, অপরকে তার সম্বন্ধে কি বোঝাতে চাও?"

যোগেন্দ্র এ প্রতিবাদে হঠিল না। তবে তাহার উত্তেজনায় অবসাদ আসিয়া গিয়াছিল, মনের দুঃখ আর চাপিতে পারিতেছিল না। সবিষাদে বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, আমার কি প্ল্যানটাই তুমি মাটি করলে! আহা ভবিষ্যতের কি ছবিখানাই বসে বসে এঁকে ছিলুম—"

নীরদকুমার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "Trust no future, however pleasant."

সে হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়, তাহা বুঝিতে স্থূলবুদ্ধি যোগেন্দ্রেরও বেশি বিলম্ব হইল না, সে কোন এক অজ্ঞাত ব্যথায় বন্ধুকে ব্যথিত বুঝিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

নীরদ প্রফুল্লতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সে স্ত্রী পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বলিল, "তবেই তোমার চাকরীটি গেছে, কদিন তুমি তিষ্ঠবে?"

"ঈস্ তা যেন পারিনে?"

"সে আমার জানা আছে!"

যোগেন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, "ও পুঁথিখানা কিসের হে? মাণিকপীরের গান, না মনসা পুরাণ?"

নীরদকুমার অনুজ্জ্বল প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া পুঁথিখানা তুলিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল, তারপর সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "বেদান্ত দর্শন।"

"সর্ব্বনাশ! তবেই আমায় সেরেছ!"

নীরদ ঈষৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সর্ব্বনাশের সঙ্গে যোগ কি দেখলে?"

"খুব কাছাকাছি! কেন ভাই তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলুম যে এমনি করেই তাড়ালে?"

"তাড়া যদি ইচ্ছা করে খাও সেজন্যে আমি দায়ী নই। রজ্জুতে সর্পভ্রম করে অতখানি আঁতকে উঠ না। রসগোল্লাটাকে খোরাক করে না তুলে দুটি দুটি ভাত যদি পাতে নাও, তাহলে মুখটাও থাকে ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষেও সুবিধে হয়! রসালাপটা না হয় একটু কমই পড়ল? ও কিহে আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমায় কোন রকম ভয়ানক দেখাচ্চে নাকি?"

উথলিত বিস্ময় দমন না করিয়া স্তম্ভিত যোগেন্দ্র সবিষাদে বলিয়া উঠিল, "এ কি শ্রী হয়ে গেছে! চুলগুলোরই বা এমন দশা কেন, জটা বানাবে নাকি?"

নীরদ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, কহিল, "না সে রকম মৎলব এখনও ত কই হয়নি। মিলিটারী ফ্যাসানে চুল না ছেঁটে চিরকেলে প্রথায়—"

যোগেন্দ্রের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। সে বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "গোল্লায় যাক তোমার প্রথা! এ আবার তোমার কি নূতন ঢং? তোমার কি আবার সেই সত্যযুগ

আনবার চেষ্টা, নাকি? হঠাৎ এত বড় দার্শনিক সংস্কারক সব এক সঙ্গে কি করে হলে?"

"পারি না পারি ভাল কাজে চেষ্টা করা ত উচিত"—ইহা বলিয়া "প্রারম্ভতনে খলুবিঘ্নভয়েন নীচা"—তর্কটাকে পাকাইয়া না তুলিয়া নীরদ হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চল একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক, এ ঘরটার হাওয়া আজ তোমার ঠিক বরদাস্ত হচ্চে না।"

যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিছানাপত্র সব গেল কোথা?"

ভূমে একটা গালিচা পাড়া ছিল, তাহা দেখাইয়া নীরদ কহিল, "ঐ যে!"

"ঐতে শোও?"

নীরদ মৃদু হাস্যের সহিত একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

অনেক রাত্রে যোগেন্দ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিদায়-অভিবাদন জানাইতে গেলে, নীরদ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "আঃ, ও সব কায়দাগুলো ছাড়ো।"

"সে কিহে, ওযে তোমারি আদর্শ!"

"আবার আমিই প্রত্যাহার করছি।"

যোগেন্দ্র যে বাড়ী হইতে আহার করিয়া আইসে নাই তাহা সে এখানের সমস্ত উলোট-পালোটের মধ্যে পড়িয়া একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, নীরদও পূর্ব্বের মত নিজে হইতেই নিমন্ত্রন করিল না, বরং সে বিদায় চাহিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "রাত হয়ে গেছে, এসো তবে।"

রাত ত পূর্ব্বেও কতদিন হইত! যোগেন্দ্র বাড়ীর টানে ছুটিতে

বলয় লাগাইলা, গলায়, হাতে মাদুলী, কবচ, বাঘের নখ, হরিদ্বারের নুড়ি পাথর বাঁধিয়াই শুধু ভুবনমোহিনী ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, ধাত্রীর নিকট হইতে সেই যে সাত কড়া কড়ি মূল্য স্বরূপ দিয়া তাহাকে তাহার জন্মমুহূর্ত্তে কিনিয়া লইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শেষ দিন অবধি তাহাকে এক মুহূর্ত্ত কাছছাড়া করেন নাই। সূতিকাগার হইতে নিজের দৈহিক কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া দিনরাত ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে লইয়া নিদ্রাহীন রাত্রি, ও বিশ্রামহীন দিন কাটাইয়া স্পন্দিত বক্ষে কালী দুর্গাকে ডাকিতে ডাকিতে এবং হাঁচিতে কাশিতে সিন্নী হরির লুট মানিতে মানিতে যখন ভয় ও ভাবনায় "বিশেষ" কালটা মাত্র একটুখানি কাটিয়া আসিয়াছে, এমনই সময় ঠিক তাঁহার সকল ভাবনার সমাপ্তি হইয়া গেল।

প্রথমটা মাতৃহীন পুত্র লইয়া শ্যামাকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। পাতাঢাকা ফুলটির মত যে এতদিন একমাত্র মায়ের স্নেহের আঁচলখানির তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছিল, হঠাৎ এক রাত্রে ঝড় আসিয়া তাহাকে কঠিন মাটির উপর শোয়াইয়া দিয়া গেল। শ্যামাকান্ত বিষয়-কার্য্য ভুলিয়া দুই হাতে ধূলা ঝাড়িয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সেখানে সে নিশ্চিন্ত নির্ভর পাইল না, ক্ষুণ্ণ বিষাদে ভূমির পানেই চাহিয়া রহিল। একে জমিদারের একমাত্র পুত্র, তাহাতে মাতৃহীন,—মাসী-পিসিদের আদরে কোন ত্রুটি ছিল না। শ্যামাকান্তও কিছুদিন অত্যধিক আদর দিয়া তাহার চিত্ত হইতে মাতৃস্নেহের অভাব-বেদনা মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক বিনোদ কাহারও নিকট হইতে সেই অপহৃত রত্নের সন্ধান খুঁজিয়া পাইল না। অভিমানী শিশু নীরব অভিমানে

চাহিলে তখন সে ত তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া বলিত, "ওগো ভয় নেই, একটু দেরি হলে পদপল্লবে মাপ পাবে এখন।"

আজ বন্ধুত্বের গর্ব্বে আহত হইয়া যোগেন্দ্র তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "বেশ, বন্ধুত্বের চেয়েও তোমার পুঁথি বড় হল? বাস্তবের চেয়ে কঠোর কল্পনারই তোমার কাছে আদর বেশি! তবে তাই নিয়েই থাকো।"

বাড়ী গিয়া খাবার চাহিতেই পাচক ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিতভাবে জানাইল, পূর্ব্বে ম্যানেজার সাহেবের বাসায় গিয়া কখনও না খাইয়া ফিরেন নাই বলিয়া আজও সে রাঁধে নাই।

যোগেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল ও তারপর খুব তাগিদ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র লুচি ভাজাইয়া লইয়া আহারে বসিল। পৃথিবীর মধ্যে এই প্রধান ভোগ্যটাকে সে মনের কোন লাভ লোকসানের অংশভাগী করিতে চাহে না, সেটা নিয়মমত পাওয়া চাই-ই।

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর পরিয়া শয়ন গৃহেরই একটা পাশে কম্বলের আসনে বসিয়া নীরদকুমার আহ্নিক সারিয়া সটীক শঙ্করভাষ্য লইয়া বসিয়া একটা জটিল সূত্রের মীমাংসা খুঁজিয়া হতাশ্বাস হইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় ভৃত্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে যোগেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কিহে যা বলেছি তাই! এরি মধ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ!"

নীরদ জটিল সমস্যা অমীমাংসিতই পরিত্যাগ করিয়া পুঁথি রাখিয়া বলিল, "চটোনা যোগেন, সবারি একটা অন্তঃপুর বলে জিনিষ

আছে ত? মনে কর আমারও এটা তাই। এস ও ঘরে যাই, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"কেন, এ ঘরে কি অহিন্দুদের স্থান নাই নাকি? ঘরটা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে?"

নীরদ অপ্রতিভ হইল না বরং হাসিয়া উত্তর দিল, "মিথ্যে কি? তোমার পায় জুতো রয়েছে যে। তা ছাড়া তোমার ত এখানে বস্‌বারও সুবিধা হবে না। যুবরাজকে ত উচ্চাসন দিতে হবে।"

দুজনে নীরদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে সোফা ও কৌচ কেদারা কয়খানা আর নাই তাহার পরিবর্ত্তে সতরঞ্চ ও ছাপওয়ালা জাজিম পাতা তক্তাপোষ বিরাজ করিতেছে। লিখিবার ছোট টেবিলটা একধারে দাঁড় করানো রহিয়াছে, তাহার উপর পিত্তলের ফুলদানীটাতে কতদিনকার ফুলের গুচ্ছটি শুখাইয়া গিয়াছে, বদলানো হয় নাই। টেবিল হারমনিয়মটার কোন রকম সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। যোগেন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। তাহার বন্ধু সে মৌন বিস্ময় বুঝিয়াছিল, রুদ্ধ জানালাটা খুলিতে খুলিতে তাই আপনিই বলিল, "সেগুলো নিলেম করে দিয়েছি।"

"কারণ? সে গুলোত কই ভাঙ্গেনি?"

"কারণ সেগুলা আমার পক্ষে অনাবশ্যক।"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কিসে অনাবশ্যক? সেগুলো অনাবশ্যক আর যত আবশ্যক হল তোমার এই জঘন্য তক্তাপোষখানা? আশ্চর্য্য করেছ তুমি।"

"না, এও খুব আবশ্যক নয়, তবে কি জান, এরা হল

পোষ্যের সামিল, তাঁরা হচ্চেন নিমন্ত্রিত। তাঁদের খাতির করতে করতে গরীবের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, এরা এক পাশে পড়ে থাকে মাত্র, মেরামতের খরচা লাগায় না। আরও কি জান, যে ছিল, সেই থাক, নূতনকে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের মত ভাণ্ডার লুটিয়ে দিবার জন্য ডেকে এনে কি হবে? যোগেন্দ্রর তর্ক অনাবশ্যক হলেও শুনতে পারি, ধুন্ধুরাম আপ্পের তর্ক তা বলে সহ্য হবে না।"

যোগেন্দ্র অনাবশ্যক তর্ক তুলিল না। নীরদ তাহাকে নিজের বক্তব্য বলিল—রামনাদে একদিন সহসা একজন সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। বরাবরই তাহার সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি একটু মনের টান আছে, কিন্তু ইদানীং বিদেশী চালে চলিতে চলিতে সেটা ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছিল। তাই পরমানন্দ স্বামীর সহিত প্রথম যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়, তাহাতে সে হিন্দু শাস্ত্রকে বিশেষ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলেও প্রচারকগণের উপর খুব তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করে। সন্ন্যাসী স্মিতগম্ভীর মুখে অনুত্তেজিত কণ্ঠে এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যে, এক মুহূর্ত্তে অবিশ্বাসীর মস্তক নত হইয়া থাকিয়া পরক্ষণেই তাঁহার রক্তপদ্মের মত পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নীরদ তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। সে তখন বিশ্বসংসারের সমস্ত সহজ পথ ছাড়িয়া এমন কোন একটা রাস্তা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, যাহা ধরিয়া গেলে এখানকার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত তাহার কাছে না পৌঁছিতে পারে। অতীত বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে পৃথক করিয়া ফেলিবার জন্য সে তখন তাহাদের কাণ্ড ও মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া তুলিতে একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিল, সহসা এই সাক্ষাৎ! তাই তাহার নিকট এই ঘটনা

ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া বোধ হইল। সে নিজেকে তাঁহার নিকট এক দিনেই সমর্পণ করিয়া দিল। সে পথহারা, পথ চাহে, তিনি—

যোগেন্দ্র এই পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল। "তাই তিনি দয়া করে এই সহজ পথখানি ধরিয়ে দিলেন! বড্ড দয়া, বেটা ভণ্ড।"

নীরদ গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল "চুপ! কাকে কি বল্‌তে আছে তা জানো? তাঁর সমালোচনা তুমি করো না।"

তেমন তীব্র দৃষ্টি যোগেন্দ্র সে চোখে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সে লজ্জিত ও ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

নীরদ বলিতে লাগিল,"তিনি একজন কর্ম্মযোগী, হিন্দুধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের মুখ্য কার্য্য। স্বদেশানুরাগে সেই উন্নত হৃদয় পরিপূর্ণ।" কয় দিনমাত্র একত্রে থাকিয়া নীরদ নিজের অভীপ্সিত পথ চিনিয়া লইয়াছে। তিনি তাঁহাকে তাহার সাধ্যানুরূপ দেশ-হিতকর একটি সামান্য কার্য্য লইতে বলিয়াছেন এবং নিজেও সে তাঁহার একজন পণ্ডিত শিষ্যের নিকট কিছু কিছু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, এখন তাহাকে এই পথেই চলিতে হইবে। তারপর যথাসময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সে ভার এখন হইতে তাঁহার উপর অর্পিত রহিল। এখন সে আত্মচিন্তা ভুলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করুক, জীবনে উদ্দেশ্য-বোধ হউক। তিনি আরও বলিয়াছেন, মানুষের জীবন উদ্দেশ্যহীন হইতে পারে না, কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম ফুরাইবার নহে। যেখানে সহজ চক্ষে নিজের জন্য কর্ম্ম নাই, সেখানে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যে কর্ম্ম হারাইয়া সে নিজেকে

কর্ম্মহীন ভাবিয়াছিস, তদপেক্ষা সহস্র গুণ উচ্চতর কর্ম্ম-তাহারই জন্য সৃজিত হইয়া রহিয়াছে।”

বলিতে বলিতে কল্পনার দ্বার খুলিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের যে শান্ত সুপবিত্র অথচ উদ্যমপূর্ণ চিত্রখানা বক্তার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহার কণ্ঠকে উৎসাহ কম্পিত করিয়া নেত্রে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিল।

নীরদ আবার বলিতে লাগিল, “যোগেন! বন্ধু বলিতে এখন আমার একমাত্র তুমিই। তুমি আমায় এ পথে চলিতে একটু সাহায্য করিও, প্রথমে যদি ঠিক মনের মত নাও বোধ হয় আমার প্রতি ভালবাসায় তাহাও সহ্য করো। সিংহদ্বারের লৌহ কবাট দেখিয়া হতাশ্বাসে পিছন ফিরিও না।”

যোগেন্দ্র এই নূতন ভাবোন্মাদনার কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিস্ময়ের সহিত কে জানে কেমন যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে মাথা হেলাইয়া সব স্বীকার করিয়া লইল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিয়া হৃদয়ের ভিতরকার অব্যক্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল না। যোগেন্দ্রও বুঝিয়াছিল এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহাকে ভাষাপ্রদান করিতে গেলে তাহাদের অবমাননা করিতে যাওয়া হয় মাত্র।

তারপর সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নীরদকুমারই প্রথমে কথা কহিল, এবার সে প্রফুল্ল মুখে আগ্রহের সহিত দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কথাপ্রসঙ্গে শান্তির বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র বলিল, “শান্তির স্বামী খুব সুন্দর হয়েছে, আর বিয়েতে যতদূর সমারোহ হতে পারে তা হয়েছিল, দুনিয়ার যত বাজে খরচ। বাজি

বাজনা আলো, টাকাগুলো একমুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ। তুমি এত সংস্কার করছ ঐ জিনিষটার সংস্কার করতে পার, তবে বলি বাহাদুর।"

বলিয়া যোগেন্দ্র স্তব্ধ নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। নীরদ হাসিল না সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "যাহোক হেম ছেলে মন্দ নয়, চালটা একটু বড় লোকের মত অহঙ্কেরে, তা শান্তি অসুখী হবে না! বিশেষ শ্বশুরের যা ভালবাসা সে পেয়েছে! আহা শ্যামাকন্ত বেচারী বড় কষ্ট পেয়ে এতদিনে একটু সুখী হল তবু। লক্ষ্মীছাড়া বিনোদটা কি আহাম্মুকিই করলে! কার আর ক্ষতি হলো? নিজেই এমন রাজঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হলেন মাত্র। বাপ পর্য্যন্ত তার নাম আর মুখে আনে না, অন্যের কথা কি! তা নীরদ! এ সব দেখে অদৃষ্ট মানতে হয় ভাই, হেমের কপালটা কিন্তু খুব।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে যোগেন্দ্র চাহিয়া দেখিল নীরদকুমার দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দারুণ যন্ত্রনাকে যেন সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে তাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল, "নীরদ," মুখ তুলিলে তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর সযত্নে রাখিয়া ছোট ভাইটির মত দুই হাতে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে সে কহিল, "শরীরটাকে একেবারেই মাটি করে ফেলেছ! এ কি ছেলেমানুষি ছি!"

নীরদ ক্লান্তভাবে চোখ মুদিয়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আত্মবিস্মৃতভাবে বলিল, "আঃ, যোগেন!"

"বল না নীরদ, তোমার মনে একটা কি হয়েছে আমায় কেন লুকুচ্ছ ভাই, বল্‌বে না?"

নীরদকুমার হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে বই কি, কিন্তু সেটা আমি আপাততঃ প্রকাশ করচিনে। আসল কথাটা হচ্চে ভাই তোমাকেও এবার থেকে একটু সংযত হতে হচ্চে।"

"ওঃ রে বাপ্ রে, তবেই আমি গেছি! আচ্ছা আগে চা'টা খেয়ে নিয়ে মাথাটা একটু সাফ্ করে ফেলা যাক, তার পর প্রিচার মশায়, তোমার বক্তৃতা শোনা যাবে, কি বল?"

নীরদ মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি, চা পাচ্চো না।"

যোগেন্দ্র ইহা শুনিয়া চোখ এমনি বিস্তার করিয়া চাহিল যে যেন এমন অদ্ভুত কথা জীবনে সে এই প্রথম শুনিল।

"বল কিহে? তুমি যে আমায় একেবারে অবাক করে দিলে, খেলে কি সাধুত্ব ভাল জমবে না নাকি?"

"তা কেন?" "তবে? ও জিনিষটা ত বিদেশী নয়।"
"না, এই অভ্যাসটা অনাবশ্যক বিদেশী।"

যোগেন এবার আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, চটিয়া বলিল, "ওগো, অত বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না। অতটা সহ্যও হবে না, লোকেও ভণ্ড বল্‌বে। স্বাস্থ্যহানি করেও চিরকেলে অভ্যাসগুলো শুধু গোঁড়ামির জন্য ত্যাগ করবে?"

নীরদ সংযতভাবে উত্তর দিল, "না, বিদেশী বলে কোন ভাল অভ্যাস ছাড়তে আমি কোনদিন বল্‌বো না; বরং কিছু কিছু ধরতে বল্‌তে চাই। এটা ভাল অভ্যাস নয়। অজীর্ণ রোগী বাঙ্গালীর পক্ষে চা-টা ঠিক খাটে না। ওটা ঔষধের মত ব্যবহারের জন্য রাখ্‌লে বরং তার চেয়ে উপকারে লাগে।

অনেকগুলো জিনিষ আছে যা আমরা অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের বশেই শুধু করে যাই, তার ফলাফলটা ভেবেও দেখিনে! শীতপ্রধান দেশের লোকের সঙ্গে একই ভাবে শরীর পালন করতে গেলে তাকে ঠিক 'পালন' করা বলা যায় না।"

যুক্তিটা যদিও যোগেন্দ্রর ঠিক মনে লাগিল না, তথাপি সে অভ্যাসানুযায়ী বন্ধুর গম্ভীর মতবাদের বিরুদ্ধে আর তর্ক তুলিল না। ভাল হউক মন্দ হউক, বন্ধুর মতগুলাকে নিজের করিয়া লইতেই সে উৎসুক, তাহা লইয়া তর্ক উঠিলেও হার মানিতে সে কোন দিনই কুণ্ঠিত নহে।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে কদলীপত্রে নিরামিষ ভোজন মুখরোচক না হইলেও নিগূঢ় অভিমানে এমন আগ্রহের সহিত সে সমুদয় চাটিয়া খাইল, যে নীরদকে বিপন্নভাবে বলিতে হইল, "তাইত যোগেনের যে ভাত কম পড়লো, আর যে নেই বল্‌ছে, তাইত করা যায় কি ?"

২৫

সেদিন যখন খুব ঘটা করিয়া মেঘ আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল, তখন শান্তি তাহার শয়ন-গৃহে দক্ষিণধারের জানালার নিকট লৌহ গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃষ্টির সহিত অল্প ঝড়ের বাতাসও বিদ্যমান থাকাতে গাছগুলার উচ্চ মস্তক বাতাসে নুইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রথমে মুক্তবিন্দুর মত বৃষ্টিবিন্দু, তারপর জলের ঝাট্ জানালার মধ্য দিয়া শান্তির গায় আসিয়া পড়িতে লাগিল।

দিন কয়টা বড়ই ক্লান্তিতে কাটিয়াছে। সেদিনকার সেই কর্ণদাহকারী নিষ্ঠুর মন্তব্যের পর তাহার আহত হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত দিতে দিতে সিদ্ধেশ্বরী এবং তাঁহার মন রাখিবার খাতিরে বাটীর প্রবীণা অ-প্রবীণার দলও তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সেদিন সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "ছোট বৌ তুমি চাবিটাবিগুলো বরং আমাকে দাও, তুমি ছেলেমানুষ, ওসব ত পেরে ওঠো না।"

মাসীমা তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন, 'হ্যাঁ বাছা, তাই দাও, যে ঘরকন্নার শ্রী করে রেখেছ।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "বল্লেই হয় যে পারব না, এমন করে আক্রোশ দেখান কেন? তোমার কি? অপচো হলে ত তোমারা যাবে না! পরের জিনিষ বইত নয়। আমার কিছু দরকার নেই, তবে নেহাৎ মেয়েটা কিছু বোঝে না, তাই বলি মরুকগে, যতক্ষণ আছি, মর্‌তে মর্‌তেও দেখি।"

এ ঘর পরের ঘর! এ সংসারে সে শুধু একজন গলগ্রহ! আর কেহ নয়? এই অল্প সময়ের মধ্যে সে কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিল! কয়টা দিনমাত্র পূর্ব্বেই না সে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সবারই মা ছিল, আর আজ এ কি অধঃপতন! ঈশ্বর জানেন, শুধু তিনিই জানেন, এ ঘর তাহার কত আপনার, কত যত্নের। অঞ্চলপ্রান্ত হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিয়া একটু দ্রুতপদে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় শুনিল, সিদ্ধেশ্বরী বলিতেছেন, "দেখলে বেয়ান! চৌধুরীমশায়ের যেমন কীর্ত্তি! কোথা থেকে একটা নয়চ্যাংড়া মেয়ে এনে তাকে একেবারে মাথায় তুল্লেন, দুদিন তর সইল না,

এখন হিংসের আগুনে আমার ছিষ্টিধরের ছিষ্টিধরকে বাঁচতে দিলে হয়,' রাগ দেখে আর বাঁচিনি, বলে, কেউটে সাপের চক্কোর দেখে সকলে ডরায়। আর হেলে সাপের ফোঁস ফোঁসানি অঙ্গ জ্বলে যায়।" সদুঃখে নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, "আমার পোড়া বরাতে যেমন সুখ নেই! নৈলে জামাইটার এমন মতিচ্ছন্নইবা হবে কেন? তা বেই'কে বলতে হবে, কিন্তু বেন এর একটা বিহিত করা চাইত।"

শান্তি পশ্চাতের এই সকল শরক্ষেপন সহ্য করিয়া নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। সম্মানের উচ্চতর সিংহাসন হইতে নামাইয়া তাহাকে যেন অপমানের মাঝখানে একেবারে দাঁড় করান হইয়াছে। চারিদিক হইতে যেন সপ্তরথীতে তাহাকে সশস্ত্রে ঘেরিয়া ফেলিতে উদ্যত। কেন, সে কি করিয়াছে?

সে ত শিবানীকে তাহার অধিকৃত আসন ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক নহে। এবং যতখানি সম্ভব, তাহা দিয়াছেও। তবে সবটা যদি শিবানী না লয়, কেমন করিয়া সে তাহা লইতে তাহাকে বাধ্য করে? তবে কেন তাহার প্রতি সকলে মিলিয়া এমন ভাবে অবিচার করিতেছে?

ছি, ছি, এই সংসার! মুহূর্ত্তের মধ্যেই সংসার তাহার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে নির্ম্মমভাবে পায় ঠেলিয়া একেবারে অলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া দিতে চাহে? যে এতখানি জুড়িয়াছিল, বালুকারাশি-মধ্যস্থ গহ্বরের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার আর এতটুকু স্থান নাই!

দুই কম্পিত হস্তের মধ্যে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা সে ঢাকা দিল।

শুধু অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে বা অনুযোগ করিতে পারিল না। স্নানের সময় ভৃত্যের কর্কশ হস্ত গায় পড়িলে গা জ্বলিয়া উঠে, কোমল স্নেহমাখা হাতখানি মনে পড়িলে চোখে জল আসে, ভাতের থালা সম্মুখে দেখিলেই দুঃখের আবেগে ঠোঁট বুজিয়া আসে, অন্নের গ্রাস কণ্ঠের মধ্য দিয়া নামিতে চাহে না, রাত্রে খালি বিছানার মধ্যে ঢুকিয়া কিছুতেই আর চোখের জল বাধা মানিতে চাহে না, কিন্তু এক সুগভীর অভিমানে, নিগূঢ় মর্ম্মব্যথায় বীরের মত সে জোর করিয়া নিজের শিশুচিত্তকে জয় করিতে চাহিত। অভিমানের অশ্রু প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া ঔদাসীন্যের হাসিতে সে আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিত। সে কি চাহিত, নিজেই তাহা বুঝিত না, যাহা কিছু পাইত ক্ষোভে অভিমানে গুমরিয়া মরিত! যাহা তাহার প্রাপ্য, তাহা তাহাকে না দিয়া সকলে মিলিয়া একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়া যেন তাহাকে একবারে বঞ্চিত করিবে! আসল কথাটা এই যে, পিতাকে সে মায়ের মত করিয়া একেবারে নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিল, পিতৃস্নেহের মধ্য হইতে সে তাহার সবটুকু তৃষ্ণা মিটাইয়া লইতে চাহিতেছিল! মাতাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল, তেমনই করিয়া পিতাকে সে একেবারে নিজের হৃদয়ের মাঝখানে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে কথাটা তো খুলিয়া বলা যায় না, কাজেই মনের মধ্যে দুর্জ্জয় রোষ ও অভিমানের আগুন জ্বালাইয়া লইয়া সে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম শ্যামাকান্ত পুত্রকে নিজের চোখে রাখিয়া সাধ্যমত নিজেই তাহার দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু পুরুষমানুষ, বিষয়ী

শ্যামাকান্তও আজকাল আহতচিত্তে তাঁহার বসিবার ঘরের একটি কোনে ইজি চেয়ারাটার উপর এমনই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আছেন, তাই তিনিও তাহার সংবাদ লইতে পারেন না। শান্তি নিয়মিত সেবাপরায়ণ হস্তে নীরবে তাঁহার কাজগুলি করিয়া দিয়া আসে, তিনি চিন্তাযুক্ত ম্লানগম্ভীর মুখে তাহা গ্রহণ করিয়া যান। দুজনেই আপন আপন ভাবনায় মুহ্যমান, অন্যের কথা কাহারও মনে আসে না। একবার শ্যামাকান্ত শান্তিকে কাছে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলেন, "তাইত মা, একটা মকর্দ্দমার কথা ভাবছিলুম।" শান্তি স্পষ্টই দেখিতে পায়, কথাটা অযথার্থতায় বৃদ্ধকে একটু বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তাহার দুই চোখে জল উথলিয়া উঠিতে চায়। সেই কি সবার ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

অনু দাদাবাবুর কাছে তাঁহার চস্‌মার খোলখানা, পায়ের জুতাটা লইয়া কখনও বা তাঁহার কাগজ পত্র দোয়াতকলম ফেলিয়া ছড়াইয়া ঘরখানাকে তোলপাড় করিয়া যেটুকু পারে দাদামহাশয়ের অশান্ত চিত্তে আনন্দ দান করিতেছিল। সেও বড় আর কাকীমার কাছে আসে না। সেদিন যে সিদ্ধেশ্বরী জ্ঞাতিশত্রুদের হাতে ছেলের খাওয়ানর ভার দিতে নাই বলিয়া হাত হইতে দুধের গ্লাসটা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তারপর হইতে শিবানীর অনেক শপথ সত্বেও সে আর তাহাকে কাহারও অসাক্ষাতে কাছে রাখিতে সাহস করে না। আজ তাহাকে চাহিয়া প্রাণটা যখন হা-হা করিয়া উঠিতেছিল, তখন অনেক চেষ্টায় সে লোভটা সম্বরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টিপতনের একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের পানে চাহিয়া অন্য একটা জানালার ধারে বহুক্ষণ হইতে হেমেন্দ্রও শান্তির

মত দাঁড়াইয়াছিল। কয়দিন তাহাকে ভাল মানুষ শাস্তির অপমানের অংশ গ্রহণ করিতে না হইলেও সকলের নিকট হইতেই স্পষ্ট না হউক, কথার ভঙ্গীতে অল্প বিস্তর তাচ্ছিল্য সে বুঝিতে পারিতেছিল। হেমেন্দ্রর আচরণে কেহই ত তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, এখন তাহারা সুযোগ ছাড়িবে কেন? হেমেন্দ্রও যে সে সমস্ত অপমানের শোধ তাহার পালক পিতার উপর তুলিতে ছাড়ে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আজ আর শুধু দূরে দাঁড়াইয়া শরক্ষেপন চলিল না। সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁহার বৈবাহিক দলের একটা কঠোর মন্তব্য তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তীব্র দাহ জাগরিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ সে শ্যামাকান্তকে গিয়া বলিল, "ওই মাগীদুটোকে তাড়াবেন কি না?"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি?"

"কোথাকার ছোটলোক মেয়েমানুষদুটোকে বাড়ীতে এনেছেন। ওরা যদি থাকে, তবে আমি থাকব না, তা বলে দিচ্ছ।"

"হেম, ওযে বিনুর বউ আমার পুত্রবধূ, তোমরা দুই ভাই যদি একত্র হতে, সে আরও সুখের হত, না?"

হেমেন্দ্র চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল, "ক্ষেপেছেন। ও বৃন্দাবনের বদমাইস গুণ্ডার দলের মাগি, সব ওর জাল! ওকে আত্মীয় বলে স্বীকার করলেও নিজেকে অপমান করা হয়। কোন কথা আমি শুনতে চাইনে, আপনি ওদের দুটোকে বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

শ্যামাকান্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "তারা!"

হেমেন্দ্র আবার সক্রোধে প্রশ্ন করিল, "বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

"অসঙ্গত কথা বলো না, হেম।"

"বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

"কেমন করে তা করবো ?"

"তবে ওদের নিয়েই থাকুন, কিন্তু আমার আপনি যে সর্ব্বনাশ করেছেন তা আমি সইব না, দেখি আইন আমায় ঠকায় কি না।"

শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন, "অমন কথা বলিসনি হেম, তোকে আমি ঠকাবো, আমার কে আছে ?"

কঠোর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হেমেন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "আমি সব বুঝেছি।"

শান্তির ঘরে আসিয়া সে দেখিল, শান্তি একা আছে। মনটা একটু প্রসন্ন হইল। শান্তি হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিল। জোর করিয়া প্রফুল্লতা দেখাইয়া কিছু একটা বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "গবর্মেণ্ট জ্যেঠামশায়কে নাকি রাজা উপাধি দিতে চেয়েছে।"

"হুঁ ! কিন্তু রাজপুরীটা আপাততঃ ত্যাগ করে যেতে হচ্চে যে ! হাঁ করে চেয়ে রইলে কি ? আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে ? তবে শোন, ওই পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একবাড়ীর বাতাস আমার গায় আমি লাগতে দেব না। আমরা আজই এখান থেকে যাব।"

শান্তি সজোরে জানালার একটা গরাদ চাপিয়া ধরিল, হেমেন্দ্র চলিয়া গেল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে যখন হেমেন্দ্র শান্তির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করলে, শান্তি ?"

তখন আকস্মিক মৌনভঙ্গে শান্তি চমকিয়া উঠিল। ম্লান মুখ

ফিরাইয়া সকরুণ নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "আমায় এখান থেকে যেতে বলো না, আমি এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারব না।"

"বাপের বাড়ি?"

একমুহূর্ত্ত পরে সে হতাশভাবে ঘাড় নাড়িল, "বাবা ত যেতে বলেন নি। জ্যেঠামশাই—"

"থাম, আমায় আর রাগিও না—এই অপমান সহ্য করে এখানে দাসী চাকরের মত পড়ে থাকতে হবে? তোমার লজ্জা করে না? একটা আত্মসম্মান বোঁধ নাই?"

"জ্যেঠামশাই ত আমাদের ভালবাসেন, দিদি ত কিছু বলেনি? তাও যদি হয়, সেও আমাদের সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা গুরুলোক—"

হেমেন্দ্র ভূমে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "রেখে দাও তোমার লজিক। তুমি না যাও, থাকো, আমি চল্লুম।—না, তোমাকেও যেতে হবে, তুমি আমার স্ত্রী, আমার আদেশ পালনে তুমি সম্পূর্ণ বাধ্য! আমার হুকুম, তোমায় এখান থেকে সন্ধ্যার সময় যেতেই হবে। প্রস্তুত হয়ে থেকো—"

"আজ, এখনি? আমায় একটু সময় দাও, জ্যেঠামশাইকে একবার—"

"জ্যেঠামশাই তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না, সে চেষ্টা করতে যেওনা, মিথ্যা তাতে অনর্থ বাড়াবে, এ জেনে রেখ! এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনা মিটে গেছে। না, আমি আর কিছু শুনতে চাই না—"

শান্তিকে কথা কহিবার অবকাশমাত্র না দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া

বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যা না হইলেও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘেরা বারান্দায় ইহারই মধ্যে ঘনায়মান হইয়া আসিয়াছিল। খোলা জানালার ঠিক বাহিরে ছাদের নলের মধ্য দিয়া একটা মোটা স্ফটিকধারার মত বৃষ্টির জল নামিতেছিল। নর্দ্দামার ভিতর দিয়া কলকল শব্দে সেই জল ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির আর শেষ নাই। হেমেন্দ্র সম্মুখেই এক অপরিচিতা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সে জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘরের সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সম্মুখবর্ত্তিনী সে সুযোগ দিল না, অসঙ্কুচিতভাবে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরস্বরে কহিল, "ঠাকুরপো, একটু দাঁড়াও, একটা কথা আছে।"

অপরিচিতা স্ত্রীলোকের এই সঙ্কোচহীন ব্যবহার হেমেন্দ্রকে ঈষৎ বিস্মিত করিল। এই রমণীর বিদ্যুৎতীক্ষ্ণ অভেদ্য অথচ অচঞ্চলদৃষ্টি তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিল। যদিও অনুমানে সে এই ঠাকুরপো-সম্বোধনকারিণীকে চিনিয়াছিল, তথাপি আকস্মিক একটা কৌতূহলপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "কে?"

রমণী নির্ভীক ভাবে তাহার কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল বিশাল নেত্র প্রশ্নকারীর মুখে স্থাপন করিয়া ধীর অথচ সুদৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আমি অমুর মা, তোমার বড় ভাজ! শুনলেম, তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা কর না, সত্য কি? তা যদি হয়, তবে তুমি যেওনা, বল, আমিই আমার সেই বনবাসে ফিরে যাই।"

হেমেন্দ্রর ললাট হইতে কর্ণমূল অবধি সমুদয় মুখখানা অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের মতন আরক্ত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আপনার এ

অভিনয় খুব চমৎকার হচ্চে, কিন্তু আমার কাছে এসব কেন? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ করেছেন, সেই ভাল।"

হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল না। সেই মুহূর্ত্তে ঘন মেঘের মধ্য দিয়া যেমন অশনিভরা বিদ্যুৎ করালিনীর লোলজিহ্বার ন্যায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল, শিবানীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখেও তাহার ছায়াপাত হইল। সে আজ অনেক ভাবিয়া আপনাকে অনেকখানি গড়িয়া লইয়া তবে হেমেন্দ্রর সম্মুখীন হইয়াছিল। সহসা একজন অজানা লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান শিবানীর পক্ষে যে কতখানি কঠিন ব্যাপার, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঠেকাইয়া রাখাও তাহার পক্ষে তেমনই সহজ।

সে দেখিল, এমন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলে আর চলে না, যে অভিনয় চলিতেছে, ইহার মধ্যে আসিয়া নিজের অংশ গ্রহণ না করিলে হয়ত শেষে ইহা করুণরসাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। নিঃসঙ্কোচে নিজের কর্ত্তব্যভার সে মাথায় তুলিয়া লইল। সে কেন পরের সুখে ব্যাঘাত দিতে আসে? কে, সে? সে একজন অপমানিতা অনাদৃতা পরিত্যক্তা স্ত্রী! কেন সে পরের অধিকৃত সিংহাসন জোর করিয়া দখল করিবে? কেন লোকে মনে করিতেছে, তাহাতেই সে একেবারে বর্ত্তাইয়া যাইবে? কিসের এ অধিকার? কে চায়, এ অধিকার? সে? সে ইহাকে ঘৃণা করে। কেন করে? এই ঐশ্বর্য্যের জ্বালা তাহার অপমানিত হৃদয়কে দ্বিগুণ নিপীড়িত করিতেছিল! সে দরিদ্রা, তাই না এত অবহেলা! সে কেন তাঁহার যোগ্যা হয় নাই? অথবা তিনি কেন দরিদ্র হইলেন না? যে সমস্ত বন্ধন তাহাদের দুই ভিন্নগামী হৃদয়কে

এক হইতে দেয় নাই, তাহাদের প্রতি তাহার একটা তীব্র বিদ্বেষ তাহার চিত্তকে অহর্নিশি খরধার ক্ষুরের মত কাটিয়া তুলিতেছিল, ইহাদের মধ্য হইতে তাহার সেই শান্তিকুটিরে পলায়ন করিতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু হায়! এ আবার কি নূতন মায়া, নব বন্ধন! শান্তিকে ছাড়িতেও যে আর মন চায় না।

হেমেন্দ্রর কথায় কিন্তু শিবানী রাগ করিল না। কোন কথাগুলা সত্য, এবং কোনগুলা রচনা করা, এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত সে পায় নাই! সেইজন্য এই অপবাদটাকে সে একেবারেই সবেগে অস্বীকার করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিল না। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পরে সহিষ্ণুতার সহিত অপমানকে স্নেহোপহারের মত নীরবে গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, "তুমি রাগ করোনা, ঠাকুরপো! ঠিক তোমায় হয়ত আমি আমার সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পার্ব্বোনা, কিন্তু যেটা আসল কথা সেইটেই বল্‌ছি। বাস্তবিকই আমি ত তোমার অংশীদার হতে পারিনে। আমি কে? তবে অমু! তা আগে সে মানুষই হোক, বেঁচেই থাক্। তার কথা এখন ছেড়ে দাও। যথার্থই আমি বল্‌ছি এখানকার একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই, এ সব শান্তির। তোমরা কিসের দুঃখে যেতে চাও? আমার জন্যে?" বলিয়া তীব্র বিষাদের উথলিত অশ্রু জোর করিয়া বক্ষে মথিত করিয়া সে দুঃখের হাসি হাসিল, "আমার জন্য যাবে কেন? বরং আমারই কিছু ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের সংসারের একপাশে যদি ফেলে রাখো, শান্তির জন্য বোধ হয়

এখন তাও আমি সহ্য করতে পারি। কে জানে, কেন আমি তাকে এত ভালবাসি।" আবেগের মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া সহসা শিবানী নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জানুভব করিল, কিন্তু প্রকাশের যে একটি বিমল আনন্দ তাহাও সে সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে পারিয়াছিল! সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনটা যেন কুয়াশার আবরণ কাটিয়া নির্ম্মল আকাশের মত লঘু হইয়া আসিল। নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া সে ঈষৎ গর্ব্বোৎফুল্ল মুখ ফিরাইয়া পরাজিতের পানে চাহিল। বিশ্বরহস্যের একটি দ্বার আজ যে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, ইহার মধ্য হইতে কি আলো, কি আনন্দ সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ লুকান নির্ঝর আজ কোন্ তপ্ত মরুবালুকাকে শীতল করিয়া দিল! কিন্তু শিবানীর সেই অবনত হৃদয় আজ তাহার কৃতকর্ম্মের পুরাতন অভিশাপদণ্ড ভোগ করিবার জন্যই এই অস্থানে নত হইয়াছিল। হেমেন্দ্র ক্রূর নিষ্ঠুর শ্লেষের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিল।

"শান্তির প্রতি আপনার অনেক দয়া, কিন্তু সে দয়াকে সে ঘৃণা করে। তার জন্য আর নিজেকে উৎকণ্ঠিত করবেন না, আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে সে এখনি সরে যাচ্চে—"

সহসা পিছন হইতে কেহ যষ্টির দ্বারা আঘাত করিলে, আহত যেমন আর্ত্ত বিস্ময়ে অস্ফুট গর্জ্জনে মুহূর্ত্ত পরে আঘাতকারীর পানে তীব্র রোষে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তেমন করিয়া আহতা শিবানী হেমেন্দ্রর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী তার অপমান করোনা।"

হেমেন্দ্রর মুখখানাও ক্রোধে পাংশু হইয়া গেল, তাহার উজ্জ্বল চোখ দিয়া যেন অগ্নিবর্ষণ হইল, উচ্চকণ্ঠে তীব্র হাসি হাসিয়া সে বলিল, "ঘরে এমন চমৎকার অভিনেত্রী থাকতে

থিয়েটার আনিয়েছিলুম কেন? এমন সুন্দর অভিনয় আমি আর কখনও দেখিনি! ক'দিন ত কপালকুণ্ডলা, তাজ্জব-ব্যাপারের অভিনয় দেখা গেল, আজ এটা কোন নাটকের অভিনয় হচ্চে, বৌঠাকরুণ?"

শিবানীর সমস্ত শরীরের রক্ত এ অপমানে রুদ্ধমুখ পাত্র মধ্যস্থ ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ রোষে টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে আর একটিমাত্র কথা না বলিয়া অকস্মাৎ দ্রুতপদে পাশের একটা খোলা দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হেমেন্দ্রও আর সেখানে দাঁড়াইল না, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। শিবানীকে যে দুই-চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়াও হেমেন্দ্রর মনটা কতক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। যাহার কথা মনে করিলেও অস্থি মাংস জ্বলিয়া উঠে, তিনিই কিনা পাদরী সাহেবের মত বক্তৃতা দিতে আসিলেন। রাগ ধরিলেও হাসি পায়! দেশে কি আর লোক ছিল না?

শিবানীর সেই পাণ্ডু মুখ ও আহত হৃদয়ের উদ্ধত রোষকটাক্ষ স্মরণ করিয়া সে মনে মনে একটু শান্তি অনুভব করিল। যথার্থই সে তবে শান্তিকে ভালবাসে। নহিলে শান্তি তাহাকে ঘৃণা করে শুনিয়া সে এমন শেলাহতের মত ছটফট করিয়া উঠিত না। হেমেন্দ্র নিজের প্রতি অত্যন্ত খুসী হইল। সে যে বুদ্ধি করিয়া ঠিক পথটি বাহির করিতে পারিয়াছে এবং এমন সব কথাগুলা যথাসময়ে আসিয়া তাহার ওষ্ঠাগ্রে যোগাইয়াছিল তাহাতে নিজের আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া সে বিস্মিত হইল। আবার যখন সে সত্য সত্যই তাহাদের নিকট হইতে শান্তিকে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, তখনকার জন্য তাহাদের আঘাত কল্পনা করিয়া সে

নিষ্ঠুর হাসি হাসিল। শ্যামাকান্ত চৌধুরী একবার দেখুন, তিনিই শুধু গরীবের ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না, সেও তাঁহাকে ইহার শাস্তি দিতে জানে। সে এটুকু বেশ বুঝিত যে, ছুঁচটি মানুষের কোনজায়গায় বিঁধাইলে তাহার মর্ম্ম ভেদ করে। যে শান্তির জন্য তিনি তাহাকে পোষ্যপুত্র লইয়া দুরাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন, সেই শান্তিকেই সে তাঁহার নিকট হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া বুঝাইবে, যে শান্তিকে পাইতে হইলে শুদ্ধ তাহাকে একটু আদর আপ্যায়ন দেখাইয়া বশ করিলেই চলে না, তাহাকেও খুসী রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে সত্য সত্যই এত অবজ্ঞেয় নয় যে, তাহাকে ডিঙাইয়া গেলেও চলিতে পারা যাইবে! আইনমতে সেই এখন শান্তির প্রভু, সে তাহাকে তাঁহার হইতে দিবে না। ইহাতে কে কি বাধা দিতে পারে?

শিবানী যখন সেই অনুজ্জ্বল ছায়ালোকের মধ্যে সহসা বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অত্যন্ত অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলা নানা আকার ধারণ করিয়া আকাশময় ছুটাছুটি করিয়া আবার একটা ভারি রকম বৃষ্টি আনিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই উপলক্ষ্যে আকাশের প্রহরীদল তুরি বাজাইয়া আলো জ্বালাইয়া সোরগোল করিয়া বেড়াইতেছে এবং অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে ও উদ্যানের নালায় ভেকদলের সম্মিলিত ঐক্যতানে বৃষ্টির ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া যাইতেছে। প্রথম কাহাকেও শিবানী সে ঘরে দেখিতে পাইল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকিত হইয়া খাটের নিকট আসিয়া হেমেন্দ্র দেখিল, সেখানে বিছানার এক প্রান্তে অন্ধকারের ছায়ায় প্রায় মিশিয়া শান্তি পড়িয়া আছে। তাহার পিঠের উপর ছড়ানো কালো

লোক,—সর্ব্বদা তাহাকে লইয়াই কাটাইলে চলে না, ছেলে যত শান্ত হইতে লাগিল, তাঁহারও বাহ্যিক যত্নে ততখানি শিথিলতা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিনোদ রুদ্ধ বেদনায় জ্বলিয়া ভাবিল, "মা কখনো এমন করে আমায় ফেলে থাকতেন না।" মনে পড়িল, পূজাবাড়ির শত কার্য্যের ভিতরও সন্ধ্যা-পূজা সারিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া নিজের শয়নগৃহে চলিয়া আসিতেন, কেহ সে সময় বাধা দিলে বলিতেন 'আমার বিনু আগে ঘুমিয়ে পড়ুক, তখন হবে, ও যে সময়ে ঘুমুতে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, সে আমি সহ্য করতে পারব না'! হায়, সেই বিনোদ আজ দাসীর পাহারার মধ্যে বিছানায় একা জাগিয়া, আর কোথায় তার সেই স্নেহময়ী মা?

ভুবনমোহিনীর যেটুকু বিদ্যার সংস্থান ছিল, তাহা দ্বারাই বিনোদের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। পরে যথাসময়ে তাহার জন্য একজন মাষ্টারের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। স্কুলের একটি নিরীহ বাঙলা শিক্ষক খানকয়েক বাঙলা ও একখানি ইংরেজি বই টেবিলে সাজাইয়া বসিলে বাড়ির মধ্যে সে সংবাদ পৌঁছিল, মায়ের কাপড় শক্ত করিয়া ধরিয়া বিনোদ তখন গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল। মা বলিলেন, "পড়ে এসো বাবা, মাষ্টার বসে রয়েচেন।"

ছেলে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমার কাছে পড়ব, আর কারো কাছে না।" মা হাসিয়া কহিলেন, "তুই যে মুখ্যুর ছেলে রে! তোর মা কি আর কিছু জানে যে তোকে শেখাবে? শুধু এইটুকু শিখে রাখ্ বাছা, তুই খুব বিদ্বান হলে তোর মার খুব আহ্লাদ হবে,—কেমন বিদ্বান হবি তো?"

চুলের রাশি তাহাকে তাহার গভীর দুঃখের মধ্যে লজ্জা আবরণের মত আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

শিবানী ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার পিঠের উপর হইতে এলোথেলো চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি একবারমাত্র সচমকে মুখ তুলিয়া আবার তাহা বিছানার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

শিবানী বলিল, "শান্তি তুইও আমায় ছেড়ে যাবি?"

সে যে এ পৃথিবীর মধ্যে একখানি হৃদয়কেও নিজের কাছে টানিয়া রাখিতে পারিল না, এইটাই আজ সব চেয়ে তাহার বক্ষে আঘাত করিতেছিল। যে দুইজনকে সে আপনার করিতে চাহিয়াছিল, তাহারাই কি তাহার সব চেয়ে পর?

শান্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিল, "দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যাও, আমার—"রুদ্ধস্বরে এবার সে কাঁদিয়া উঠিল।

শিবানী কহিল, "কেন যাবি বোন? এ সংসারের তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে চলে যেতে চাস? যাস্‌নি শান্তি, মার কথা ধরিস্‌নি।"

হা ভগবান, তাহার ভাগ্যে এ অপবাদটাও বাকি রহিল না! সে নিজের ইচ্ছাতে নিতান্ত অকৃতজ্ঞার মত তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে!

শিবানী তাহার অন্তরস্থ সেই রুদ্ধ বেদনার অব্যক্ত কাতরোক্তি শুনিল না। মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণের মধ্যটা বজ্রাহত তালবৃক্ষের মত নিঃশব্দে পুড়িয়া উঠিল। একবারের জন্য দুর্জ্জয় অভিমান ও

প্রবল আত্মধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে গেল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই নিজের ব্যবহারে নিজে লজ্জিত হইয়া করুণ নেত্রে চাহিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী বিবর্ণ মুখখানা সাগ্রহে দুই হস্তে বক্ষে টানিয়া লইল, "ঠাকুরপো যাই বলুন, আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারব না, বল্ শান্তি তুই আমার উপর রাগ করে যাচ্ছিস না?"

শান্তি শিবানীর আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া সর্পাহতের মত শিহরিয়া মুখ তুলিল। একবারমাত্র তাহার কোমল সজল নেত্রে তীব্র ভর্ৎসনার বিদ্যুৎ আনিয়া তাহার পানে তাকাইল, তারপর আবার বিছানার মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

সেই মৌন দৃষ্টির নীরব আঘাতে যতখানি লজ্জা ছিল, সান্ত্বনা ছিল তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশি। মনে মনে সেই শাস্তিটুকু উপভোগ করিয়া লইবার লোভ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেও তখন সে সেই অনাস্বাদিত সুধাপাত্র ওষ্ঠাগ্র হইতে নামাইয়া লইল। একটি সুকুমার সরল হৃদয় যে তাহার নিকট অকপটে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, এ আনন্দটুকু তাহার নিকট নিতান্ত সামান্য নহে। মানুষের নির্ম্মম নিষ্ঠুর হস্ত তাহাদের মাঝখানে প্রসারিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। শিবানী ধীর স্বরে কহিল, "শান্তি, আরতির সময় হয়ে এল, মন্দিরে যাবি না? বাবা বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় সেখানে বসে আছেন। তোর রাজরাজেশ্বরীকে প্রণাম করতে যাবিনে?"

শান্তি এবার উঠিয়া বসিল। তাহার সূক্ষ্ম ওষ্ঠপ্রান্তে এক ফোঁটা বিষাদের হাসি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "দিদি,

রাজরাজেশ্বরী যে আর আমার পূজো নিতে চান না, তাই, আমি কি করবো ? দিদি ! আমায় যদি সত্যি যেতে হয় ত, তুমি আমার মত করে মালা গেঁথে দিও, ফুল দিয়ে মন্দির সাজিও, তেমনি নৈবেদ্য করে ধূপদীপ জ্বেলে দিও ; দেখো, দেবতার সেবার যেন ব্যাঘাত না হয়—”

শিবানীর কঠিন নেত্রে জল আর এবার চাপা রহিল না। সে কাঁদিয়া বলিল, “সত্য সত্যই তুই যাবি ? ঠাকুরপো জোর করে নিয়ে যাবে ? তুই শুনবি কেন ?”

“আমি কি করব, দিদি ? আমি ত যেতে চাইনি। কিন্তু যদি যেতেই হয়, তবে তুমি আমার হয়ে জ্যেঠামশায়ের সেবা—” বলিতে বলিতে সহসা তাহার কম্পিত কণ্ঠস্বর অস্ফুট হইয়া পড়িল। সে কথা আর বলা হইল না। জ্যেঠামশায়কে সে যে মাতৃহীন করিয়া যাইতেছে, এ অকৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাণে যে বজ্রের মত বাজিবে, তাহা মনে করিয়া তাহার ব্যাকুল চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। অথচ সে জানে, যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাধা দিতে গেলে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্দাম উন্মুক্ত করিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও মর্ম্মান্তিক ঘৃণার বিকট অভিনয় দেখান ছাড়া আর কোন ফলই হইবে না।

“শান্তি, এসো, গাড়ি এসেছে আর দেরি করে কাজ নেই” বলিয়া হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। “বৃষ্টিটা এইবেলা একটু কম আছে, খিড়কী দোর দিয়ে এই সময়ে বেরিয়ে পড়া যাক।”

ঘরে সন্ধ্যা ও মেঘ উভয় অন্ধকারের কালিমা ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। কে জানে, কি ভাবিয়া দাসী মোক্ষদা এখনও আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায় নাই। তাই সেই অস্ফুটালোকে হেমেন্দ্র

শিবানীকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু শিবানী এ কথা শুনিয়া ব্যাধহস্ত হইতে নিজের বক্ষস্থ সন্তানটিকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় পক্ষিমাতা যেমন করিয়া তাহাকে তাহার কম্পিত পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে, তেমনইভাবে চমকিয়া শান্তির হাত দুইখানা আপনার দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি তোমায় যেতে দোবনা, শান্তি, বরং ওই গাড়ি করে চুপে চুপে আজ তোমরা আমায় বিদায় করে দাও, আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই।"

রুষ্টস্বরে হেমেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "শান্তি, শান্তি, উঠে এসো, আমি তোমায় আদেশ করচি, তুমি ওঁকে স্পর্শ করোনা; শীঘ্র এসো।"

শান্তির চারিদিকে কালো কাপড়ের মত অন্ধকারের ছায়াখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "একবার জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে দাও, ওগো, তোমার পায় পড়ি একটিবার আমায় যেতে দাও।"

হেমেন্দ্র অবিচলিতভাবে কহিল, "এ জন্মে আর সেটি হচ্চে না। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করবার অধিকার ও ক্ষমতা এখনও আমার আছে, সেটুকু আমায় প্রয়োগ করতে বাধ্য করে তুলোনা। উঠে এস, তোমার জ্যেঠামশায় তোমার চেয়ে হাজার গুণ আদরের জিনিষ পেয়েছেন, তিনি আর তোমার জন্য ব্যস্ত নন্।"

২৬

দেবমন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে উর্দ্ধে সাটিনের উপর জরীর বুটিদার

চাঁদোয়া, তাহার নীচে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদির উপর রৌপ্য সিংহাসনে রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপিত। পীতাম্বর ময়ূরপুচ্ছ এবং সুবর্ণ বংশী ও স্বর্ণচূড়ায় সজ্জিত যুগলকিশোরের নিকষকৃষ্ণ পাথরের চিক্কণদেহ বিগ্রহের গলায় তখনও শান্তির হস্তের গাঁথা বিনা-সূতার মালা চামরের অল্প বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া সুবাস ছড়াইতেছে, সে মালা এখনও অম্লান। রাধার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নীলাম্বরে সুশোভিত, সে বস্ত্রে প্রত্যেক চুমকি ও জরিটি শান্তি নিজের হাতে অনেক যত্নে বসাইয়াছিল। সেই কষিত কাঞ্চনমূর্ত্তি, আলোকঝকিত অলঙ্কার ও বস্ত্রে উভয় পার্শ্বস্থ অন্যান্য দেবপ্রতিমাগণের সহিত প্রতিদিনকার মতই দীপ্তি পাইতেছিলেন। তবু আজ সমস্ত দেবালয় যেন বর্ষার বাতাসের সঙ্গে যোগ দিয়া হাহা করিয়া উঠিতেছে! যেন আজ সেখানে কেহই নাই! পুষ্পচন্দনের কোমল ঘনসৌরভে মন্দিরের বায়ুস্তর আমোদিত। বাতির আলো বহু-শাখাবিশিষ্ট বেলওয়ারি ঝাড়ের মধ্য হইতে তাহাদের পিঙ্গল আভা বিচ্ছুরিত করিয়া নিম্নে চাহিয়া আছে। নিত্য-সেবার ভোজ্য নৈবেদ্য প্রতিদিনকার মত সযত্ন-রচিত, কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পুরোহিত তাহারই মধ্য হইতে আজ শত খুঁটি-নাটিতে ত্রুটি ধরিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পানের বাটা আজ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। ধুনা জ্বালাইবার জন্য অগ্নি রাখা হয় নাই। রাজ-রাজেশ্বরীর পূজার উপকরণ শ্যামের সম্মুখে এবং শ্যামের ভোজ্যপেয় শ্যামার বামভাগে রাখা হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর বিলম্বে প্রাপ্ত ধুনাচীর অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে চূর্ণিত ধুনা নিক্ষেপ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "মা লক্ষ্মী ত বাড়ী এসেছেন, তবে আবার এ সব বেবন্দোবস্ত হচ্ছে কেন?"

শ্যামাকান্ত যখন আলোক-প্রদর্শিত পথে ছাতা মাথায় দিয়া অল্প বৃষ্টিটুকু বাঁচাইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চপ্রদীপ শঙ্খ ও পুষ্প দ্বারা আরতি সমাপ্ত করিয়া আচার্য্য ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা করিতেছেন। বৃষ্টির জন্য বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতাবশতঃ, যে কারণেই হউক আজ শ্যামাকান্ত তাঁহার চিরদিনের নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ জমিদার তাঁহার বিগ্রহত্রয়কে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া বসিতেই এই মঙ্গল উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন অপূর্ণতা প্রথমেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিল। পুরোহিতের পশ্চাতে অল্প দূরে মর্ম্মর মেজের উপর প্রায় তেমনই শুভ্র কোমল করতল রক্ষা করিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী শান্তি ত আজ বসিয়া নাই?

শ্যামাকান্তের মনটা সহসা বিকল হইয়া উঠিল,—সে ত কখনই এখানে অনুপস্থিত থাকে না! উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমারা এসেছিলেন?"

সে জানাইল, তাঁহারা আসেন নাই।

"বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয়, বৌমা কেন আসেন নি, অসুখ করেনি ত?"

ভৃত্য চলিয়া গেল। শ্যামকান্ত সেইখানেই দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্বেগ ও অনুতাপে তাঁহার মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কেন আসিল না? সে'ও কি আজ তাঁহার স্নেহে সন্দিহান হইয়াছে? না, তাঁহার আত্মবিস্মৃতিতে অভিমান করিয়া আসে নাই? কয়দিন যে তিনি হেমের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন,—শান্তির কথা ভাবিয়াই যে মর্ম্মাহত হইয়া

আছেন, অথচ সেই শান্তিকেই এই নীরব ঔদাসীন্যের দ্বারা অনাদরের বেদনা দিয়াছেন! না, না, বুঝি সে কয়দিনের পরিশ্রমে অসুস্থ আছে! বুঝি স্বামীর অবিবেচনার নিদারুণ আঘাত তাহার কোমল বুকখানিকে বিঁধিয়া ফেলিয়াছে! তাহাই হইবে, নহিলে তাঁহার মা কি তাঁহাকে চিনে না? না, তাহার রাগ বা অভিমান হইয়াছে?

শ্যামাকান্ত যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সজল প্রচুর ঘনায়ত বিশাল নেত্র, তাহার মধ্যকার মেঘান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ কি স্নিগ্ধ মধুর বিদ্যুৎস্ফুরণ! কে জানে, মানুষের কেমন সঙ্কীর্ণ সভয় চিত্ত! কোথায় রাগ? কোথায় অভিমান? শান্তির মনে রাগ অভিমান কৈ কখনও দেখা যায় নাই ত!

অল্প পরেই ভৃত্য বিস্ময়চকিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তারিণী বল্লে একটুখানি আগে ছোটবাবু ছোট মাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড় মা তাঁর ঘরে বসে কাঁদ্‌চেন।"

শুনিয়া শ্যামাকান্তের চোখের উপর হইতে অকস্মাৎ সমুদয় আলোকদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে প্রস্তর প্রতিমার মত অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রস্থানোদ্যত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহস করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় স্তব্ধ জমিদারের নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে তাঁহার বাহু স্পর্শ করিলেন, তখন চমকিয়া শ্যামাকান্ত প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া একটা ঘোর দুঃস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছেন, না জাগিয়া আছেন? পুরোহিতের

দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "সত্য কি, মা আমায় ছেড়ে চলে গেছেন?"

"মা? এ কি কথা বলছেন? মা জগদম্বা আপনার ভক্তি ডোরে বাঁধা, আপনার মত ভেদজ্ঞানহীন সাধক কি এ কলিকালে দ্বিতীয় আছে? মার প্রসন্নমুখে অপ্রসন্নতার ছায়াটিও পড়ে নি। ঐ দেখুন, বরাভয়দায়িনী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্য করছেন।"

মাতৃহীন শিশু যখন মা বলিয়া আব্দার ধরে, তখন যদি তাহার বিমাতাকে দেখাইয়া কেহ বলে, 'এই তোমার মা, তাহা হইলে সে যেমন প্রবলভাবে তাহা অস্বীকার করিয়া উঠে, তেমনই ভাবে বৃদ্ধ জমিদার হতাশার সহিত এক মুহূর্ত্তের জন্য দেবীর প্রসন্ন মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো জগদম্বে, যদি অপ্রসন্ন হোস্‌নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে আমায় ফিরিয়ে দে'মা, আমার শান্তিকে ফিরিয়ে দে।"

আচার্য্য সবিস্ময়ে শ্যামাকান্তের পানে চাহিলেন, "মালক্ষ্মীর কি হয়েছে? তিনি ত ভালই ছিলেন?"

বৃদ্ধ জমিদার কাঁদিয়া ফেলিলেন, "হেম এখান থেকে মাকে নিয়ে গেছে,—নিশ্চয়ই জোর করে নিয়ে গেছে—"

"সে কি, এই দুর্য্যোগে? এই ভাদ্রমাসে? ছোট বাবু পুরো নাস্তিক হলেন যে! এত বড় বংশের সন্তান—" বিস্ময়ে পুরোহিতের নেত্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

এই কথায় ব্যাকুল বৃদ্ধ অস্থিরভাবে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট কালো মেঘে থাকিয়া থাকিয়া তখনও বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, পুকুরঘাটে ভেক দলের আনন্দ কলরবের শেষ নাই। এই দুর্য্যোগের রাত্রে অন্ধকার প্রকৃতির পানে চাহিয়া সহস্র বেদনায় বিদ্ধ তাঁহার অশান্ত চিত্ত আজ আবার নূতন নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। এই অন্ধকারে করালিনীর প্রলয়বার্ত্তা-ঘোষণার মাঝখানে তাঁহার সাধনার লক্ষ্মী কাহার নিষ্ঠুর অভিশাপে আজ অতল সিন্ধুতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল? একটা মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাঁহার শুষ্ক হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া আকুল ক্রন্দন বহন করিয়া আনিল! শোকদীর্ণা প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন তাঁহার প্রাণের মধ্যেও তুফান তুলিয়া দিল! ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার বেদনারুদ্ধ ক্রন্দন ব্যাকুল আবেগে সুদূর বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, তুই কেন গেলি মা, তুই কোথা গেলি, আর কি আমি তোকে ফিরে পাবো?

২৭

লর্ড কর্জ্জনের প্রবর্ত্তিত বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় সে সময় স্বদেশী আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, সুখসুপ্ত বঙ্গবাসীগণ তখনও পর্য্যন্ত সুখনিদ্রাভঙ্গে রাবণের আহ্বানে অকাল-জাগ্রত কুম্ভকর্ণের ন্যায় বিস্ময়-বিহ্বল, তখন পর্য্যন্ত তাহারা বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে নাই। যুবকগণ, বিশেষতঃ বালকের দল উদ্যমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেও বড় বড় প্রবীণ লীডারেরা তখনও পর্য্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলিতেছেন, "এটা কি টিঁকিবে?"

মহৎ উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত কোন দেশে কখনও ব্যর্থ হয় নাই,—আজও হইল-না। ‘স্বদেশী আন্দোলন’ বৈশাখী আকাশে ক্ষণিক বজ্র বিদ্যুতের অগ্নিমুখী গর্জ্জনের পর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজালে মিলাইয়া না গিয়া একটা স্থায়ীবর্ষণের আগ্রহে বর্ষাকাশে নবীন মেঘরাশির মত বঙ্গ-গগনের উপর সুশোভিত হইয়া রহিল। যে সকল দেশবাসী এই সময়ে প্রকৃত পথ অনুসরণ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইয়াছিলেন, রজনীনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম।

রজনীনাথের স্বদেশপ্রেম বঙ্গকটের হুজুকে জন্মলাভ করে নাই। তাহা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখনই তিনি এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গিয়াছেন—তাঁহার সহকর্ম্মী বা বন্ধুদের মধ্যে কেহ হাসিয়া কেহ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কেহ বা তর্কের দ্বারায় তাঁহার এই ‘ম্যানিয়া’টাকে উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ লোকেই বলিয়াছেন, ‘ডিজেনারেট’ দেশে আছে কি? কৌপীন-বস্ত্র না হলে ত দেখচি দেশী জিনিষ ব্যবহার করা চলে না। বড়জোর কেহ বলিয়াছেন, এ গরীব দেশে সস্তা বিলাতী ছেড়ে মহার্ঘ দেশী জিনিষ চালাতে যাওয়া কি মূর্খতা নয়? তার পর দেখ, সহজে সব জিনিষ আবার পাওয়াও যায় না। একটু বেশি দাম দিয়া ব্যবহার আরম্ভ না করিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে কেমন করিয়া এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারাই সকল দ্রব্য সহজপ্রাপ্য হইবে এ যুক্তিটার মূল্য ধরিতে কেহ প্রস্তুত নহে। দাম বেশী দিয়া মোটা দেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে বিলাস-ব্যাপারেও যে অনেক সস্তা পড়ে এ কথাটা এমনই হাস্যকর যে

বিনোদ মার কোলে শুইয়া পড়িল, বলিল, "আমি খুব বিদ্বান হবো।"

"আচ্ছা।"

"তা হলে তুমি আমায় কি দেবে বলো?"

মা পুনঃ পুনঃ তাহার ললাটে গণ্ডে চুম্বন করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন, "রাঙ্গা বউ এনে দোব"।

"যাও, তা হলে কিন্তু কিছু শিখব না বলে রাখচি।"

মা ছেলের কণ্ঠবেষ্টিত হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আচ্ছা রে, না হয় কালো বউই খোঁজা যাবে তুই এখন পড়্‌বি চ, দেরি হয়ে যাচ্চে, মাষ্টার মশায় যদি মনে করেন ছেলেটি বড় অবাধ্য! আয়, আমি দোরের কাছে বসে বসে দড়িটা বিনিয়ে রাখব 'খন, তোকে কিন্তু খুব লক্ষ্মী ছেলের মত পড়া বলতে হবে।"

"তা হলে রোজ পড়ার সময় তুমি দোরের কাছে গিয়ে বসবে?"

"হ্যাঁ বসবো বইকি, তুই কেমন শিখছিস্, শুনবো না? মা শুনবে, ভুল কর্ব্বার যো নেই, কাজেই খুব শীঘ্র শীঘ্র অনেক শিখে ফেল্‌বি, আর যেই পড়া হয়ে যাবে, অমনি আমার কাছে ছুটে আসবি, আমি কোলে নোব, চুমো খাব—"

বিনোদ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "হ্যাঁ মা, বেশ! তাহলে বেশি আদর করো, খুব পড়া শিখে ফেলব।"

প্রথম প্রথম পড়া বলিবার সময় সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিত, কাণ পাতিয়া যেন কি শুনিতে চেষ্টা করিত। মাষ্টার বলিলেন, "The Ram.—মানে? বলো।" বিনোদ চমকিয়া উঠিত, "বলচি, বলচি,—ভেড়া।"

রজনীনাথের মুখ হইতে ইহা বাহির হইবার পূর্ব্বেই ময়ূরপুচ্ছ শোভিতবপু দাঁড়কাকের দল টাইয়ের উপর টাইরিং আঁটা কণ্ঠ সপ্তমে তুলিয়া কক্ষের প্রত্যেক খিলানটি অবধি কাঁপাইয়া এমন উপহাসের হাসি হাসিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখের কথা মুখেই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ আর উপহাসের উচ্চ হাস্য কোন উচ্চ হৃদয়কে তীক্ষ্ণ আঘাতে বিদ্ধ করিতেছিল না।

রজনীনাথ কয়দিন হাঁফ ফেলিবারও অবসর পান নাই। নিজের কাজকর্ম্ম সব ঠেলিয়া ফেলিয়া নূতন উদ্যমে নূতন উৎসাহে সভায় যোগদান ও মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইয়া স্বদেশী শিল্প-গ্রহণে উৎসাহদান করিয়া বহুদিনের আক্ষেপ মিটাইয়া লইতেছিলেন। মনে উৎসাহ ও শরীরে বলের অভাব ছিল না। একদিন কাজকর্ম্ম সারিয়া ভিতরে আসিলে বসুমতী তাঁহার উৎসাহদীপ্ত অথচ স্নানাহারের অনিয়মে ঈষৎ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন, "একি শ্রী হয়ে গেছে! মাগো! তোমার সকলি কি বাড়াবাড়ি?"

রজনীনাথ আয়নার সম্মুখে গিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কেন, এই ত দিব্যি শ্রী রয়েছে!"

বসুমতী হাসি চাপিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড্ড শ্রী বেড়েছে! বলি, একেবারেই কি বাড়ীঘর সব ত্যাগ করবে নাকি?"

"দেশের কাজের জন্য কি তাও করা উচিত নয়? যাক, তুমি হঠাৎ এত চটলে কেন বল দেখি?"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বসুমতী বলিলেন, "না, চটব কেন?

তবে সময়ে নাওয়া খাওয়া করে কাজ কর না! শান্তিদের যে দু একদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীপুরে ফেরবার কথা ছিল—কিছু খবর পেলে?"

"তাই ত, তোমায় কিছু বলিনি বুঝি!" একটু অপ্রতিভভাবে জলের গ্লাশটা নামাইয়া পত্নীর সাগ্রহ দৃষ্টির উপর সহাস্যদৃষ্টি স্থাপন করিয়া রজনীনাথ প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "তারা যে এসেছে, আজ বিকেলে আমি একবার যাব মনে করেছি।"

সেদিন রজনীনাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া সেখান হইতে যে অস্বচ্ছন্দতা ও চিন্তা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহা তাঁহার নূতন ব্রতের শত উদ্দীপনাতেও ঢাকা পড়িল না।

শান্তির সুখসৌভাগ্যের যেদিকটায় হঠাৎ টান ধরিয়াছে, সেই অংশটার জন্য রজনীনাথ নিজেকেই প্রধান—প্রধান কেন সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করিতেছিলেন। পোষ্যপুত্রের সহিত শান্তির বিবাহ দিতে শান্তির মা কোনমতেই সম্মত ছিলেন না! নিজের সত্য করিতে রক্ষা এবং ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া শান্তিকে যদি দুর্ভাগিনী করিয়া ফেলিয়া থাকেন! ভগবান! এই কি পিতার কর্ত্তব্য! গোপন নিশ্বাসে দৃঢ় চিত্তের অনেকখানি বল বিসর্জ্জন দিয়া রজনীনাথ ভাবিলেন, "এর চেয়ে বসুমতীর নির্ব্বাচিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে শান্তি সুখী হইত।" নিজের দুর্ভাগ্য বা দুর্ব্বলতার দায় অদৃষ্ট বস্তুটার উপর চাপাইতে পারিলে নিজের মনের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায়, এবং এ যুক্তি অনেকখানি আত্মগ্লানি ও অনুতাপকে খর্ব্ব করিয়া থাকে। কিন্তু রজনীনাথের পক্ষে সে আত্ম-সান্ত্বনার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। নিজের অপরাধের বোঝা দৈব বেচারার উপর চাপাইয়া

চিত্ত লঘু করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না; তাই হৃদয়ের ভারও তাঁহাকে একটু বেশী মাত্রায় ভোগ করিতে হইতেছিল। বসুমতী তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর বেদনা পাইবেন বুঝিয়া তিনি হৃদয়ের সে প্রচ্ছন্ন ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। নীলকণ্ঠের কণ্ঠগরলের মত তাহার তীব্র জ্বালা তাঁহাকেই গোপনে জ্বালাইতেছিল। হেমেন্দ্রের ভক্তিপ্রীতিশূন্য দুর্বিনীত ব্যবহার রজনীনাথের মনে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল। বিশেষতঃ এবারে আর একটা তীব্র আঘাত তাঁহার চিত্তকে নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতের মতই কাটিয়া তুলিয়াছে। শান্তিও হেমেন্দ্রের মধ্যে যে একটা গভীর ভালবাসার বন্ধন নাই এবং হেমেন্দ্র যে শান্তিকে নিতান্তই অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা তাহাদের সেদিনককার ব্যবহার হইতে রজনীনাথের বুঝিতে বড় বাকি ছিল না; যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আবার শ্যামাকান্তের কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্যামাকান্তও সেই প্রথম দিনেই উইলের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিনোদের পুত্রের সহিত শান্তিকে তুল্যাংশে তিনি বিষয় ভাগ করিয়া দিবেন, হেমেন্দ্র নিজের হাত খরচের জন্য মাসিক কিছু কিছু টাকা পাইবে মাত্র। শুনিয়া রজনীনাথ একটু উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আবার কি কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় করাতে চান চৌধুরীমশায়? মনে কর্ব্বেন না, আপনার হেম কোন অংশে গোবিন্দলালের চেয়ে ভাল!" তারপর একটু লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে কহিলেন, "এখন আপনার উইল না করাই ভাল, নিতান্তই যদি না করলে আপনার মনের তৃপ্তি না হয়,

তবে আমার পরামর্শ এই যে বিনোদের ছেলের সঙ্গে জমীদারির ভাগ অন্ত কারুকে না দেওয়াই উচিত। এ থেকে চিরকালের জন্য একটা বিবাদের সৃষ্টি করা ভিন্ন লাভ কিছুই হবে না।”

শ্যামাকান্ত বৈবাহিকের নিকট যথার্থ নিরপরাধী হইলেও নিজের মনকে তাহা কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পাছে রজনীনাথ কিছু মনে করেন, সেই জন্যই বিষয়-ভাগের কথাটা তিনি হঠাৎ তাড়াতাড়ি পাড়িয়াছিলেন। বেহাইএর প্রস্তাব সত্যই যেন তাঁহাকে বিহ্বল করিল। আনন্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে রজনীনাথের পিঠে হাত রাখিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে, কহিয়া উঠিলেন, “কি বলে আশীর্ব্বাদ করব, রজনী, ঈশ্বর তোমার চিরমঙ্গল করুন, মা তোমার সহায় হোন, তোমার কাছে যথার্থ আজ আমার যে মুখ দেখাতে লজ্জা করচে। কিন্তু যাই হোক এখন আমি কি করি বল ত ভাই? মাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেবই স্থির করেছি, আর সেটা এখনই মিটিয়ে রাখা ভাল। বৃদ্ধ হয়েছি, কোন দিন আছি, কোন দিন নেই, কাজ কি, হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখাই ভাল। আসল কথা হচ্চে, হেমের হাতে বিষয়টা পড়ে, এ আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। সত্য কথা বলতে কি জান, আমি ওটা সাহসই করচি না। একে ত সে আমার মার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করচে না, তার উপর টাকাকড়ি যদি হাতে পড়ে,—ঐসব দেখতে তো পাচ্চই? কি আর আমি তোমায় বলব বল ভাই, আমি ত ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্চিনা। আমার মাকে যে অযত্ন করে আমার তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না।”

শুনিয়া রজনীনাথ একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মর্ম্মের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বেদনার হাহাকার উঠিল। কিন্তু দুঃখে নিরাশায় অবসন্ন বা হতাশ হওয়া রজনীনাথের স্বভাব নয়। ক্রোধ ও বেদনাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া জামাতাকে সংশোধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার উইলও ত লতির পক্ষে এমন কিছু মঙ্গলের হবে না। যে পথটা আপনি নিচ্চেন, সেইটেই যে হেমের পক্ষে সব চেয়ে অমঙ্গলের। আমি শান্তির বাপ হিসাবে এ পরামর্শ শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিচ্চি না, আপনার আশ্রিত সেই চিরকৃতজ্ঞ ছোট ভাইএর হিসাবেই বলছি, এখন উইলের নামও করবেন না। এই অবসরে যদি হেম একটু মানুষ হয়ে উঠতে পারে, সেই চেষ্টাই করুন। বোধ হয়, ভগবান্ তার রক্ষার জন্যই এই শুভ মুহূর্ত্ত দান করেছেন।"

শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে কি তা হবে? মা আমায় কি এমন দিন দেবেন! কিন্তু দেখো ভাই শেষটা আমি যেন আমার মার উপর অন্যায় না করে ফেলি, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তাহলে আইন ত—"

"আপনার নগদ টাকাও ত খুব অল্প নয়, ইচ্ছে করেন ত জমীদারি ভাগ না করে ওদের সেইটেই দেবেন। কিন্তু এখন ও সব কথা থাক, হেমকে তার ভবিষ্যৎ ভাববার একটুখানি অবসর দিন, নাহলে জানবেন চৌধুরীমশায়, আপনার সমুদয় জমীদারি ও বিষয় বিভব শান্তির চোখের জল থামাতে পার্ব্বে না।"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তারা!"

মনের জ্বালা মনে চাপিয়া এই ঘটনাটাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া

রজনীনাথ বসুমতীকে যাহা জানাইলেন, তাহার মোটামুটি অর্থ এই যে, শ্যামাকান্তের শান্তিকে অর্দ্ধেক সম্পত্তিদানে রজনীনাথই বাধা দিয়াছেন। বসুমতী এ স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা বুঝিলেন না, বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তার পর, মেয়েটা খাবে কি করে,—বিনোদের বউ যখন ওদের বিদায় করে দেবে? হেমের ত ঐ বিদ্যে।"

রজনীনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি মেয়ের বে দিয়ে যে ঘর জামাই রাখতে চেয়েছিলে? এর মধ্যে ভয় হয়ে গেল, পাছে দুদিন খেতে দিতে হয়! দক্ষ পিতার কথাই শোনা গিয়েছিল, মা এমন কৃপণ, তা কখনও শোনা যায়নি!" পরে গম্ভীর মুখে কহিলেন, "হেম একটু মানুষ হোকনা, কেন,—তাতে তোমরা সকলেই বাধা দিতে চাও? জেনো বসু, ঈশ্বর যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য! চৌধুরী যদি হেমকে সত্যসত্য বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন, তাহলেই হেমের পক্ষে সব চেয়ে মঙ্গলের হত, আর আমার নতিটারও বড্ড উপকার হত। গরীবের স্ত্রীর আদর থাকে বসু, বড় লোকের স্ত্রী হওনি, তাই বুঝতে পারবেনা, তারা কি আগুন হীরের জ্যোতিতে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে! ভগবান আমার মেয়েকে তাদের দল থেকে রক্ষা করুন।"

ঠিক মনের সহিত না মিলিলেও বসুমতী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীর মতের বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে তিনি সাহসী হইতেন না। জামাতার দারিদ্র্য-লাভের আশীর্ব্বাদটা কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনঃপূত হইল না, মনে মনে শান্তিকে রাজরাণী হইবার জন্য পুনঃপুন আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি ভাবিলেন, সবই বাড়াবাড়ি!

বড়লোক হলেই কি বদ হয়? হেম ত আমার তেমন কিছু মন্দ ছেলে নয়! মিথ্যে এত ভাবতেও পারেন!

শীঘ্র শীঘ্র শান্তিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রজনীনাথ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সাগ্রহে বলিলেন, "সেখানে সে যে কি সম্মানে কি আদরে থাকে, তাত তুমি দেখনি বস্থ, সে কেমন করে সর্ব্বদা আসবে বল। আমাদের সেই এক ফোঁটা শান্তি সেখানকার সকল লোকের মা, শ্বশুর থেকে দাসী চাকর শুদ্ধ। সকলেই তার অনুগত, কদিনের মধ্যে বিনোদের স্ত্রী ও ছেলেটী তার একেবারে বশ হয়ে গেছে, সেই ত এখন অত বড় লক্ষ্মীপুরের জমীদারি একরকম চালাচ্চে। তার পরামর্শ ছাড়া চৌধুরী কোন কাজই করেন না।"

রজনীনাথের কণ্ঠে ইহার মধ্যে যে সঙ্কোচ ও বেদনার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহাকে আর ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাঁহার সবল চিত্তেও অধিক ছিল না। কই তিনি একথা বলিতে ত পারিলেন না, যে হেমও তাকে পাঠাতে ইচ্ছুক নয়!

সেদিন বর্ষার বাদলে বেশি লোক জমে নাই এবং যাহারা সেই বৃষ্টিবাদল মাথায় করিয়াও মনের অদম্য আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, রজনীনাথ তাহাদের আর্দ্রবস্ত্রে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে না দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বিদেশী শিল্প-বর্জ্জনে দেশের বড় লোকদেরই যে সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ও সর্ব্ব বিষয়েই যে তাঁহাদের দায়িত্ব অধিক এই সম্বন্ধেই রজনীনাথ সেদিন কিছু বলিতেছিলেন। সকল দেশেরই মধ্য শ্রেণীর লোকেরা প্রথম শ্রেণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। উচ্চের আদর্শে সমুদয় সমাজ গঠিত হইয়া থাকে,

করিয়া রজনীনাথ ঈষৎ উত্ত্যক্তভাবে আপনা আপনি বলিলেন, "এতরাত্রেও 'মক্কেল' নাকি ? কি মুস্কিল।" চকিতমাত্র একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হইল। কিন্তু হেম যে এতরাত্রে আসিবে না, তাহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া সেদিক হইতে মনটাকে ফিরাইয়া লইলেন। বসুমতীর চিত্তেও হয় ত ইহার ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। একটু উৎসুক হইয়া তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বল্লে, হেম আজকালের মধ্যে আসবে, সে এলোনা ত ?

রজনীনাথ কোন উত্তর দিলেন না, একান্ত ক্ষোভে নীরব হইয়া রহিলেন। গাড়িখানা গাড়ি-বারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিল। রজনীনাথ জোর করিয়া মনটাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং একেবারে আলোচনাটাকে সোজা পথে আনিয়া সোৎসাহে কহিলেন, "বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মত আরও দুটো একটা কল এই সময় বসান যায়, তাহলে বড় কাজ হয়। চৌধুরীর নগদ টাকা অনেক, সে টাকা তিনি শান্তিকে দিতেও রাজি আছেন। সেইটা নিয়ে নিজেরাও কিছু দিয়ে, আরও দুদশজন বড় লোক এক সঙ্গে মিলে যদি—"

"একি ! এ যে শান্তি,—তুই এমন সময় ?" নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে কম্পিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তি সহসা বাধা প্রাপ্তের মত থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল, এত রাত্রে তাহার পিতা মাতা নিদ্রিত হইয়াছেন। সে শুধু গৃহের স্তিমিতালোকে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া একবার মাত্র তাঁহাদের স্নেহমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিয়া যাইবে। রাত্রের মত তাঁহাদের কাছে জবাবদিহি করিবার হাত হইতে নিস্তার পাইবে, মনে করিয়াও তাহার চিত্তটাকে সে ঈষৎ

লঘু বোধ করিতেছিল। যে মা বাপের স্নেহক্রোড় সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কামনা করিয়া আসিয়াছে, আজ নিকটে আসিয়াও সেখানে সেই চির-বিশ্বস্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে সে সঙ্কুচিত ?

দ্বারবান ও দুই একজন সদ্যো-নিদ্রোত্থিত দাসদাসীকে ইঙ্গিতে গোল করিতে নিষেধ করিয়া উপরে উঠিয়া শান্তি এক মুহূর্ত্ত দ্বারের নিকট দাঁড়াইল, আঁচল দিয়া চোখ দুইটা বারম্বার মুছিয়া ভাল করিয়া নিশ্বাস লইল। বুকের মধ্যে অপরাধীর আতঙ্ক অকারণে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। একবার চির-অভ্যস্ত মা শব্দ তাহার মুখে আসিয়া পৌঁছিল। সে জানিত, সে মা ডাক নিদ্রিতা জননীকে মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে ও আগমনীর প্রভাতে গিরিরাজ-পত্নী মেনকার ন্যায় আলুথালু বেশে মা আসিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে উমা-জননীরই মত ব্যাকুল স্নেহে বক্ষে টানিয়া লইবেন। কিন্তু হায়! শান্তি কি সে অধিকার লইয়া তাঁহাদের দ্বারে আসিয়াছে ? সে কি দুহিতৃগর্ব্বে পিতামাতার স্নেহবক্ষে স্থান পাইতে অধিকারিণী ? অপরাধী স্বামীর সহিত অপরাধিনী পত্নী আজ তাহার পিতৃগৃহের নির্ম্মল বায়ুটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের অঙ্গের কালিমা কলুষিত করিতে আসিয়াছে! সে কোন্ মুখে সেই চির স্নেহের দাবী লইয়া তাঁহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইবে ? কোন মুখে চির মধুর মা নাম লইয়া ডাকিয়া বলিবে, আমি এসেছি! দ্বার খুলিয়াই সে বিস্ময়ে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া দেখিল, আলোকিত কক্ষে তখনও পিতামাতা জাগিয়া, আর তাঁহারা,—এমন কি—এই জনমুখরিত কোলাহলক্লান্ত নগরীর বিশ্রামের অবসরেও তাহার নাম স্নেহ কম্পিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন! তাহার পা দুইখানা যেন

সেইখানেই আটকাইয়া গেল। খুব সাবধানে প্রবেশ করিলেও শান্তির হাতের চুড়ি বালা ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটায় একটা মৃদু শিঞ্জন-ধ্বনি উঠিয়াছিল, সে শব্দটুকু উৎকর্ণ রজনীনাথের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিস্ময়ের সহিত দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সত্য! শব্দ তবে তাঁহাকে প্রতারণা করে নাই। যে শব্দে তাঁহার বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে আঘাত করিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই শান্তির হাতের চুড়ির! আনন্দে বিস্ময়ে কলের মত তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এত রাত্রে তুই কেমন করে এলিরে বুড়ি?" পরক্ষণেই আনন্দ-নির্ব্বাক বসুমতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখছ, বসু তোমার বেহাই কত ভদ্র, অনেকদিন তুমি মেয়েকে দেখনি, তাই নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও কিরে লতি অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? আয় মা, আমার কাছে আয়, হেম এসেছে ত? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালেন?"

বলিতে বলিতে সন্তানবৎসল পিতা দুই ব্যগ্র বাহু কন্যার দিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে বক্ষে লইতে সাগ্রহে উঠিয়া গেলেন। বিদ্যুতে পরিপূর্ণ জলীয় বাষ্পভরা মেঘখানা বর্ষণোন্মুখ হইয়া যখন আকাশের গায় স্তব্ধ ভাবে দাঁড়ায়, তখন কতটুকুই বা উত্তর বায়ুর প্রয়োজন থাকে? ঠাণ্ডা বাতাসের একটা দমকামাত্রে সেখানাকে ফাটাইয়া ঝরাইয়া এককালে নিঃশেষে বর্ষণ করাইয়া দেয়। তেমন করিয়াই শান্তির রুদ্ধ বাষ্পেভরা হৃদয় সেই স্বল্প অথচ পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসে জড়িত স্নেহাদরে যেন ফাটিয়া পড়িল। সে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া, পিতার পদতল ধরিয়া মাটিতে বসিয়া

একদিন সন্ধ্যাবেলা ভুবনমোহিনী বিছানায় বসিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন, "বিনু, ধন!"

"কেন মা?"

"আচ্ছা, তুই পড়া বলতে বলতে চুপ করে দোরের দিকে চেয়ে থাকিস্, কেন? বল্‌তো, কি ভাবিস্?"

বিনোদ লজ্জায় মায়ের আঁচলখানা টানিয়া মুখে ঢাকা দিল। মা হাসিয়া মুখের উপর হইতে ঢাকা খুলিয়া দিয়া আপনার বুকে তার মুখখানা টানিয়া কপোলে চুমা খাইলেন, চুপি চুপি কাণের কাছে নত হইয়া কহিলেন, "আমি বলবো? আমি আছি কি না দেখিস্, না?"

বিনোদ আরো লজ্জা পাইল, মুখটা মার বুকে গুঁজিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ তা বই কি? তাই যেন—"

"ওরে পাগলা, আমায় কি তুই লুকুতে পারিস কিছু? আমি যে তোর মা।" তাহার গালের উপর গাল রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "ও রকম করলে হবে না তো বাবা, ওতে অমনোযোগী হয়ে যাবে যে! আমি না হয় একটা কাজ করব,—এক পর্দা টাঙ্গিয়ে দোব, তার ভেতর থেকে আমায় একটু-একটু দেখা যাবে, কি বলিস্?"

বিনোদ মার গলা জড়াইয়া সোৎসাহে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, মা, সে খুব ভাল হবে।"

বাড়ির পড়া সাঙ্গ হইয়া স্কুলে যাইবার সময় আসিল। পূজা, হরির লুট, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি মঙ্গল অনুষ্ঠান শেষ হইলে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ, রক্ষা-কবচ ও গ্রামের বৃদ্ধা গোয়ালিনীর নজর-লাগার-পড়া-ফুল প্রভৃতি গলায় হাতে বাঁধিয়

পড়িল। অবরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল, "আমায় তিনি পাঠাননি বাবা, আমি লুকিয়ে চলে এসেছি। আমি সেখানে থাকতে পারলুম না।"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। আর কিছু শুনিবারও প্রয়োজন ছিল না। রজনীনাথের প্রসারিত বাহু নিমেষে সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিল। বজ্রাহতের ন্যায় রজনীনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এ কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে? .

শান্তি নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বিস্ময়-বেদনায় কম্পিতকণ্ঠে পিতা কহিলেন, "হীনের সঙ্গে থেকে তুমি এত হীন হয়ে গেছ, শান্তি, এ কথা আমি যে স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি! আমার সব শিক্ষা, সব চেষ্টা এমন করে তুমি জলে ডুবিয়ে দিলে?"

অপরাধিনী একবার নতমুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল কিন্তু তাঁহার সেই কঠিন বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার চকিত দৃষ্টি আপনা হইতে নত হইয়া আসিল। তাহা ছাড়া সে বলিবেই বা কি? বলিবে কি যে, তাহার ঈর্ষাপীড়িতচিত্ত স্বামী জোর করিয়া তাহার আশ্রয়-নীড় হইতে তাহাকে কঠোর হস্তে ছিনাইয়া এখানে টানিয়া আনিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় আসে নাই! কেমন করিয়াই বা সে এ কথা বলিবে? স্ত্রী হইয়া পিতার নিকট স্বামীকে অপদস্থ করিবার সে কারণ হইবে! আত্মদোষ স্খালন করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। হেমেন্দ্র দোষী, কিন্তু সেই কি নির্দ্দোষ! সে জোর করিলে হেমেন্দ্র কি তাহাকে টানিয়া আনিতে পারিত? সে কেন লজ্জায় অভিমানে মরিয়া মাটিতে মিশাইয়া গেল না? কেন সে স্বামীকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া এমন করিয়া বলিতে পারিল না, যাহাতে তাহার মন বদলাইয়া

যাইতে পারিল। তাহার মৌন অধর ঈষৎ কম্পিত হইল মাত্র। স্ত্রী হইয়া স্বামীর মন ধর্ম্মপথে যে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে কি দোষী নয়?

বসুমতী স্বামীর রূঢ়তায় বিরক্তির সহিত উঠিয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া একটু তীক্ষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ওর উপর মিথ্যে রাগ করচ কেন? নিশ্চয়ই বিনোদের বউ ওকে কিছু বলেছে, কিম্বা হয় ত চৌধুরীমশায় ভাল ব্যবহার করেননি, নৈলে আমার মেয়ে এমন নয় যে আপনা হতে চলে এসেছে। তখনই ত তোমায় বল্লুম, ছোট ঘরের মেয়ে কখন ভাল হয় না, ওখানে আর বনবে না। আমার বাছাকে আমার কাছে এনে দাও। আয় শান্তি, তুই উঠে আয়।"

শান্তি উঠিল না। তাহার চোখের কোণ ছাপাইয়া যে অজস্র অশ্রুজল উথলাইয়া উঠিতেছিল, এবার তাহা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া সে এ অপবাদ সহ্য করিবে? অথচ কেমন করিয়াই বা সব কথা বলিবে? তাহা অপেক্ষা নীরবে পিতৃদত্ত দণ্ড গ্রহণ করাই ভাল;—যদিও সে অবিচারের দণ্ড, বিচারক ও বিচারার্থী উভয়কেই সাংঘাতিক বাজিবে!

রজনীনাথ তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি এখনই আসচি। শান্তি, তোমার কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি আশা করিনি। পরের কাছে দাবী নেই, নিজের সন্তানও শেষে এমন করে আশা ভঙ্গ করলে?"

রজনীনাথ উঠিয়া গেলেন। বসুমতীও কন্যা-জামাতার সেবার জন্য দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ প্রদান করিয়া আসিলেন।

কয়দিন ধরিয়া মেয়ের জন্ম তাঁহার মনটা ব্যাকুল হইয়া ছিল, কোন রকমে তাহাকে কাছে পাইয়া তিনি বর্ত্তাইয়া গেলেন। কোন কথা ভাবিবার তাঁহার আজ কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে যে আর বনিবনাও হইবার সম্ভাবনা নাই, সেকথা ত তিনি প্রথম হইতেই 'পই পই' করিয়া বলিতেছেন। রজনীনাথ যদি তাহা হাসিয়া না উড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে আর এ কাণ্ড হয় না। অনেক নির্য্যাতন না পাইলে কিছু আর শান্তি এমন করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই। পুরুষমানুষ লেখাপড়া বিষয়কার্য্য ভাল বুঝিলেও গৃহস্থালীর ব্যাপার ও লোকচরিত্র মেয়েমানুষের মত বোঝে না। কিন্তু ঐ যে কেমন মানুষের একটা 'সবজান্তা' সাজা রোগ, সেই দোষেই তাহারা মেয়েদের বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া যখন তখন সংসারে অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া বসে। বসুমতীর জেদী স্বভাব নয় বলিয়া সর্ব্বদাই তর্কে পরাজয় স্বীকার করিয়া তিনি চুপ করিয়া যান, কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার সে বিশ্বাসের পোষকতা সকল সময় করিতে পারেন না। বৃদ্ধ বৈবাহিকের উপরেও বসুমতীর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহার কন্যার উপর সে বৃদ্ধের বরাবরই অত্যাচার। তিনি যখন ঠিক নিজের মনের মত দেখিয়া শুনিয়া সেই ছেলেটিকে বাছিয়া লইলেন, মনে মনে একখানা কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাতে নূতন রং দিয়া নূতন ধরণে ফুটাইয়া তুলিয়া সেখানাকে একেবারে শোভা সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন, হঠাৎ এমন সময় কোথা হইতে লোভাতুর বৃদ্ধ তাঁহার সে কল্পনাকুসুম ছিন্ন করিয়া লইতে হাত বাড়াইল! বসুমতী অন্য মায়েদের মত মেয়ের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার মনের

শান্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন, তাই সে দুঃখ তাঁহার বড় লোকের পোষ্যপুত্র জামাতায় এখন পর্য্যন্ত মিটিতে ছিল না। বিশেষতঃ মেয়ে যখন শ্বশুরের সঙ্গে দীর্ঘ তীর্থভ্রমণে চলিয়া গেল, তখন আর তাঁহার বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। রজনী নাথের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার কোন আস্থাই রহিল না। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি আমায় এ রকম করে ঘুরে বেড়াতে দিতে, তাই মনে করে দেখ না।"

বসুমতী ক্রমে স্পষ্টই দেখিতেছিলেন, "স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে একটা ভয়ানক ভুলকে চিরদিন লোকের মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিবার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন,তাহার বিষময় ফল তাঁহার সংসারে কি রকম করিয়া ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। জামাই কখনও মা বলিয়া কথা কহিল না। মেয়ের উপর তাহার টান ত কিছু নাই বলিলেও হয়। তাহার উপর সে আবার লক্ষপতির পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র ভিক্ষুকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যদি রজনীনাথ নীরদের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে এ সব নাটকীয় অভিনয়ের ভূমিকা আর তাঁহাদেরও গ্রহণ করিতে হয় না!

এই পর্য্যন্তই না হয় এ অভিনয়ের শেষ হউক, তাহাও তাঁহার মনঃপুত হইল না। শুধু শুধু তাঁহার বাছাকে পিতা হইয়া এই দুঃখ সহাইলেন। এ সমস্তই বসুমতীর বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করার ফল।

রজনীনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, বসুমতী তাঁহাকে কি বলিতে গিয়া ঝড়ের আকাশের মত তাঁহার গুরুগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াই থমকিয়া চুপ করিলেন। শান্তি তখনও মাটিতে বসিয়াছিল, তাহার চোখের জল তখনও ফুরায় নাই।

রজনীনাথ বলিলেন, "যা শুনলুম, তাতে বেশ দেখচি তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হলো! একবার ভেবে দেখলে না যে, তোমার এই ব্যবহার তোমার বাপকে, কতখানি আঘাত করবে,—তুমি আমার সেই শান্তি? যাক্, সবই আমার কর্ম্মফল, আমায় সবই সহ্য করতে হবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তোমার শ্বশুর তোমায় ক্ষমা করচেন, সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই—"

শান্তির চোখের জল মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বসুমতী তীব্র ভাবে ফিরিয়া মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "অমন কথা বলো না, দোষ তোমার গোঁয়ারগোবিন্দ জামায়ের, ওকে কেন শুধু শুধু ও সব নিষ্ঠুর কথা বলচো—তুমি ত এমন নিষ্ঠুর ছিলে না।"

রজনীনাথ ঈষৎ চঞ্চলভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাই কি? সত্যই কি তিনি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন? কাহার প্রতি সে নিষ্ঠুরতা? যে তাহার জীবনের আধখানা জুড়িয়া রহিয়াছে, সুপ্রকাশের চেয়েও বোধ হয় যে তাঁহার বেশী আশার, অধিকতর স্নেহের—! না নিষ্ঠুরতা নয়, লোকে ইহাকে যে শব্দ দ্বারাই বিশেষিত করুক, তিনি জানেন, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা। সন্তানের ভুলের, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে তাহাকে সাহায্য করা পিতার কর্ত্তব্য নয়।

বসুমতী স্বামীকে একটু চিন্তিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "এখন এরা থাক, তুমি না হয় একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—"

"না, আমি হেমকে বলে এসেছি, কাল সকালের ট্রেণেই তারা

বাড়ী ফিরে যাবে। না গেলে চৌধুরীমশায় কি মনে করবেন! আমি কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারব না, যে আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর চ্যারিটি বয়।"

পাশের ঘরের খোলা দরজার মধ্য দিয়া সদ্য নিদ্রোত্থিত সুপ্রকাশ অনাবৃত দেহে অসংযত বস্ত্রে উঠিয়া আসিল। তাহার বড় বড় চোখের চঞ্চল কালো তারা ও দীর্ঘ নেত্রপল্লবগুলি ঘুমে জড়াইয়া রহিয়াছে, স্থূল শুভ্র কাঁধের কাছে কালোচুলের গোছা গুলিকেও যেন নিদ্রিত সর্পশিশুর মত দেখাইতেছিল।

"বাবা, দিদি এসেচে? আমি দিদিকে স্বপ্নে দেখছিলুম। ঐ ত দিদি—" বলিতে বলিতে হঠাৎ দিদির উপর দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ-ধ্বনি করিয়া বালক তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নিদ্রা-বিজড়িত কালো চোখ আহ্লাদে উজ্জ্বল করিয়া সাগ্রহে ঈষৎ অভিমান প্রকাশ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদি, চুপি চুপি এলে কেন? আমায় কেন আগে থেকে লিখলে না, ভাই, তাহলে, ত আমি কক্ষনো ঘুমতুম না, নিশ্চয় তোমাকে ইষ্টিসান থেকে নতুন মটরে করে আনতে যেতুম—"

রজনীনাথ আদেশ দিলেন, "সুকু, তুমি এখন দিদির কাছে যেওনা, নিজের বিছানায় যাও—"

চমকিয়া শান্তি তাহার বক্ষলগ্ন স্নেহের ভাইটিকে ছাড়িয়া দিল। সাশ্চর্য্যে বালক দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রজনীনাথের মুখে তখন এমন একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া আদুরে নির্ভীক ছেলে সুপ্রকাশও ভয় পাইল। সেই অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটি

মাত্র প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করিতে সাহস না করিয়া সুকু ছলছল চক্ষে একবার দিদির অশ্রুহীন চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল—দিদির মুখে হাসি নাই, চোখের দৃষ্টি নত, মুখ এমন ম্লান যে সে রকম ম্লান মুখ সে আর কখনও আর কাহারও ইহার পূর্ব্বে দেখে নাই। মৃদু পদে অনিচ্ছুকভাবে সে চলিয়া গেল; কিন্তু পাশের ঘর হইতে তাহার অস্পষ্ট রোদনের ফোঁপানি শব্দ আসিতে কোন বাধা পাইল না। এবার শান্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ তুলিয়া দৃঢ়ভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,"বাবা,আর কারো সঙ্গে আমায় তাহলে লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দেন, না হলে—"

হেমেন্দ্রের সহিত পথে বাহির হইবার সাহস তাহার নাই, এ কথা সে পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। স্বামীকে পিতার চক্ষে মসীবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে কষ্টের চেয়ে লজ্জাই অধিক ছিল। তদ্ভিন্ন সে স্বামীকে এটুকু পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না দেখিয়া তাহার পিতাই বা তাহাকে কি মনে করিবেন? তাই মনের আতঙ্ক স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া, কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে মাথা নীচু করিল।

রজনীনাথ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা কি হয়, হেমও ফিরে যাক। দোষ সত্যি সত্যি ওরই ত, ওকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, তিনি যদি মনে করেন, আমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্চি! কাজ নেই,—দেখ মা, সংসারে অনেকখানি ভেবে চলতে হয়—"

"জামাই বাবু বলচেন যেতে হয় ত এই চারটের টেরেণে যাওয়াই সুবিধে।" বলিতে বলিতে মোক্ষদা গৃহে প্রবেশ করিল।

বসুমতী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওমা, সে আবার

কি কথা! যেতে হয় বিকেলে যাবে, এই রাত্তিরে না খাওয়া, না ঘুমনো, এখন কোথায় যাবে? যা ত রে মুখি, শিগ্‌গির করে তোলা উননটা ধরিয়ে চাট্টি ময়দা মাখগে, বলাইকে বলগে বিছানা টিছানা ঠিক করে দিক। বামুনদি না উঠে থাকে ত আর ওঠাতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে খাবার করে দিচ্ছি, দেখিস, বাছা দেরি যেন না হয়। কপির একটা ডান্‌লা আর খানকতক আলু বেগুন ভাজা কুটিস, আর কিছু কাজ নেই, দেরি হয়ে যাবে।"

মোক্ষদা চলিয়া গেল ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু বল্লেন এই ভোর রাত্তিরে কি খাওয়া যায়, মাকে ওসব করতে বারণ কর। এই টেরেণে যেতেই হবে, আবার কাল না হোক পরশু তিনি এইখানেই ত আসচেন, দেরি হলে মিথ্যে একটা লোক জানাজানি হবে বৈত নয়।"

জামাতার সুমতি দেখিয়া রজনীনাথের মুখের কঠিন ভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। হেমেন্দ্র তবে নিজের অন্যায়টা বুঝিতে পারিয়াছে! শান্তির একটু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তবে সেই ভাল, দেরি করে তাহলে আর কাজ নেই শান্তি, এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে না দেখি। আর ভুলে যেওনা, তোমার শ্বশুর শুধু তোমার শ্বশুর নন, তোমার পিতার অন্নদাতা।"

শান্তি মাটিতে পিতামাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বসুমতী তাহাকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন, রজনীনাথ মুখ ফিরাইয়া, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটের পিছনের জানালাটা খুলিবার জন্য চ'লয়া গেলেন। মাহুত যেমন করিয়া অনিচ্ছুক হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে ফিরায়, প্রবল

ইচ্ছাকে তেমনই করিয়া রোধ করিতে হইল। শান্তি মায়ের বুকে একবার মাথা রাখিয়া এক মুহূর্ত্তকাল স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে মায়ের স্নেহ-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সকাল বেলাকার ম্লান শুকতারা যেমন তাহার সব জ্যোতিটুকু একেবারে ঊষার নবীন কিরণালোকের মধ্যে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া ঘননীলিমার মাঝখানে নিঃশব্দে মিলাইয়া যায় তেমনই করিয়া নীরবে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার চোখে তখন আর জলের রেখাটুকু দেখা যাইতেছিল না। স্থির প্রতিজ্ঞার একটি দৃঢ়তা সে যেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার মৌন আশীর্ব্বাদস্বরূপ সেই মুহূর্ত্তে লাভ করিয়াছিল, বেদনা ও লজ্জার বিফলতা দূরে ফেলিয়া সে স্থির পদে ফিরিয়া গেল।

বসুমতী দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “তখনই আমি বলেছিলুম, ওখানে শান্তির বিয়ে দিওনা, তাত তুমি শুনলে না। এমন করেই মেয়েকে আমার ঐ হেমই দেখচি খুন করবে। মাগো, বাছা আমার এমন গোঁয়ারের হাতেও পড়ল।”

মোক্ষদা দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চুপে চুপে সাবধান করিয়া দিল, “চুপ কর মা, জামাইবাবু বাইরে রয়েচেন।”

২৮

শরীর ভাল নাই বলিয়া বসুমতী পরদিন স্নানের পর নিজের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মোক্ষদা আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ধমক খাইয়া গিয়াছে, আর কেহ ডাকিতে সাহস করে নাই। সুপ্রকাশ সকালে উঠিয়া, দিদি চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া

পর্য্যন্ত, এমনই হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিয়াছে যে কেহ তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। দিদি যে তাহার চেয়ে হেমবাবুকেই বেশি ভালবাসে সে বিষয়ে আজ সে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছে এবং আর কখনও সে দিদির কথায় বিশ্বাস করিবে না, এ বিষয়ে সে সরকারমহাশয় হইতে রজনীনাথ পর্য্যন্ত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল।

ভারতের মানচিত্রে কোন একটি নগরের অস্তিত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে সেদিন অত্যন্ত মনোমালিন্য চলিতেছিল। ছাত্র জলভরা চোখ ও কম্পিত অধরে ভৃত্যের দ্বারা আনীত হইয়া ঘরে ঢুকিবা-মাত্র মাষ্টারমশায় তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া একেবারে ম্যাপ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা সৃষ্টিছাড়া অনাবশ্যক দেশের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ দিলেন। এ বিষয়ে তাহার অনুরাগের কথা জানা ছিল বলিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাইবার জন্য এই ফন্দি আঁটিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে আজ হিতে বিপরীত হইল। কলম্বস যখন প্রথম আমেরিকার উপকূলে দাঁড়াইয়া নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহার যে প্রকার মনোভাব হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের ভূগোল চিত্র হইতে ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপান নূতন নূতন দেশের নাম আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকমই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। কিন্তু আজ তাহার সে মনের অবস্থা নাই। দুইএকবার চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে রাগিয়া গেল, পুস্তক হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া গম্ভীর মুখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, মাষ্টার তাহাকে চিনিতেন,—বুঝিলেন, বিপদ সামান্য নয়।

নূতন কাপড় জামায় সাজিয়া বিনোদ স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ গোঁ ভাবে দাঁড়াইল। ভুবনমোহিনী মুহুর্মুহু চোখ মুছিতেছিলেন, তথাপি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাগ হলো কেন, বাবা?"

বিনোদ মাথা তুলিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমি ইস্কুলে যাবো না—"

"ছি, ও কথা বলতে নেই! ইস্কুলে না গেলে কি বিদ্যে হয়, বাবা? তুমি যে বলেছ, বিদ্বান হবে।"

বিনোদ কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল, "সেখানে যে তুমি থাকবে না—আমার যদি ভাল না লাগে, আমি তখন কি করব?"

ভুবনমোহিনীর কণ্ঠ এবার রুদ্ধ হইয়া আসিল; ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়া তিনি কহিলেন, "মনে করো, তোমার মা তোমার পাশেই বসে আছেন! দেবতারা স্বর্গে থাকেন, তাঁদের তো কেউ দেখতে পায় না, তবু তো তাঁরা রাগ কর্বেন বলে লোকে পাপ করতে ভয় পায়! তোমার মাকে তুমি খুব ভালবাস, যেখানেই যাও মনে করো, মা সব দেখতে পাচ্ছেন, অন্যায় দেখলে, অমনোযোগ দেখলে মার দুঃখ হবে।"

বিনোদ মাকে প্রণাম করিয়া চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

এখন আর সে মা নাই, স্কুল হইতে ফিরিলেই ব্যাকুল আগ্রহে কেহ বুকে টানিয়া লয় না! বাড়িতে ফিরিবার জন্য সে আগ্রহই বা আর কোথায়? বিনোদ প্রথমে ভাবিয়াছিল, পড়া ছাড়িয়া বিছানায় চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে, সে আর পড়াশুনা করিবে, কাহার জন্য? কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মা বলিয়াছিলেন, যেখানেই থাকুক, মাকে যেন মনের মধ্যে

রজনীনাথের জুতার শব্দে স্তুকু অন্য দিন শান্তমূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসে—আজও একবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের উত্তেজিত স্বর বিমনা রজনীনাথকে অনেকক্ষণ পরে যখন সে ঘরে টানিয়া আনিল, তখনও তাঁহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। রজনীনাথ কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন না, পুত্রের কাছে আসিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বাম হস্তে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া একবার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্তুকুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, চোখের জল এতক্ষণ জিদ করিয়া সে চাপিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর সে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্তুকুর আজ শরীর ভাল নেই, অবাধ্যতার জন্য আপনাকে প্রণাম করে মাপ চাইলে কি ওকে আজ ছুটী দেবেন ?"

মাষ্টার চলিয়া গেলে গভীর স্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া রজনীনাথ তাহার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি স্নেহ ঢালিয়া চুম্বন করিলেন। বালক সেদিনকার অপরাধের সামান্য শাস্তির পরেই এতখানি আদরের মর্ম্ম ঠিক তাঁহার সজল গম্ভীর মুখে খুঁজিয়া না পাইলেও আপনা আপনি তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল। পিতার প্রতি অভিমান ভুলিয়া গিয়া তাঁহার উপর কেমন যেন একটা প্রবল সহানুভূতি আসিয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল, "বাবা কেন আজ এমন করে চাইচেন, বোধ হয়, বাবাও মনে

করচেন দিদি এখন বাবাকে সে রকম ভালবাসে না। দিদি কেন এমন হ'ল!"

রজনীনাথ অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিঃশব্দে দিনরাত্রি কাটিয়া গেল। তারপর আরও একটা দিন আসিল এবং চলিয়া গেল। ডাকের পিয়নটা দুইতিন দফায় সংবাদপত্র ও চিঠিতে রজনীনাথের পড়িবার ঘরের বড় টেবিলটা ভরাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু কোন একখানাতেও প্রত্যাশিত অক্ষরের ছাপ নজরে পড়িল না। সংসারটা কেবলই কার্য্যের জন্য সৃষ্ট, মনের কোন অবস্থাতেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, রজনীনাথ সমাগত মক্কেলদের কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। অনেকটা সময় তাহাদের সহিত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় কাটিবার পর তাহারা বিদায় লইলে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িবার ঘরে আসিয়া তিনি মোটামোটা আইনের বই খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু যতই অধিক আগ্রহের সহিত সেগুলাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, তাহাদের মধ্যকার ছাপার অক্ষরগুলা ততই তাঁহার মনের মধ্যে দুর্ব্বোধ ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পিনালকোডের ধারার উপর একখানা সকরুণ মুখচ্ছবি কেবলই অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখের নেগেটিভখানা যে তাঁহারই বুকের মাঝখানে বসান রহিয়াছে! বর্ষাধৌত জুঁইফুলের মত অশ্রুজলে অস্পষ্ট সে সুন্দর ক্ষুদ্র মুখখানা যে তাঁহারই আদরিণী অপরাধিনী কন্যার! পিতার পক্ষে আত্মদমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

২৯

সেদিনও মেঘধূম্র আকাশ জলভারের গৌরবে বজ্র বিদ্যুৎ বক্ষে বহিয়া আনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। নদীর এপার ওপার

যে যে স্থানগুলায় আকাশখানা হেলিয়া পড়িয়া সবুজ গাছের মাথাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, সে সকল স্থানে সর্ব্বত্রই যেন কালী ঢালা। কালো আকাশের নীচে সবুজ গাছের শ্রেণী আবার সেই সবুজ ঝোপের মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা গাছ রাঙ্গা ছাতিম ফুলে ভরা, কোথাও বা গোটাকতক কদম্ব ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে বক চিল ও অন্যান্য পাখীগুলা ঝাঁক বাঁধিয়া উচ্চ আকাশের কোল দিয়া কৃষ্ণ তারকা-শ্রেণীর মত ক্ষুদ্রাকারে উড়িয়া যাইতেছিল, কেবল কাকগুলা তখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত গাছের ডালে ও প্রাচীরের ধারে বসিয়া স্বর অভ্যাস করিতেছিল। আসন্ন বিপদের ভাবনায় বর্ত্তমানকে তাহারা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে।

জানালার নিকটে আরাম কেদারাখানায় পড়িয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটে একটা ছোট টেবিলের উপর চশমার খাপ ও একখানা বাংলা সংবাদপত্র পড়িয়া রহিয়াছে; সেখানার এখনও ভাঁজ খোলা হয় নাই। একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে ও বাহিরের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম বাধিয়া ছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা শ্যামাকান্তের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিল। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা ও অকৃত কার্য্যের ফলভোগ তাঁহার পক্ষে এখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের দৃঢ়তা যে বহুপূর্ব্বেই গিয়াছে,—কেমন করিয়া এত বড় বড় আঘাতগুলা সহ্য করিয়া চারিদিককার বিরোধকে শান্ত ও সমঞ্জস করিয়া চালাইয়া যাইবেন সে কথা মনে করিবার মত বলও ত সেই চিন্তাজীর্ণ বক্ষের ভিতর নাই। অবসাদের ক্লান্তিতে শুভ্র মস্তক

ভার হইয়া আসে, স্তিমিত চক্ষু কেবল মুদিয়া আসিতে থাকে। উপায় ও চেষ্টা মনের মধ্যে ধরা দেয় না। তবে একটা আশা তিনি কোন সময়ই ছাড়িতে পারেন না, তাই মনের এমন সঙ্কট অবস্থাতেও নিকটবর্ত্তী সমস্যাটার অপেক্ষা দূরস্থ সঙ্কটের কথাই তাঁহার মনে লৌহদণ্ডের মত আঘাত করে। বেদনা অপেক্ষা সময়ে সময়ে এই প্রলেপের জ্বালা আরও ভয়ানক। মনের এ অবস্থাকে ছাড়াইয়া চলিবার আর যেন কোন দিক দিয়া পথ পাওয়া যাইতেছিল না। চারিদিক হইতে সব দ্বারগুলা একে একে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, অন্ধকার ক্রমে ঘন ও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র শুকতারাটি আপনার সবটুকু স্নিগ্ধ আলোক ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সেটিও সহসা এই নিবিড় অন্ধকাররাশির মধ্যে বিন্দুর মত লুপ্ত হইয়া গেল। এখন এই গভীরতম অন্ধকারে এই চারিদিককার রুদ্ধদ্বার দুর্গকারার নির্জ্জন পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকে কে হাত ধরিয়া পথ চিনাইয়া এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে? অন্ধকারে ভীত বালক যেমন নির্ভরতার সহিত মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে ঢাকিতে চায়, তেমন করিয়াই শ্যামাকান্ত ব্যাকুলভাবে মা বলিয়া একখানি স্নেহ-বক্ষের ছায়াতলে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া স্বপ্ন দৃষ্টের মত চমকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হারে মাতৃহারা! আজ সে কোথায়? কোথা মা, কোথা মা, মাগো তুই ফিরে আয়!

শ্যামাকান্ত সবচেয়ে আপনাকেই বেশি তিরস্কার করিতেছিলেন। যে সময় পূর্ব্বকালের লোকেরা সংসারাশ্রমকে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ডের মত অনায়াস অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ-অবলম্বন

করিয়া পারলৌকিক চিন্তায় মনঃসংযোগ করিতেন,—তিনি কিনা ঠিক সেই সময় একটি শিশুর স্নেহে অন্ধ হইয়া তাহাকে কোলে পাইবার জন্য কোন একটা উপায় খুঁজিয়া উন্মাদের মত বেড়াইতেছেন! তাঁহার কি একথাও ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁহার খেয়ালের দায় তিনি যাহাকে কাছে টানিতেছেন, তাহার জীবন কেবলমাত্র তাঁহাকে খেলার সুখ দান করিবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই। রেশম সোনা ও হীরায় সাজাইয়া কাচের দেরাজে রাখাতেই তাহার জীবনের চরম সুখ ও পরিণতি নয়। এখন তাঁহার ঘরের দুষ্ট শিশু যদি তাঁহাকে ঠেলিয়া তাঁহার সে যত্নের প্রতিমা সিংহাসনচ্যুত করিয়া ডাকের সাজ খুলিয়া কাদামাটি মাখাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিবেন? যে মূর্ত্তি-উপাসক নয়, তাহার সাক্ষাতে দেবতার স্থাপনা করিতে যাওয়াই যে প্রথমে বিড়ম্বনা হইয়াছিল! যে প্রতিমার সাধক, মহাশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি সে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পায়, অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সে মাটি ও খড়ের জড় শরীর লইয়া প্রকাশ পায় মাত্র, চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূতা হয় না। এই সোজা কথাটা বুঝিতেই কি সবচেয়ে দেরি হইল! রজনীনাথের মেয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহা লইয়া খুসী থাকিলেই ত চলিতে পারিত। মানসমন্দিরেই ত দেবী পূজার ফল অধিক। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"কাট খড় আর মাটির গঠন কাজ কি রে তোর সে গঠনে,
আয় মনোময়ী প্রতিমা গড়ি পূজা করি সঙ্গোপনে"।

সেদিন শ্যামাকান্তের বিশ্রাম অবসর হ্রস্ব হইয়া পড়িল, ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানাইল, "বাবু এসেচেন।"

"কে বাবু ?" এই প্রশ্ন উঠিবার পূর্ব্বেই রজনীনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"একি রজনী! আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাকান্ত উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এসো, এসো, আমি তোমার কাছেই লোক পাঠাব ভাবছিলুম। বসো, সব ভালতো ?" শেষের স্বরটা কাঁপিয়া আসিল।

রজনীনাথ বেহাইকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের দেওয়া কেদারাখানা শ্যামাকান্তের আসনের দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিতে বসিতে উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে সব এক রকম চলচে—"

মানুষ খুব বেশিরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিলে প্রথম যে মুহূর্ত্তে সেটাকে অবাস্তব বলিয়া জানিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে প্রাণে যে রকম একটা গভীর শান্তি ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়া উঠে, রজনীনাথের আগমনে শ্যামাকান্তও ঠিক সেইরূপ একটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার ব্যথাটা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, মন্ত্র চিকিৎসার অব্যর্থ প্রয়োগের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত হইয়া গিয়া শরীরে যেন নূতন আশা ও বলের সৃষ্টি করিল। পরিত্যক্ত আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কেউ এসেছে ?"

রজনীনাথ শ্যামাকান্তের মুখে পাণ্ডুতা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন, "না, মেঘ করল, সেজন্য একাই এলেম, আপনি ভাল আছেন ত ?"

হতাশভাবে শ্যামাকান্ত কেদারার পৃষ্ঠে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া

অধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আর ভাল, মৃত্যু ভুলে রয়েছে, তাই বেঁচে থাকা,—না হলে মরণের সময় ত হয়েছে।"

এই কথা কয়টা রজনীনাথকে এমন প্রবলভাবে আঘাত করিল যে, তিনি ব্যথিত ও লজ্জিত মস্তক নীরবে হেঁট করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত আর কোন কথা কহিলেন না, রজনীনাথও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, বক্তব্য বিষয়টিকে বেশ করিয়া গুছাইয়া সহজ করিয়া লইতে আজ তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব ঘটিতেছিল।

ক্রমে স্তব্ধ গাছপালা দোলাইয়া, নাড়া দিয়া একটা সর্ সর্ শব্দ উঠিল ও কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। তখনও ঝাঁক বাঁধিয়া পাখীগুলা ওপারের আশ্রয়াভিমুখে নদীর উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। এপারের ছায়াময় ঘাটের পথে পল্লীবধূগণের মল ও চুড়ির শব্দ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্কোচকুণ্ঠিতভাবে রজনীনাথ সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি বোধ হয় তাদের ক্ষমা করেছেন? সে এরকম ব্যবহার করবে তা—"

শ্যামাকান্ত প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের ক্ষমা করেছি?"

আবার রজনীনাথ ইতস্তত করিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, "যারা আপনার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী।—হেম বড় অন্যায় করেছে, কিন্তু তার চেয়ে—"

যে নামটা তাঁহার জিহ্বা অপরাধী শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত করিতে জড়াইয়া আসিতেছিল, সেটা তাঁহার জোর করিয়া উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হইল না। শ্যামাকান্ত বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা,

—আমি ত রাগ করিনি, ক্ষমা কিসের জন্য? বরং ধরতে গেলে তার কাছে আমিই অপরাধী—”

বৃদ্ধ যেন ধরা ছোঁয়া দিতে রাজি নহেন, রজনীনাথ হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই সময় বড়রকম একটা ঝড়ো হাওয়া উঠিয়া ঘরের কাগজ-পত্র উলট পালট করিয়া দিয়া রজনীনাথকে একটা কাজ আনিয়া দিল ও পরক্ষণে গর্জ্জন শব্দে মেঘ ডাকিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে জানালা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল। ফিরিবার সময় রজনীনাথ একখানা সংবাদপত্র টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কিন্তু শোকাতুর বৃদ্ধের অভিমানাহত চিত্তের রুদ্ধ হতাশা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভিতরে আঘাত করিতে ছাড়িল না।

সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিবানী ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে নদীর উপরকার জানালাটার কাছে বসিয়া ছিল। এখানে অমূল্যর কোন ভারই তাহাকে লইতে হয় না, দাসী চাকর ও আত্মীয় আশ্রিতদের কোলে কোলে ঘুরিতেই তাহার মাটিতে পা দিবার সময় থাকে না। শিবানীর হাতে কোন বিশেষ একটা কাজও নাই। সংসারের ছোট বড় শত কার্য্য শত দিকে ছড়ান রহিয়াছে। কত দিকে কত বিশৃঙ্খলা, কত অপব্যয়, কিন্তু তাহার জন্য একটিও কাজ খালি ছিল না। সে যে কাজে হাত দিতে যায়, চারিদিক হইতে মাসী পিসি দিদির দল বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে এবং শুষ্কচক্ষে জল আনিয়া জিভ কাটিয়া কান্নার সুরে বিনাইয়া বলিতে থাকে, “ওমা, তুমি কি দুঃখে

কুটনা কুটবে মা ? ওমা, আমার বিন্দু বৌ, আমি থাকতে, পান সেজে হাত ময়লা করবে আর আমি তাই পোড়া চক্ষে বসে দেখব ? ও আমার অভাগ্যির দশা !" শিবানীর আর কাজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। এমন করিয়া কোন একটা জায়গায় সে আপনার বিপর্য্যস্ত হৃদয়কে আবদ্ধ করিবার অবসর বা সাহায্য পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। যেটাকে সে কাছে টানিতে যায়, সেইটাই যেন নদীস্রোতের বিপরীত মুখে চলিয়া গিয়া তাহার দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। কাজের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিয়া যে একটি আত্মতৃপ্তি সে এতদিন বরাবর উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল, পূর্ব্বের কর্ম্মশ্রান্ত শরীরের পক্ষে মধ্যাহ্ন ও রজনীর বিরাম অবসরটুকু বেদনায়, কল্পনায়, প্রতীক্ষায় ও নিরাশায় যেমন একটি বাঞ্চনার বিষয় ছিল, সেটুকু তাহার এই নূতন অবস্থা জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধনহীন দীর্ঘাবকাশের স্মৃতির দাহের কাছে সেই স্বল্পাবসরের চিন্তাটুকু কত লোভনীয়, শিবানী এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল।

বৃষ্টি থামার পর তখন মেঘ কাটিয়া যাইতেছে। মহাজনী নৌকা ইট ও খড় বোঝাই লইয়া অনিচ্ছুক গতিতে ও খেয়ার নৌকা দ্রুতগমনে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। তাহাদের দাঁড়ের উত্থানপতনের শব্দ ও তটপ্রান্তে নিপতিত ভগ্নতরঙ্গের অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত গৃহস্থ-গৃহের সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার বাতাস নদীতীরের বাঁধা ঘাট হইতে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিল। সেই সাড়ায় চমকিয়া শিবানী একবার

মুখ তুলিল, সম্মুখের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে আঁটা বিনোদ কুমারের অপরিচিত বালক মূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া আসিয়াছে। হাঁফ ছাড়িয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। এখন আর সন্ধ্যা তাহাকে চকিত করিয়া প্রদীপের কাছে টানিয়া আনে না, সন্ধ্যাশঙ্খ অভিমানে মৌন পড়িয়া থাকে।

এমন সময়ে দীপহস্তে সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি বাবা, এমন ধারা কিন্তু আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখন দেখেনি! মিনসে কোন মুখ নিয়ে আবার ওকালতি করতে এল?"

শিবানী যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মা?"

কন্যার এই অনুসন্ধিৎসায় সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ খুব উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নভাবে কহিলেন, "হেমার শ্বশুর মিন্‌সে এসেচে যে, তা জানিস্‌নে? সেই অবধি বেইএর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নামটি পর্য্যন্ত নেই। কি যে সলাচ্চেন কলাচ্চেন, তা কেষ্ট জানেন। একে ত বুড়র তাদের উপরেই সাতটা প্রাণ—আমার গুঁড়োটুকু যেন ওর—"

শিবানী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মুহূর্ত্তে ফিরিয়া বলিল, "তিনি কি একলা এসেচেন মা?"

সিদ্ধেশ্বরী সাদা পাথরের টেবিলে তৈলদীপটা নামাইয়া রাখিয়া একটু মুখ বাঁকাইয়া অপ্রসন্ন সুরে উত্তর করিলেন, "আপাতক একলাই বটে, তা বেশিক্ষণ আর একলা থাকচে না। মিনসে আমাদের শত্রু ছিল, তা দেখ্‌ মা শিবু, একটা কাজ কর দেখিন্, সকল দিকেই ভাল হবে। তোর শ্বশুরকে বল্‌

রাখে! তাহার অন্যায় অমনোযোগে মাকে বেদনা দেয় যদি? না! মার কাছে সে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা পালন করিতেই হইবে, বিদ্বান হইতেই হইবে!

শ্যামাকান্ত দেখিলেন, পুত্র পড়াশুনায় বেশ উন্নতি করিতেছে বটে; কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধির ধার দিয়া সে একেবারেই চলিতে শিখিতেছে না। সে গরীব প্রজাদের ঘরে ঘরে তাঁতি জোলাদের সঙ্গে ঘুরিয়া তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ায়, পাইক-পেয়াদার দ্বারা খাজনা আদায় করিতে দেখিলে নায়েবের কাছে গিয়া তীব্র প্রতিবাদ করে, অনেক সময় নিজের টাকা দিয়া প্রজাদিগের বাকি খাজনা শোধ দিয়া তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা রাখে না! তাহার উপর আবার আবার যাহাকে-তাহাকে দান করা, ধার দেওয়া রোগগুলিও রীতিমত বাড়িয়া উঠিতেছিল! বিষয়ী লোক শ্যামাকান্ত প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার চিরদিনের সাধ যে তাঁহার পুত্র তাঁহারই মত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, বেশির ভাগ সে তাঁহাপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর হইয়া তাঁহার ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া লইবে। দেওয়ান বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তবেই তো! ও সব ইংরেজী পড়ার গরম যে! ইংরেজী পড়লে মাথাতো ঠিক থাকবেই না! তবে যার যেদিকে বুদ্ধিটা যায়! ছোট বাবু কালই বলছিলেন, এবার কলকেতায় পড়তে যাবেন, তাহলে ত একেবারেই দেখছি, সর্ব্বনাশ!"

শ্যামাকান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কে তাকে কলকেতায় পড়তে যেতে দিচ্চে! তুমিও যেমন!"

বিনোদ আসিয়া বলিল, "আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তে চাই—"

শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না বাপু, সে সব হবে

আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারব না— থাকতে হয়, ওরা অন্য কোথাও থাকুক—"

দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়, শিবানীর মুখ তেমনই মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া আসিল। সে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া বক্ষের আঘাতটা সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। মার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, "না।" তাহার মুখের উপর ঘন লাল রংয়ের একটা তপ্ত শোণিতের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, দীপের আলোকে সিদ্ধেশ্বরীর নিকট তাহা অগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া গেলেও হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন, অথচ কন্যার এই আসন্ন ঝড়ের মত স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে তাহার জিদের বিরুদ্ধে লওয়াতে চেষ্টা করা যে কতখানি অসাধ্য ব্যাপার তাহা বুঝিলেন। তাহা যে না জানা ছিল, এমন নয়! তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই, আজ তাহাই ঘটিল। এক মুহূর্ত্ত পরেই শিবানীর মুখের রং বদলাইয়া গেল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রজনীবাবুর খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে ত মা, তাঁকে বোধ হয় খাওয়ান হয়নি?"

"কে জানে, বাছা, আমার অত সাতকুটুমের খবর রাখবার অবসর নেই, যাদের রস পড়েচে, তারা করুক গিয়ে। আমি নিজের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরচি—নেহাৎই সন্ধ্যাবেলায় 'বাড়ি বন্ধনের' তুকটি না করলে নয়, তাই এই শরীর নিয়েও মরতে মরতে আসি। বলি, কোন দিন আবার চোর

ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নে যাবে।—থাকগে—যদ্দিন আছি কেউ বুঝুক, না বুঝুক, আমার কর্ম্ম ত আমি করি,—তারপর যার কপালের যা লেখন আছে, সে তা ভুগবে। হরি হে দীনবন্ধু!"

সিদ্ধেশ্বরী গলায় অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নদীতীরস্থা সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেখিলেন, শিবানী চলিয়া যাইতেছে। এক মুহূর্ত্তে সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের তলা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। 'হতভাগা মেয়ে তাঁহার একটা পরামর্শ লইবে না। আবার উল্‌টিয়া যেন বিশেষ করিয়াই তাঁহার শত্রু পক্ষের সঙ্গেই মেলা মেশা আদর আপ্যায়ন করিবে? এ পেটের শত্রুই তাঁহার সব চেয়ে যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। এক বাপু, বুঝি, যদি নিজের ভাল মন্দ নিজে দেখে। তা যখন পারবে না, তখন মায়ের চেয়ে ত আর কেউ সংসারে আপন হবে না! তা সেই মাকেই তোর লাভ লোকসান ভাববার ভার দিয়ে যা বলি তা চুপ করে মেনে যা—তা নয়! যেটিতে নিজের ক্ষতি হবে, সেইটিই যেন খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসবে?' প্রকাশ্যে বিরক্তকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন্ শিবানী! তোর ভাল যদি চাস্ এখনও বুঝে চল্, ওদের এ বাড়ীতে ঢোকবার পথ বন্ধ কর্। না হলে এখানে তোর জায়গা হবে না, তা কিন্তু আমি এই দিব্যি করে বলে দিলুম,—দেখে নিস্—"

শিবানী যাইতে যাইতে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কঠিন স্বরে বলিল, "নাই বা হোল, আমি এ বাড়ীতে জায়গা চাইনে!"

আজন্ম ধরিয়া তাহাকে চিনিয়া আসিলেও শিবানীর আজিকার এই কয়টা কথায় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত চমকিত হইলেন। এই বাড়ী, এই দাসী চাকর, এই বাগান বাগিচা, সোনাদানা, রাজ-ঐশ্বর্য্য,—সে এ সব চাহে না? বলে কি শিবানী? সে পাগল হইয়াছে! বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি কি তুই তাদের জন্যে পেটের ছেলেটাকে শুদ্ধ ফাঁকি দিতে চাস্ নাকি?" সংসারে যে এ রকম অনাসৃষ্টি-বুদ্ধি থাকিতে পারে, সে কথা যেন তিনি তাঁহার এই এতখানি বয়সের মধ্যে আজ প্রথম জানিতে পারিলেন।

শিবানী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

সিদ্ধেশ্বরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত দিলেন। এ মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

মুখে যতখানি দেখাক্ ভিতরে ভিতরে শত্রু-নিপাতে যে সেও খুসী না হইয়া থাকিতে পারে নাই এমন বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বরী এতদিন নিঃসন্দেহরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাঁহার সংশয় দূর হইল। সে যে জুয়াচোর রজনীনাথের জালে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া একেবারে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, এই বাড়ী, এই ঘর, সমুদয় চুলচেরা করিয়া তাহার অসহায় দুধের শিশুর সহিত ভাগ করিয়া লইয়া পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র এখানে আসিয়া বসিবে, তাহা তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। আর তখন যে সে একদিন

কোন ছুতায় শিশুকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার গলাটি টিপিয়া মারিয়া আম-বাগানে ঐ ভাঙ্গা পাতকুয়াটার মধ্যে ফেলিয়া দিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর যদি বা তাহা নাও করে তবু এই কাঁড়ি কাঁড়ি পিতলকাঁসার বাসন, সিন্দুক সিন্দুক সাল দোসালা, সোনারূপার বস্তা এসবই ত তাঁহার নিকট হইতে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ছিনাইয়া লইবে! এমন কি, রান্নাঘরের পিঁড়িগুলি পর্য্যন্ত ভাগের হাত এড়াইতে পারিবে না! এ অত্যাচার অসহ্য! হে ঠাকুর! যে হতভাগারা বিনা অপরাধে এমন করিয়া তাঁহার গরু মারিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাদের কি কখনও ভাল হওয়া উচিত? না, ভাল হইবে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগে গস গস করিতে করিতে নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শিবানী রান্নাঘরে গিয়া কাহারও নিষেধ না মানিয়া নিজের হাতে মাছের কালিয়া রাঁধিতে বসিয়া গিয়াছে। মাসিমা কহিলেন, "এত করে বারণ করলুম, কিছুতেই বৌমা শুনলেন না। দেখদেখি কি রকম সাহস—এই গরম!"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল, ঝঙ্কার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মরুকগে, পোড়া মেয়ে যাদের বাঁদিগিরি করতে জন্মেচেন তাদের সেবা করে মরুন। নেহাৎ মায়ের প্রাণ তাই ওর জন্যে শরীর পাত করে মরি,—থাকতে পারিনে তাই বলি,—কুপুত্তুর হলেও ত কুমাতা হবার যো নেই,—তা অধপ্পি মেয়েটা একবার সেটা ভাবে?"

মাসিমা হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে একটু সহানু-ভূতির স্বরে কহিলেন, "ও কথা আর বল কেন বোন, ঐ দুঃখেই

মরে আছি! আমার মনটা বড়ই নরম কিনা, কারু কষ্ট দেখলে চোখের জল সামলাতে পারিনে। ওইযে কথায় বলে, "আপন দুঃখ অসম্বরি, পরের দুঃখ সইতে নারি"—আমার হয়েচে ঠিক তাই। তা বোন ভাল কথা, আমায় আজ তোমার সেই জলপড়াটি শিখিয়ে দাও না ভাই। বিধুর ছোট মেয়েটা বিকেল থেকে পেট কামড়ে খুন হয়ে যাচ্চে। অমন গুণ ত কোন জ্যান্ত ওষুধেরও দেখতে পাইনে! সেদিন কেষ্টা ছোঁড়াটার কি কান্নাই থামিয়ে দিলে!"

সিদ্ধেশ্বরীর মনের অবস্থা তখন মন্ত্রদানের ঠিক উপযোগী না থাকিলেও মন্ত্রমাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার মনটা হঠাৎ গলিয়া পড়িল। খুসী হইয়া তিনি কহিলেন, "তা তোমায় শেখাতে পারি, বোন। কিন্তু যেন দু'কান না হয়ে যায়, তাহলে আর ওতে কাজ হবে না। এ মন্তর কি অমনি পেয়েচি! আমার পিস শাশুড়ির ননদের যা কত সাধ্যি সাধনায় তবে মরবার সময় আমায় দিয়ে গেছে! এ আর কেউ জানে না, এই তুমিই যা আজ শুনে নিলে। শোন বলি তবে, কানের কাছে চুপি চুপি বলতে হবে কেউ কোথা দিয়ে না শুনে ফেলে—

রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্ধ্যের পথে;
সাথে নিলেন হনুমান আর সুগ্রীব মিতে;
সুগ্রীব বলেন, মিতে আমি মন্তর এক জানি,
পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।

তিনবার মন্তর বলে জলে তিনটি ফুঁ দিয়ে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে। এ অব্যর্থ বোন অব্যর্থ।"

৩০

কোন একটা কাজ করিব মনে করিবামাত্রই তাহা করিয়া বসা শিবানীর পক্ষে বড় সহজ নহে। মনের একটা আকস্মিক উত্তেজনার বশে সে প্রথমে যে পথটাকে অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে,সেটাকে যত সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিল, ক্রমেই প্রথমকার আগ্রহ যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, ততই ইহার ভিতরকার সঙ্কটটুকু তাহার মনের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের গতিকে দ্রুত ও কপালটিকে ঘর্ম্মের বিন্দুতে নববধূর সিঁথির মুক্তাবলীর মত করিয়া সাজাইয়া তুলিল।

কিন্তু কাজ শেষ করিয়া যখন সে হাত ধুইল তখন সেই চিরদিনের স্থৈর্য্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তাহার বদ্ধ ওষ্ঠে নীরবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ধীরপদে সে বাহিরে আসিয়া এক জন দাসীকে ডাকিয়া বাহিরে খবর পাঠাইয়া দিয়া স্থিরচিত্তে বসিয়া থালায় খাবার সাজাইতে লাগিল।

জলখাবারের আসনের কাছে দাঁড়াইয়া রজনীনাথ যখন একবার প্রত্যাশাপূর্ণ উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখন সে ঘরের চারিদিককার অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই এক হাতে একটা পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া জল ও অপর হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া শিবানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রজনীনাথ সস্নেহে তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া আসনের উপর বসিলেন। যেখানটাকে মরুভূমি ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহের আতঙ্ক জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেটা যদি হঠাৎ নদীতীরের বালুকা বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহা

হইলে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাঁহারও সেই রূপ একটা নিশ্বাস বাহির হইল। শিবানী জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া রজনীনাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। ছেলেও মায়ের দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠুকিয়া একটা দীর্ঘ ছন্দের প্রণাম করিয়া অভ্যাসমত এই অপরিচিতের সম্মুখে চুম্বনের দাবীতে মুখ বাড়াইয়া দিল। প্রণাম-প্রাপ্তির পর চুম্বন প্রত্যর্পণ যে একটা অকাট্য রীতি সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হাসিয়া রজনীনাথ বিনোদের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাহার মুখের ধরণ, গায়ের রঙ, চোখের দীপ্তি তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া আবার একটা নিশ্বাস বহন করিয়া আনিল। কিছুই ফুরায় না, পুরাতন নূতন হইয়া দেখা দেয় মাত্র। নিজের বেকাব হইতে ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া শিশুকে বশ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ন্যায়পরায়ণ হাকিমের মত শিশু সে ঘুষের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া নিজের পাওনামাত্র মিটাইয়া লইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। রজনীনাথও তখন ভাল করিয়া সেই দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। এ কি! তপস্যা পরায়ণা উমার জীবন্ত যোগিনী মূর্ত্তি কোন সুনিপুণ চিত্রকর কি এখানে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? এই কি বিনোদ কুমারের অনাদৃতা পত্নী! রজনীনাথ অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। বিনোদকে তিনি জানিতেন। শুধু তাহার বাহিরটা নয়, তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সহিতও তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। তাই তাঁহার কল্পনায় যে ঈষৎ স্থূলাঙ্গী গৌরবর্ণা লজ্জা-সঙ্কুচিতা অশ্রুম্লানা নারীমূর্ত্তি কোন্ এক অজ্ঞাত সময়ে আপনা হইতে চিত্রিত হইয়া গিয়াছিল—এখন অত্যন্ত অতর্কিতভাবে এই রমণী

তাহাকে ধিক্কারের সহিত :বিদুরিত করিয়া সেইখানে ফুটিয়া উঠিল। অবিচার করিয়া কাহারও দণ্ড বিধান করিবার পর তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলে বিচারক যেমন একটা উৎকট আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া থাকেন, এই স্বামী পরিত্যক্তা রমণীর দিকে চাহিয়া রজনীনাথ তেমনই অনুশোচনায় মাথা নত করিলেন। এ ত উপেক্ষিতার মুখ নয়! এ দৃষ্টিতে নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও দৃঢ়তা একান্ত সুস্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে! তিনি বিস্মিত চিত্তে ভাবিলেন, বিনোদকে আমি যেমন জানি সে কি তবে তেমন নয়! সত্য কি সে সাধারণ লোকেরই মত খেয়ালি যুবক মাত্র? রজনীনাথের চিত্ত যে পরিমাণে বিনোদের পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা-মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই পরিমাণেই বিনোদের চরিত্রের লঘুতা তাহার প্রতি তাঁহাকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিল। এই স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝিল না, সে এমন পাষণ্ড!

শিবানী আপনার আনত নেত্রদ্বয় তুলিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আপনি খেতে বসলেন না?"

শিবানীর কথায় ও স্বরে রজনীনাথ একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিস্ময়বোধ করিলেন না। এই রকম সুরই যেন এ কণ্ঠে ঠিক মানায়, অনুযোগপূর্ণ আদেশের স্বর! হাত ধুইয়া রেকাবটা তিনি নিকটে টানিয়া লইলেন ও তার পর একটু কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া শিবানীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে যে দোষ করে তার ক্ষমা পেতেও বোধ হয় বেশি দেরি হয় না, না মা?"

শিবানী কখনও পিতৃস্নেহ জানিত না, শ্বশুরের নিকট আসিয়া সে তাঁহার স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল বটে কিন্তু সে স্নেহে যেন সান্ত্বনা মিলিত না। যেখানে অধিকারের অকুণ্ঠিত গর্ব্বে সে স্থান পায় নাই, সেখানে চোরের মত প্রবেশ করিয়া সে অপরাধ-কুণ্ঠিত হইয়া আছে। পরের পূর্ণ অধিকারকে খর্ব্ব করায় সে দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করিতেছিল। তাহা তাহাকে এখানকার কোন পাওনাই হাসিমুখে লইতে দেয় না। কিন্তু রজনীনাথের কথা কয়টা তাহাকে আজ অপ্রত্যাশিত রূপে চকিত করিয়া তুলিল। কে জানে, কেন সহসা তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত করিয়া আনন্দের একটা তাড়িত শিরার ভিতর দিয়া বহিয়া গেল ও আচমকা তাহার কঠিন নেত্র অশ্রুজলের একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিল!

শিবানী মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "সে আমার দুঃখ বুঝতে পেরেছে, তা কি আমি জানিনা, বাবা? ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক নন। আপনি আমার একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিন, আমার জন্যে এত বড় সংসারটা না নষ্ট হয়ে যায়—"

শিবানী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিলেও সঙ্কোচ ও আত্মাভিমান আসিয়া শত বার তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীরের ভিতরটা যেন হিম হইয়া আসিল, কিন্তু কোন বাধাই আজ সে গ্রাহ্য করিল না।

শিবানীর কথাগুলা রজনীনাথের কানে একটু অদ্ভুত শুনাইল। কি এক অজানিত আশঙ্কার আভাষে তাঁহার

চিত্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শিবানীর দিকে ফিরিয়া সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, জগতে ন্যায় সত্য ও ভালবাসারই জয় হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার বিধাতার হাতে কেউ কখনও পায় নি। তোমার স্নেহ তাদের তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত করে গড়ে নেবে মা, আমি আজ থেকে তাদের জন্য আরও বেশি নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্ব। সে ত তার অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে কুণ্ঠিত হয়নি ?"

ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শিবানী একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ত কিছু দোষ করেনি বাবা! ঠাকুরপো তাকে জোর করে নিয়ে গেল। সে ত কিছুতে যেতে চায়নি, সেদিনকার সে মুখ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারচি না—"

বলিতে বলিতে অশ্রু-ভারাক্রান্ত রুদ্ধকণ্ঠে ব্যথিতা শিবানী সহসা থামিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার আত্মবিস্মৃত অশ্রুর দুই এক ফোঁটা ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে পড়াতে সে তাহার সম্মুখস্থ অপরিচিত দাদাবাবুর উপর হইতে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়ের মুখে তাহা স্থাপন করিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এমন কাণ্ড তাহার চোখে বড় একটা পড়ে নাই। মায়ের ক্রোড় ও তাঁহার চোখের জল দুইটাই তাহার অপরিচিত। রজনীনাথের গম্ভীর বিচারকের দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিস্ময় চকিত হইয়া উঠিল। ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি তবে বাড়ির লোকের অনাদর সহ্য করতে না পেরে চলে যায়নি ? সে ত এ কথা আমায় বল্লে না।"

শিবানী বিদ্যুতের মত ফিরিয়া ঈষৎ তীব্রভাবে বাধা দিয়া

টবে না, ও সব মতলব ঝেড়ে ফেল!" বিনোদের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল, বুকের মধ্যে একটা আঘাতের বেদনা সুপ্ত অভিমানকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিয়া তুলিল। সে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কলকেতায় পাঠালে ছেলেরা একেবারে ক্রিয়াকাণ্ডহীন হয়ে পড়ে, নাস্তিক হয়ে যায়, ত ছাড়া এবার থেকে তোমাকে কিছু কিছু বিষয়কর্ম্মও তো শিখতে হবে! শুধু কেতাবের বিদ্যে শিখলে তো তোমার চলবে না বাপু। তাই বলি কি, ঘরেই একজন মাষ্টার রেখে কিছু ইংরেজি পড়, আর একজন মুন্সি রেখে কিছু কিছু এদিককার হিসেব-টিসেব গুলা শেখাও তোমার দরকার।"

বিনোদের চোখ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কপালের শিরাগুলা একটু স্ফীত দেখাইল। সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মার ইচ্ছা ছিল,আমি একটু বেশি পড়ি।" তার পর সহসা মুখ ফিরাইয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,"খরচ আমি বেশি করব না। সামান্য অবস্থার লোকের মতন,—আপনার যদি মত না থাকে, তবে থাক্—" তৎক্ষণাৎ সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিল। আহত ভাবে শ্যামাকান্ত ডাকিলেন, "বিনু!" বিনোদ দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোষের নিকটে আবার দাঁড়াইল, কিন্তু মুখ নিচু করিয়াই রহিল। মাকে মনে পড়ায় অশ্রুসম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাকান্ত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "বসো।"

বিনোদ বসিলে তিনি বলিলেন, "বেশি লেখাপড়া করলে

বলিল, "আপনি এই কথা বিশ্বাস করেচেন? সে কি সেই রকম মেয়ে?"

এ ভর্ৎসনা রজনীনাথকে খুব আঘাত দিয়াই বিঁধিল। একটা অনুতাপ-মিশ্রিত বেদনার শর কয় দিন হইতেই তাঁহাকে বিঁধিতেছিল। বিবেক কত বার বলিয়াছে, 'শান্তি, তোমার শান্তি এই করিল বলিয়া একেবারে হাত পা আছড়াইয়া উঠিলে, সে কি এমন কাজ করিতে পারে? ইহা ত মনে হইল না! ভাল করিয়া কই খবরও লইলে না ত?' শিবানীকে তিনি ইহার যে বিরুদ্ধ যুক্তি দেখাইলেন, সে যুক্তি নিজের মনের কাছে যে না দাখিল করিয়াছেন, এমন নয়, কিন্তু তথাপি সে সুযোগ খুঁজিয়া তাহার সূচীকাগ্র তীক্ষ্ণ ফলা বিঁধাইতে ছাড়ে নাই।

যে সম্ভাবনাটিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইবার জন্য মনের মধ্যে ব্যাকুলতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বপক্ষে এতটুকু সহানুভূতি পাইলেই সমুদায় দ্বিধা কাটাইয়া সন্দেহমুক্ত প্রাণ তাহার দিকেই ছুটিতে চায়। শিবানীর কণ্ঠে যেন তাঁহারই অন্তরের প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল। এ কথাটা তাঁহার নিশ্চয়ই ভাবিয়া বিচার করা উচিত ছিল। পরের ছেলের উপর রাগ করিয়া নিজের সন্তানের প্রতি কেন এমন অবিচারের দণ্ড দিলেন? সে ত তাঁহার কোন সামান্য কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিবার মেয়ে নয়, নিজের জন্য ওকালতি কেন করিবে, সে?

রজনীনাথ অস্পৃষ্ট আহার্য্য ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুতপ্ত বেদনাপূর্ণকণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "তাই বুঝি লতি আমার অভিমান করে আমার কাছে আসেনি? তাকে একবার ডাকত মা—বল, তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্য তার চিরস্নেহের

কোল পেতে রেখেছে, তাকে বুকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা কর্‌চে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বাষ্পগ্রড়িত, ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিল, মনের দুর্ব্বলতা চাপিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। শিবানী বিস্ফারিত নেত্রে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল, অসাবধানে তাহার মাথার কাপড়টা মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। এলো চুলগুলা বাতাসে উড়িয়া মুখে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া সেই যোগিনী মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। অমূল্য মার কোল হইতে নামিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িয়া সেই জটা বাঁধা চুলগুলা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। শিবানী ভাল করিয়া সে সব কিছু জানিতেও পারে নাই। কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে ডেকে দিতে বলচেন ?"

বিস্মিত হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "কেন ? শান্তিকে !"

"এখানে শান্তি কোথায় ? তারা ত কদিন হল, আপনার কাছেই গেছে।"

রজনীনাথের বুকের ভিতরে ধক্ করিয়া একটা আঘাত পড়িল। "সেকি ! আমি যে তাদের সেই রাত্রেই এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছি, হেম এখানে আসেনি ?"

রজনীনাথের বিলম্ব দেখিয়া ও নিজের মনের দুর্ব্বলতায় তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর দেখাইতে না পারায় অনুতপ্ত হইয়া শ্যামাকান্ত তাঁহার অনুসন্ধানে আজ কয় দিন পরে অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। দ্বার খুলিতেই রজনীনাথের কথা কয়টা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি কম্পিতশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "হরি হরি! এমন কাজও করে। সে পাষণ্ড সকল আক্রোশ আমার মার উপরেই মেটাবার জন্যে তাঁকে এখানে আনেনি—"

বৃদ্ধ হতাশ্বাসে কপাট ধরিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। বাসার কাছে আসিয়া পক্ষী-মাতা আপনার অসহায় শাবকগুলিকে অপহৃত দেখিলে এইরূপই নিরুপায় ক্ষোভে বুঝি লুটাইয়া পড়ে! শ্বশুরের আগমনে শিবানী আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। মাথার কাপড় যথাস্থানে স্থাপন করিয়া রুক্ষ চুলগুলাকে অবহেলার সহিত হস্ত তাড়নায় বিতাড়িত করিয়া সে কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা মুহূর্ত্ত মধ্যে জমাট নৈরাশ্যে পরিণত হইয়া কঠিন মুখে তাহাকে ধিক্কার দিল।

অমূল্য ব্যাপার কিছু না বুঝিলেও মায়ের কাপড়ের একটা প্রান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকার মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতিও সকলকার এতটা অবহেলার ভাব তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না। সকলকার মুখেই যেন একটা আসন্ন ঝড়ের চিহ্ন! অভিমানে তাহার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রজনীনাথ শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই তাহার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "এসত দাদা, আমরা বাইরে যাই, ঘরে বড্ড গরম হ'চ্চে।" বলিয়াই তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে

শ্যামাকান্তর দিকে না ফিরিয়াই কহিলেন, "আসুন চৌধুরী মশাই, ভাইটিকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক—"

শিবানী ও শ্যামাকান্ত উভয়েই অনেকখানি বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী সক্রোধে কন্যাকে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁলা শিবি, তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দেব না কি? বলি এই কি তোর বুদ্ধি সুদ্ধি হচ্চে? এতদিন ধরে যে এত শেখানু পড়ানু, তার কি এই প্রতিফল দিলি?"

শিবানী মাটি হইতে চোখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করেছি?"

"কি করিস্‌নে, তাই বল! মিন্‌সেকে অত আপ্যায়িত করে তোর কি লাভ বল দেখি? শত্তুর গেছে, সাতটা সরষে দে গঙ্গাচ্চান করে আয়গে, তা না মেয়ের সপ্ত সিন্ধু উথলে উঠলো। দেখ, ওঁরা অলুইরণ দেখতে পারিনে। এখন ছেলে যে ডাইনের হাতে পড়ল তার হুঁস আছে। যা, ছেলেকে চেয়ে আনাগে; যদি ছেলে বাঁচাতে চাস ত ওঠ।"

শিবানী কঠিনভাবে পা দিয়া মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার শীতল হাত ও পায়ের তলা গরম হইয়া আসিয়াছিল। কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, "না মা, আমি ছেলে চেয়ে আনাব না। কেন, তুমি অমন করে কেবল কেবল ওঁদের অপমান কর? কেন, তুমি ও সব কথা বল?"

বলিতে বলিতে সহসা সে রুদ্ধবাক্ হইয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শ্রীহরি! এত করিয়াও তিনি মেয়ের মন পাইলেন না! এমন বোকা একগুঁয়ে মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলেন! একেই বলে "যার বে তার মনে নেই, পাড়াপড়সির ঘুম নেই!" চুলোয় যাক্, তোর যদি পেটের পোর উপর দরদ নেই তবে আমারই বা কিসের জন্যে! আমার তোরা কি করবি রে বাপু, বড় কল্লেন পেটের পো, আর কর্‌বেন নাতি! আমার যা আছে, তাই কে খায় ঠিক নেই! হরি বল মন! অভুক্ত আহার্য্য পাত্রটার দিকে চোখ পড়ায় এবং বারান্দায় মাসার গলার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলেন, "মিন্‌সের দেমাক দেখেচো? ওমা, মেয়েটা এত খান খেটে খুটে খাবার তৈরি করলে তা একটু খুঁটেও মুখে দিয়ে দেখলে না! হিংসে, শুধু হিংসে! পোড়া মেয়ে আবার ওদের জন্যেই মরেন!"

মাসিমাতা শুচিতা রক্ষাপূর্ব্বক এক হাতে হরিনামের মালা ও অন্য হস্তে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া উঁকি দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কলকেতার লোকেদের, বোন্, ধরণই ঐরকম।"

তাঁহার মনে পড়িল, এই ঘরেই রজনীনাথকে তিনি নিজে কাছে বসিয়া কত যত্ন করিয়া খাওয়াইছেন। তাঁহার পুরানো রসিকতায় যোগ না দিয়া রজনীনাথ কন্যার সম্মুখে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ায় বেরসিক বলিয়া সেদিনও তিনি কত উপহাস করিয়াছিলেন। আপনার রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিবার জন্য 'তোমার খাবার কষ্ট হল, যে রান্না, খাবে কি করে' বলিয়া নানা ছলে অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়া মন খুলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, "খাইয়ে এমন সুখ কিন্তু কারুকে হয় না।"

আজ সঙ্গে সঙ্গেই সেই রজনীনাথের রুচি হইতে চরিত্র পর্য্যন্ত মসীলিপ্ত করিবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাঁহার মনেও একটু বিঁধিল, তাই ঠিক সায় দিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেদিন বাড়ী বন্ধনের মন্ত্রটি মাসীমার পরিবর্ত্তে মামীকে শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী অপ্রসন্ন নীরস মুখে সন্ধ্যা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে যাইবার সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া কন্যার মতিগতি পরিবর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ সওয়া পাঁচ টাকার হরির লুট তুলসী ঠাকুরকে মানত করিয়া গেলেন। নিজের দ্বারা যাহা সাধন করা যায় না, মানুষমাত্রেই সেখানে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী এতখানি বয়সের অশ্রান্ত চেষ্টা দ্বারাও যখন তাঁহার এই একরোখা জেদী মেয়েটিকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া একান্ত অসহায়ভাবে দেবতার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখি, তুমি কত জাগ্রত ঠাকুর, আমার ঐ একটা মাত্তর মেয়ে, ওকে নিয়েই আমার সংসার করা! ওর যাতে সংসারের উপর মন হয়, তাই কর ঠাকুর, তাই কর।"

৩১

নদীটি নিতান্ত ছোট না হইলেও খুব বেশি বড় নয়। বর্ষায় পাহাড়ে ঢল নামিয়া যেমন পূর্ণ দেখাইত, শীতের আরম্ভে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়া দুধারের তীরে নুড়ি শামুক ও বেলেমাটি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বালির উপর পরিষ্কার

জলের নীচে বাতাসের হিল্লোলে জলের সঙ্গে সঙ্গে নুড়িগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, তীরে মৃদু ঢেউ ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে অস্ফুট-বাক্ শিশুর মত আধ কলকণ্ঠে কত সোহাগের ভাষা বলিয়া চলিয়া পড়িতেছে। স্নেহময়ী মার মত জননী ধরিত্রী কখনও সোহাগের আলিঙ্গন, কখনও অভিমানের ক্রন্দন, কখনও ক্রোধের নিষ্ফল তাড়না অচঞ্চল হাসিমুখে চিরদিন ধরিয়া গ্রহণ করিয়া যাইতেছেন, বিকার নাই বিরাগ নাই, মাতৃস্নেহের মতই তাহা অকুণ্ঠিত, সহিষ্ণুতাপূর্ণ ও দ্বিধাহীন। মা, জননীর জননী! তোমার ঐ নীরব স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া পলে পলে কতখানি গ্রহণ করিতেছি তাহার কতটুকুই বা আমরা ভাবিয়া দেখি মা! মাতৃস্তন্য যেমন সন্তানের মুখে দুগ্ধদান করিয়াই তৃপ্ত, তুমিও তেমন শুধু দিয়াই আসিয়াছ, ডাকিয়া জানাও নাই, চাহিবার প্রতীক্ষা কর নাই!

নদীর নাম বিরূপাক্ষী। বিরূপাক্ষীর পূর্ব্বতীরে একটি নূতন বাঁধান ঘাটের উপরে আম্র নারিকেল প্রভৃতি ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া একটি মাঝারি রকম দোতলা বাড়ি দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বে এইখানে একজন নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল, তারপর জর্ম্মানীর নবাবিষ্কৃত রংয়ের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেলে সাহেব কুঠি তুলিয়া দেশে গিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত এখানে কেহ বাস করে নাই। বাগানটা জঙ্গলে ও বাড়ীটা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইবার আর যখন অধিক বিলম্ব ছিল না, সেই সময়েই বিরূপাক্ষীর যাত্রীগণ নৌকা হইতে সকৌতূহলে চাহিয়া দেখিল, বাড়িখানা দেখিতে দেখিতে মেরামত

হইয়া ঝকঝকে হইয়া দাঁড়াইল এবং জঙ্গল কাটিয়া খালি জমী বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ দিব্য একটি সুন্দর ফুলবাগান দিনে দিনে গড়িয়া উঠিল। নদীতে বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় নৌকাও বেশি চলিত না, কিন্তু যাহারা সে পথে যাতায়াত করিত আশ্চর্য্য হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্যের মত মুগ্ধনেত্রে নব নির্ম্মিত উদ্যানে ক্রীড়াপরায়ণ বালকগুলির দিকে তাহারা চাহিয়া দেখিত। তাহারা নিজের হাতে মাটি নিড়াইতেছে, নিজের হাতে জল আনিয়া ঢালিতেছে, নিজেরাই গাছ কাটিতেছে, আবার ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া তোড়া বাঁধিয়া পরস্পরকে দান করিয়া লাফাইয়া খেলিয়া হাসিতে কথায় নির্জ্জন নদীতটে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া উপকথার পরীবালক-দিগের মত বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। নিজ্জীব রোগক্লান্ত বালকগণ ম্লান পাণ্ডুর মুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিত, তাহারা কি আরব্য উপন্যাসের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? মৃত্তিকা কলসে জল আহরণ, বেড়া বাঁধিতে সমকণ্ঠে সন্ধ্যা-বন্দনা সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি মুগ্ধ যাত্রীগণের বিস্মিত চক্ষে প্রাচীন কালের পুণ্যাশ্রমবাসী ঋষি-কুমারগণের সৌম্য সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিত।

নিকটে দ্বিতীয় লোকাবাস নাই। বাগানের পশ্চাতে দুইএকটা সরিষাক্ষেত্র পার হইলে গ্রামের সীমানা চোখে পড়ে ও লোককণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে। সকালে সন্ধ্যায় কিন্তু বিরূপাক্ষের সেই নির্জ্জন তট হাসি কান্না কলহ বা ইষ্টমন্ত্র-পঠনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার শব্দে মুখরিত হয়। গ্রাম্য শিশুগণের বাহু-তাড়িত যুযুৎসু তরঙ্গ-শিশুগণ ছলছল কলকল শব্দে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উছলিয়া পড়ে, সুন্দরীর সুন্দর

প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শীতলতা দান করিয়া তৃপ্ত করে, বৃদ্ধার ঐকান্তিক ভক্তির জলাঞ্জলি ইষ্ট দেবতার চরণে নীরবে অর্পণ করে।

তারপর নদীতীরের গাছগুলি যখন দীর্ঘচ্ছায়া জলে ফেলিয়া উত্তপ্ত ক্লান্ত শ্বাস ফেলিতে থাকে এবং আমবাগানের পার্শ্বস্থ বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়া নিমগাছের ছায়াবহুল ঘন শাখাপল্লবে ঢাকা শীতল অঙ্ক দিয়া, বটফল-বিছানো, শেফালিকা-ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া তাবিজ লবঙ্গফুল কলসীর গাত্রে বাজাইয়া সিক্তবসনা হাস্যমুখী গ্রাম্যবধূগণ পরস্পরে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া যায় ও গ্রামের কৃষাণের দল কাঁচা লঙ্কা ও লবণের সাহায্যে বাসীভাতে উদর পূর্ণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাগানের উত্তর দিকে ফিরিয়া মেঠো সুর হাঁকিয়া ক্ষেতের পথ ধরে, সেই সময় হইতেই এই নির্জ্জন নদীতীর যোগাশ্রমের মত নিস্তব্ধ হইয়া যায়। নিঃশব্দ প্রকৃতি তাহার শান্ত করুণ চক্ষু দুটির পাতা মুদিয়া বিশ্রাম লয়—যেন নিশ্চিন্ত-চিত্তা বালিকার মত ঘুমাইয়া থাকে, রৌদ্রতপ্ত বাতাস নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়া ললাটে মৃদু হাত বুলাইতে থাকে। দূর শস্যক্ষেত্র বা ছায়ানিবিড় বটবৃক্ষতলস্থ বিশ্রাম শয্যা হইতে ক্বচিৎ কোন পরিচিত রাগিণীর একটি চরণ আকুল করুণ সুরে ভাসিয়া আসিতে থাকিলেও সে বিশ্রাম সুখের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। শ্যামল লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক ঝিলমিল করিয়া সকৌতুকে উঁকি দিয়া রাঙ্গামুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়, মুখের উপর রেখাপাত করিতে যেন সাহসী হয় না। ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পাখীরা

কুঞ্জন করিয়া উঠিলে বাতাস ঈষৎ চঞ্চল হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া আবার নিজের সস্নেহ পরিচর্য্যা গ্রহণান্তর ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া মা যেমন সতর্ক স্নেহে সজাগ হইয়া থাকেন, সেও যেন তেমনঃ জাগিয়া মাথার কাছে বসিয়া আছে, কোথাও একটা সাড়া পাইলে নিশ্বাস টানিয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহে ও নিঃশব্দে তর্জ্জনী তুলিয়া নিবারণ করে।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ প্রকৃতির বিশ্রাম-সুখ অব্যাহত রাখিয়াও সেই শান্ত তপোবন-মধ্যস্থ গৃহ হইতে একটা অস্ফুট শব্দলহরী তাহার স্তব্ধতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া সুদূর মধুচক্রে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মত একটা মৃদু তানলয়যুক্ত শব্দ বহন করিয়া আনিত। শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট আবৃত্তি হইতে বিভিন্ন ভাষার সুস্পষ্ট উচ্চারণ আবার একবার সেই পুরাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া যায়, সে শব্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার। কারণ এই বাড়ীখানি একটি স্কুলবাড়া বা স্কুল বোর্ডিং।

অপরাহ্নের ক্ষীণ ছায়া দূরে সরাইয়া হীনতেজ সূর্য্যকিরণ দেওয়ালের উপর হইতে সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছাদের আলিসার উপর আরও দূরে অবশেষে নদীতীরের উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে নদীর শীতল স্থির জলের উপর ছায়া ফেলিয়া ওপারের বিস্তীর্ণ বালুকা-তীরের উপর ছড়াইয়া পড়িল। খানিকটা জল রৌপ্যময় করিয়া তীরের নুড়িপাথর ভাঙ্গা পাত্র ও বালুকাকণায় সেই রশ্মি হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতে লাগিল। নদীজলের কোথাও

আজকালকার ছেলেদের মাথার ঠিক থাকে না, সেইজন্যই পড়ার উপর আমার ততটা বেশি ঝোঁক ছিল না, কারণ আমাদের ঘরে বিষয়বুদ্ধিই একটু বেশি থাকা দরকার! সেটার দেখছি তোমার মধ্যে বড়ই অভাব আছে,—তা থাক্ তোমারি যখন অতই ইচ্ছে, তখন আর কি হবে? কলকতায় না হয় পাঠাব, কিন্তু আমার দিন কাটানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে!"

শেষের দিকটায় তাঁহার স্বর কম্পিত হইয়াছিল। বিনোদ চকিতের মত মুখ তুলিল, তাহার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাকান্ত একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আজই আমি রজনীকে একখানা চিঠি লিখচি,—সে সেখানে তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেবে, খপরও সর্ব্বদা নেবে, আর আমি গিয়েও দেখে আসব মধ্যে মধ্যে, সময় পেলেই—"

বিনোদের উন্মুখ চিত্ত আবার একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল! 'সময় পেলে'? ছেলের চেয়ে বিষয়কার্য্য বড়! সময়ের অভাব কি? কই বলিলেন না তো, 'আমিও তোর সঙ্গে যাই চল্!" মা থাকিলে কি তিনি তাহাকে একা ছাড়িয়া দিতেন?

কয়দিনের মধ্যেই বিনোদ কলিকাতায় পড়িতে গেল! যাইবার সময় মায়ের অয়েলপেন্টিং ছবি প্রণাম করিতে গিয়া তাহার দুঃখ-অভিমানের উৎস কিছুতে আর বাধা মানে না!

পরক্ষণেই পিতার সাড়া পাইয়া চোখের জল মুছিয়া গম্ভীর প্রশান্ত মুখে সে বাহির হইয়া আসিল। পিতাকে প্রণাম করিতে গেল। তিনি মাথায় একবার হাতখানা রাখিয়া মৃদুস্বরে কেবলমাত্র বলিলেন, 'এসো'। তার পর তাড়াতাড়ি চশমার

একখানা ভাসমান সাদা মেঘে সূর্য্যালোকের লাল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও নীল আকাশের সৌম্যছায়া স্থির হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। শীত সায়াহ্নের অন্ধকার এপারের গাছপালাকে ইহারই মধ্যে কাছে টানিয়া আঁচলে ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে সকলের ছোটগুলি মিলিয়া তাহাদের পণ্ডিত মহাশয়কে বুড়ি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। কয়েকজন বালক যুবকছাত্র ও মাষ্টার ফুটবল খেলিবার জন্য একত্র সমবেত হইয়াছিল। একদিকে কয়েকটি বালক মিলিয়া কাপচারার তলায় জল দিয়া মাটি নিড়াইয়া দিতে দিতে বটানি এগ্রিকলচার সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিতেছিল। সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত, উৎসাহে প্রফুল্ল এবং কর্ত্তব্যের নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে সংযত। কেবল রুগ্ন সুধীর একপাশে একটি কাঠের বেঞ্চের উপর বসিয়া বিষণ্ণ মুখে তাহা দেখিতেছিল। সে বহুদিন ম্যালেরিয়া ভুগিয়া জবগায়েই এখানে আসিয়াছে, প্লীহা যকৃতের বৃহৎ আয়তন ঈষৎ হ্রস্ব হইলেও এখনও সারিয়া উঠিতে অনেক বিলম্ব। এই উদ্দীপনাপূর্ণ মুখগুলি তাহার নিরুদ্যম হৃদয়কে ভবিষ্যতের একটি সঞ্চয় দান করিলেও বর্ত্তমানকে সমধিক পরিমাণে নিরানন্দময় করিয়া তুলিতেছিল। চারিপাশের কর্ম্মপ্রবাহের মাঝখানে সে একা কর্ম্মহীন।

জল দেওয়া হইয়া গেল। ওদিকে একটা 'গোল' হইয়া হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সে কোলাহল আবার থামিয়া গিয়াছে। ননী 'চোর' হইয়া রাগিয়াছিল। বুড়ি তাহাদের সে কোন্দলেরও সামঞ্জস্য করিয়া মিটাইয়া দিয়াছেন; ঠিক হইয়া গিয়াছে, ননী কাপুরুষের

মত পলাইয়া আত্মরক্ষা না করিয়া সম্মুখ বিচারে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

দুইএকটি ক্রীড়াশ্রান্ত বালক নূতন দলের উপর ভার দিয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া একটু দূরে একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া ইহাদের অধিকক্ষণ খেলিতে নিষেধ আছে। নলিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অন্য একজনকে প্রশ্ন করিল, "কিহে গুরুদেবকে যে আজ দেখ্‌চি না?" নলিন গুরুদেব বলার লোভটুকু সহজে দমন করিতে পারিত না, তাই তাহার গুরুদেবের অপছন্দ সত্ত্বেও সকল ছেলেদের মধ্যেই এই শব্দটার প্রচলন করিয়া তুলিয়াছিল।

সতীশ বলিল, "আজ স্বামীজি এসেছেন, তাই বোধ হয় তিনি বাইরে আসেননি।"

এমন সময় চশমা পরিয়া একজন যুবক মাষ্টার ও তাঁহারই সমবয়স্ক একটি ছাত্র আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "বল ত নলিন! কুরপাটকিনের চেয়ে অ্যাডমিরাল টোগো বড়টা কিসে হলো? ওরা আজ হেরে গেছে বলে কি বীরের অসম্মান করতে হবে? এ আপনার নেহাৎ প্রেজুডিস্, স্যার!"

মাষ্টার আর একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন, "Oh, no, sir, no! শুধু তর্ক করলেই হবে না ত, প্রমাণ করা চাই, কুরপ্যাটকিন্ তোমার কিসে অ্যাডমিরাল টোগোর চেয়ে বড় হলো?"

বাড়ীখানির দরজার উপর বড় বড় পাথরের গায় সোণালি অক্ষরে লেখা আছে, 'আশ্রম।' আশ্রমের পশ্চাতে বাগানের শেষ প্রান্তে পেয়ারা ও লিচু গাছের মধ্য দিয়া একটি কুটির দেখা যাইতেছিল। সেই কুটিরে ছেলেদের কথিত "স্বামীজি" আসিলে বাস

করিয়া থাকেন। মাটির দাওয়ায় মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর নিকট কম্বলের আসনে শিষ্য বসিয়া আছেন। বাঁশের খুঁটি জড়াইয়া তরুলতা ও ঝুমকাফুল খোলার চালের উপর উঠিয়া তাহার সমস্তটা জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মাটির দেওয়ালগুলি আইভিজড়িত হওয়ায় ছবির মত দেখাইতেছিল। ঘরের দ্বার ভেজান কিন্তু ভিতরে সুমার্জ্জিত স্বর্ণপ্রভ পিত্তল কমণ্ডলু, একটি ধুনাচি ও পিত্তল পিলসুজের উপর স্থাপিত একটি প্রদীপ ভিন্ন একখানি কম্বলের শয্যামাত্র উপকরণ ছিল।

শীতের স্বল্পায়ু সূর্য্যকিরণ সেই শাখা-নিবিড় বৃক্ষান্তরাল দিয়া সাদরে গুরুশিষ্যের অঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল। চারিদিকের গাছগুলায় বুলবুল্, পাপিয়া, চড়াই প্রভৃতি পাখী আনন্দ কলরব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটি চক্রবাক মিথুন নদীতীরে তাহাদের সারা রজনীর আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় মৌন বিষাদে মুখামুখি বসিয়া আছে। মাছরাঙ্গা ও বকগুলা শিকারের চেষ্টায় তখনও জলের মধ্যে পা ডুবাইয়া উৎসুক নেত্রে ঘুরিতেছে। সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীটি প্রতিনিয়ত তাহাদের কর্ম্মকেন্দ্রের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কর্ম্মহীন নহে।

শিষ্য কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সেই সমস্ত দেখিল, তার পর সহসা দৃষ্টি স্থির করিয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "তবে কি আপনি কর্ম্মযোগকেই প্রধান ও গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে মনে করেন ?"

গুরু কহিলেন, "আমার এই প্রকার ধারণা।"

"মার্জ্জনা করবেন, তাই যখন ধারণা, তবে সে আশ্রম ত্যাগ করে কেন এ পথে এসেছেন ?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন, "কর্ম্মেরই প্রেরণায়। বৎস! আমাকে আদর্শ করো না, আমরা মহাজনের পথানুসরণ করতেই, উপদিষ্ট হয়ে থাকি।"

"গুরুদেব, সেই উপদেশ ত "শত্রু মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ" তা ত আমায় বলচেন না, সে কথা ত বলতে দিচ্চেন না?"

"নীরদ! তুমি যে ভুল পথ ধরে বসে আছ। তোমার যাবার দরকার সীমলেয়, তুমি পঞ্জাব মেলে না চড়ে, চড়ে বসলে বোম্বে মেলে! সে ট্রেণ তোমার গন্তব্য স্থানে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারে না যে তা নয়, কিন্তু ওতে যেমন পথ সোজা ও সহজ হত, এতে আর তা হবে না। ক্রমাগত ওঠা নাবা, বদল করে যেতে হবে। তা ভেবে দেখনি, এখন অগত্যা যতটা এগিয়ে গেছ, সেইখান থেকে ফিরে আবার এ লাইনে এসে পঞ্জাব মেল ধরতে হবে। তোমাদের মহাজন ভগবান্ শঙ্কর নন। কর্ত্তব্যের পূর্ণমূর্ত্তি নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রই হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ।"

শিষ্য ঈষৎ চমকিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসটা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আপনাআপনি বলিল, "রামায়ণের রামচন্দ্র পিতৃবৎসল, পত্নী প্রেমের আদর্শ! গুরুদেব, যে পথে মানুষের মুক্তিমার্গে পৌঁছবার শত বাধা, সেই পথকেই আপনি কি জন্য সোজা পথ বলচেন?"

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, ভরত ও রামচন্দ্র দুজনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'একটা পথ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু সেই পথেই শীঘ্র পৌঁছন যায়, আর একটা নিরাপদ পথ আছে সেটায় অত্যন্ত বিলম্ব হবে, তাতে ভরত কি বলেছিলেন জান?"

মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আবার বলিলেন, "বৎস! মনে কর তুমি আমি সকলেই আমরা সংসারত্যাগী হয়ে কৌপীন গ্রহণ করে এই বিরূপাক্ষের দুই তীরে যোগাসনে বসে রইলাম, কিন্তু তার পর? আমাদের আহার যোগাবে কে? তখন যদি ধার্ম্মিক গৃহস্থ আমাদের ডেকে আহার না দেন, তবে আমাদের সাধন ভজন, যোগ উপাসনা সমুদয়ই ত নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে আহার্য্যান্বেষণে ছুটতে হবে? তবেই দেখ, যে নিজে নিষ্কাম নির্লিপ্ত থেকে অন্যের ধর্ম্মকর্ম্মে সহায় হয়, সে বড়, না যে অন্যের উপর নিজের ভার চাপিয়ে নিজের ভাবনামাত্র নিয়ে থাকে, সে বড়?"

শিষ্য ভাবিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

গুরু আবার কহিলেন, "আমার নিজের উদাহরণ দেখ, পূর্ব্বে আমি দশজনকে অন্ন দিতাম, নিজের সঙ্গে অন্য পাঁচজন আত্মীয়-স্বজনের শুদ্ধ জীবনোপায় করতাম, কিন্তু এখন আমি কি করছি? নিজের আহার অবশ্য বন্ধ হয়নি। অন্য পাঁচজনে তা যোগাচ্চে কিন্তু অন্যের আহার যোগাবার আমার যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেটুকু ত্যাগ করেছি। গৃহীই যথার্থ স্বার্থত্যাগী, সে যা কিছু করে, সকলি প্রায় অন্যের জন্য, পিতা মাতা পত্নী পুত্র আত্মীয় পর কারও না কারও জন্য, কিন্তু সন্ন্যাসী যা কিছু করে, সে সমুদয়ই তার নিজের জন্য। গৃহীর ধর্ম্ম বড় নয়?"

নীরদ কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "কিন্তু সে রকম কর্ম্মযোগি গৃহস্থ এখন আর কৈ দেখা যায়?"

গুরু বাধা দিয়া বলিলেন, "আছেন বৈ কি বাবা, এখনও অনেক আছেন। কিন্তু সে সংখ্যা হ্রাস হচ্ছে বলেই কি

আদর্শকে ছোট করতে হবে? সন্ন্যাসী দ্বারা জাতি গঠিত হয় না, যে দেশ ধ্বংশের মুখে পড়েছে, সে দেশে এখন কেবল কর্ম্ম চাই। কর্ম্ম ভিন্ন দেশ রক্ষা হবার দ্বিতীয় উপায় নাই। শুদ্ধ সত্ত্বচিত্তে পবিত্র কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশ স্থাপনের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে বীজরক্ষায় যত্নবান হও। এই এখনকার একমাত্র তপ। এ ভিন্ন এই মহা তপস্যার দ্বারা প্রকৃত সন্ন্যাসীর যে পরম পদ প্রাপ্য, সেই মোক্ষ পদই লাভ করতে পারা যাবে। ভগবানও বলেছেন, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব!"

নবস্থাপিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যুবক আবার বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে দিনান্তের শেষ আলোটুকু শীত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাজড়িত ম্লান কুহেলিকায় মিলাইয়া গেল। বারান্দার সম্মুখে শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ কুয়াসা ও হিম জাল ভেদ করিয়া অন্ধকার বনবীথির পরপার হইতে ভাসিয়া উঠিল। শীতের বাতাস ঝির ঝির করিয়া স্তব্ধ স্থির গাছের পাতা কাঁপাইতে লাগিল। পল্লীবধূগণের কোমল ওষ্ঠপূত মঙ্গল শঙ্খধ্বনি তখন থামিয়া গিয়াছিল। ব্যগ্রকণ্ঠে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে ফেলি?"

"রামচন্দ্র বনবাসে যাবার সময় পরিজনবর্গের শোকদর্শনে স্বীয় কর্ত্তব্য হতে ভ্রষ্ট হন নি, নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক রাজকর্ত্তব্য পালন করেছিলেন। নীরদকুমার, যার দেশে এমন উজ্জ্বল চিত্র রয়েছে, সে কেন বৃথা সন্দেহ পোষণ করে কষ্ট পায়? তোমাদের আধুনিক শিক্ষা

তোমাদের যে রকম "ত্যাগের" দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন আমাদের শিক্ষা সেটুকু বর্জ্জন করে চলতে শিখিয়েছিলেন, প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রভেদই যে এইখানে। কর্ত্তব্য ত্যাগ করে যত বড়ই ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাও, সে ত্যাগ 'ত্যাগ' বলে অভিধানে অভিযুক্ত হইতে পারে না, সে মোহ। নীরদ, তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাও?"

লজ্জাবিজড়িত স্বরে উত্তর হইল, "মনে বড় সাধ হয়েছিল প্রভু!"

"সন্ন্যাস শব্দের অর্থ জানো নীরদ? সম্যকরূপে ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসগ্রহণ কালে কি প্রতিজ্ঞা করতে হয় জান কি? পৃথিবী ভুবর্লোক এবং স্বর্গ তোমাদের আমি ত্যাগ করলাম। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েও সন্ন্যাস ব্রত যে কায় মনবাক্য দ্বারা পূর্ণরূপে পালন না করতে পারে তার স্থান কোথায় নীরদ?"

শিষ্য নীরদকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অস্থির কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যার সময় চলে যাচ্ছে, আমি বিদায় নি।" পরে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল, এবং গুরুর আশীর্ব্বাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্রুত পদে সে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া গম্ভীরভাবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে আলো ছিল না। জানালা খোলা থাকিলেও চাঁদ এখনও অনেক নীচে রহিয়াছে। পিছন দিকের বাগানে ঘন গাছপালার মধ্যে ক্ষীণ জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী ঘরে

নীরদ একটা থামের গায় মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারে চাহিয়া রহিল। কিন্তু যদি সে—না, এখন আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় না! না, না, চিরজীবন অনুতাপ করা ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই!

একখানা পাতলা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। ঝোপের ভিতর হইতে শৃগাল ডাকিতে লাগিল। আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না। বর্দ্ধিতান্ধকারে গাছের গায় জোনাকির পুঞ্জ ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছিল। নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে আটকাইয়া আসিতে লাগিল; জোর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া নীরদ অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল, "মা।" সহসা তাহার বক্ষের ভার পাষাণের মত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। হায়, যদি তাহার মা থাকিতেন! মা বলিতেই এক সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হায় মা, কি স্নেহময়ী মাই তাহার গিয়াছেন। সেই মার সঙ্গে তাহার সবই চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আবার সে মৃদুস্বরে ডাকিল, "মা, মা!"

এমন সময় পিছন হইতে কে তাহাকে স্পর্শ করিল। সে স্পর্শ কি স্নেহপূর্ণ, কি সান্ত্বনামাখান। নীরদ দেখিবার জন্য ফিরিল না, অভিভূতভাবে কেবলমাত্র তাহার বাহুর মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া মুদ্রিতনেত্রে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "মাগো!"

সন্ন্যাসী মাটিতে বসিয়া সস্নেহে ছোট ছেলেটির মত তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া কহিলেন, "তোমার কি মা আছেন?"

নীরদের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না।" তারপর সন্ন্যাসীর কোলে মুখ লুকাইয়া এতদিনকার অবরুদ্ধ বেদনার তীব্র জ্বালা অশ্রুর আকারে চোখ দিয়া নীরবে সংসারত্যাগীর গৈরিক বস্ত্রের উপর নিঃশব্দ ধারায় ঢালিয়া দিল। সেই সঙ্গে তাহার বক্ষের ভারও অনেকখানি কমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে কোন বাধা দিলেন না, গম্ভীর মুখে বসিয়া শুধু তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নীরদের মনে হইল, যে মাকে সে এইমাত্র প্রাণের দারুণ জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাকিয়াছিল, তিনিই বুঝি তাহার ব্যাকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কোন অদৃশ্য লোক হইতে তাঁহার এই ব্যথিত সন্তানকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহধারাটুকু নিঃশেষ করিয়া এই স্পর্শটির মাঝখানে ঢালিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গুলিটি তাহার প্রতি শিরার ভিতর দিয়া এক অপূর্ব্ব তাড়িত সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিল, এ রকম স্পর্শ সে কত দিন অনুভব করে নাই। এইটুকুর জন্যই যে তাহার প্রাণটা নিদারুণ তৃষ্ণায় শুকাইয়া উঠিয়াছিল, হৃদয়টা মরিয়া গিয়াছিল। সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সে যে শুধু এইটুকুই চাহিয়াছে, শুধু এইটুকুই চাহিতেছে, তাহা আজ সে জীবনে এই প্রথমবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। সারা জীবনটা এই পাওনাটুকুর অভাবেই তাহার এমন ব্যর্থভাবে কাটিয়া গেল। এইটুকু দাবীই বুঝি তাহার চিত্তে বাল্যাবধি দুর্জ্জয় অভিমানরূপে জাগিয়া রহিয়াছিল, মাতৃকরতলের স্নেহ-তাড়নায় ত তাহারা

প্রসুপ্ত হইবার অবসর পায় নাই, মাতৃস্তন্যের ক্ষীরধারায় ত সে শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র হইবার সময় পায় নাই! তাই সেই কল্যাণময় উদার হৃদয়ের স্পর্শে উদার দৃষ্টি না পাইয়া সে সঙ্কুচিত সন্দেহে কেবল নিক্তির কাঁটার দিকেই বদ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়াছে, ওজনের ফাঁকি ধরিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইয়াছে, বিশ্রামের সুখ চিনে নাই। সে অন্ধ! অভাব ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কাণায় কাণায় ভরিয়া আছে, অথচ সে জানে না যে সে কিসের আকাঙ্ক্ষায়, ধুলিমলিন, কণ্টক-ক্ষত ক্লান্তচরণ, ঘূর্ণিত-মস্তক, জীবনযুদ্ধে পরাভূতপ্রায়! আজ সে বুঝিল, তাহার হৃদয় কেন ত্যাগের আনন্দ, ক্ষমার শান্তি উপভোগ করিতে, সহ্য করিতে পারে না। পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, যশ সমস্তই যেন তাহার কাছে ছায়াবাজির মত অস্পষ্ট, স্বপ্নের মত অসারভাবে দেখা দেয়।

সে যে কিছুই চাহে না! সন্ন্যাস আশ্রমই তাহার কাম্য, এ কথাটার মত এত বড় মিথ্যা এই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট আর কিছুই রহিল না। কি সর্ব্বনাশ! এত বড় আত্মপ্রতারণা দ্বারা পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মকে সে কলঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিল? অন্তর্য্যামী গুরুদেব তাহার নিজেরও অজ্ঞাত এই অন্তরের বার্ত্তা জানিয়া ভাগ্য-ক্রমে বাধা দিলেন। হায়, শঙ্করভাষ্য উপনিষদ! এতদিন তোমরা কি শিক্ষা দিলে? সে ত্যাগ চাহে না, পাইতে চাহে, তৃষ্ণায় তাহার বুক অবধি ফাটিয়া উঠিয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা লইয়া বলিবে, জল চাহি না?

শুদ্ধানন্দ তাহার মাথায় ঘন ঘন হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আজ তোমার আহার হয় নি, শীতে কষ্ট পাচ্চো; এসো, তোমার ঘরে যাই।"

মধ্য দিয়া পুরাতন হিসাবের খাতা দেখিতে লাগিলেন। বিনোদ নীরবে গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। শ্যামাকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আজকালকার ছেলেগুলো কি রকমই শক্ত হচ্চে! আমায় ছেড়ে চল্‌লো, তা একটু দুঃখও নেই!" বিনোদ কি ভাবিতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

কলিকাতার কোলাহলমুখরিত উৎসাহ-চঞ্চল রাজপথের পার্শ্বে সঙ্গীহীন এক দ্বিতল কক্ষে যখন সে প্রথম প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার জীবনের সমুদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আশা-আনন্দ বিমানবিচ্যুত অট্টালিকার মত ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এখানে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে? যেখানে একটিমাত্র চিত্তও তাহার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা লইয়া জাগিয়া থাকে না! কলেজ হইতে ফিরিয়া শ্রান্ত দেহ বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া জানালার পানে সে চাহিয়া থাকে, পথে জনস্রোত নদীর স্রোতের মতই ছুটিয়াছে! বিনোদ দেখিত, সকলকার গতিতেই কেমন একটা আগ্রহ, সকলেরই মুখে কেমন একটা প্রবল উদ্দীপনার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় প্রতিদিনই তাহারা প্রতিদিনের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, এতটুকু বিরক্তি নাই, শ্রান্তি নাই! কিন্তু সে,—ইহারই মধ্যে এই কিশোর জীবনেই কি পরিশ্রান্ত!

অভিমান করিয়া পিতাকে সে আসিবার কথা লিখিল না, বা ছুটীর দিনে তাঁহার কাছে যাইবার অনুমতিও চাহিল না। শ্যামাকান্ত ছেলেকে ছাড়িয়া অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনে মনে তাহার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াও উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অনর্থক গাড়ি করিয়া যাওয়া আসা করাটা

নীরদ কলের পুতুলের মত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল। তখন সে অনেকখানি শান্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে চোখ মুছিল না, বোধ হয় সে ইহা জানিতেও পারে নাই। অন্ধকারে দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহাকে উঠিবার চেষ্টাবিরহিত দেখিয়া সন্ন্যাসীও আর কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে তাহার শিথিল একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া একটু নিকটে সরিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর হইতে একটা ঘড়ি বাজিয়া একবারের জন্য নিস্তব্ধতাকে আঘাত করিয়াই থামিয়া গেল। আকাশে তরল কুয়াসার পাতলা আবরণ সরাইয়া চাঁদ একবার কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ কৌতূহলে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া দেখিলেন। নীরদ এতক্ষণে কথা কহিল, "গুরুদেব!"

তাহার ঈষৎ স্থির মুখের দিকে চাহিয়া সকরুণস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "নীরদ,"

"আমি যদি দূর থেকে প্রায়শ্চিত্ত করি? কাছে যাবার যে আমার উপায় নেই—"

"তাতে কি প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হবে, নীরদ? তাই কি কর্ত্তব্য?"

আবার সেই কর্ত্তব্য! অধীর হইয়া নীরদকুমার বলিয়া উঠিল, "তবে কি হবে? অনেক যে দেরি হয়ে গেছে, এখন এ ভুল কেমন করে শোধরাব, তা যে কিছুতেই ভেবে পাচ্চিনে।"

গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভুল সংশোধন করে নাও।"

নীরদ এবার দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তাহার যে হাতখানা সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে ছিল, সেখানাকে সে জোর করিয়া টানিয়া লইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নীরদ! মানবের ধর্ম্ম মানবকে পদে পদে প্রলুব্ধ করে থাকে, তাই বলেই কি তাদের হাতে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করবে? বিলম্বে অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হতে থাকে, কমে না।" সন্ন্যাসী তাহার উত্তর প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর বা সাড়া না পাইয়া অবশেষে আবার বলিলেন, "পথ খুঁজে ছিলে,—এই পথ, সোজা সরল, সত্যের পথ তোমার সম্মুখে! পার, সাহস হয়, দ্বিধাহীন হয়ে কোন দিকে না চেয়ে চলে যাও, না পার—"

মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া অবরুদ্ধ স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে নীরদ কহিল, "কিন্তু আমি যদি কারও সুখের ব্যাঘাতক হই? যদি কেউ আমার কার্য্যফলে অসুখী হয়?"

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, এই মহাবাক্য ভুলে গেলে? কর্ত্তব্য কর্ম্মে এত কুণ্ঠা কেন? মনে বল কই? কি শিখলে এতদিন তবে? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত!"

চাঁদের আলোয় যে মুখ মরণাহত রোগীর মুখের মত ম্লান দেখাইতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা নবীন স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং দুই পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিল, তারপর উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার উপদেশে কর্ত্তব্য-পালনে যেন দ্বিধাহীন হই, আমার ভাগ্যে যা হয় হোক।"

সন্ন্যাসী তাহার শ্রদ্ধানত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

৩২

সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় বিরক্ত চিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল। কোন ছাত্র হয় ত কোন প্রয়োজনের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, এই কথাই তাহার মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল, যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র এখন আর একটু মোটা হইয়াছে, মাথার চুলও দুই চার গাছা সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বেশভূষার পরিপাট্য তখনকার মত কিছুই ছিলনা, কিন্তু তাহার মুখের সেই সরল প্রাণখোলা হাসিটুকুর কিছুমাত্র অভাব ঘটে নাই। ঘরে ঢুকিয়া একবার মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই যোগেন্দ্রর মুখে হাসির পরিবর্ত্তে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, "একি! তোমার কি হয়েছে?"

নীরদ তাহার বিস্ময়ের কারণ কতকটা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি? ভূত দেখলে নাকি?" তাহার হাসিটা যে তাহার লুকাইবার চেষ্টাকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিল, সেটুকু সে কিন্তু নিজেই তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল।

"ভূত আমি দেখেছি, কি কাল রাত্রে তুমি ঐ জানালায়

দাঁড়িয়ে দেখেছিলে, তা ত ঠিক বুঝতে পারচিনে। যাহোক তোমার কি কিছু বেশি অসুখ করেছে?"

সত্য সত্যই খুব একটা কঠিন পীড়া,—যাহা মানুষকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই কত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়,—নীরদের মুখে সেই রকম একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণ শত চিহ্নে সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে একটু বিচলিতভাবে সরিয়া আসিল, আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ মাথাটা ভারী ধরেছে।" খাটের দাণ্ডার উপর সে মস্তক রক্ষা করিল। মাথা ধরিবার কোন অপরাধ ছিল না।

"সেই জন্যে বুঝি কাল খেলেনা? ঠাকুর বল্লে তুমি সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে আছ, অগত্যাই আর ওদিকে বড়—বুঝেছ ত? আমি ত জানিনা তোমার অসুখ করেচে—একি! একবারও বিছানায় শোওনি নাকি? ঐ জন্যেই তো বলিরে দাদা, সাধু সন্ন্যাসীতে কি আর তোর আমার ধাত বোঝে! সারারাত্রি ধরে যোগযাগ হচ্ছিল বুঝি?"

যোগেন্দ্রর আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ হাসিল, বলিল, "পাগল নাকি! কে যোগ শিখচে? রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে যখন তখন খুব শিউরে উঠতে পার, যা হোক।"

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাঁচালে, সর্পে ত রজ্জু ভ্রম করলে? সেইটেই নাকি সাংঘাতিক।"

নীরদ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "ও একই কথা। মোদ্দা ভ্রম ত বটেই।"

"আচ্ছা, না হয় আমারই ভ্রম, কিন্তু তোমারই বা কি এ ধ্রুব

যোগ? সেই যে মতুরার অমন হাসিখুসী আমোদ আহ্লাদ খাসা বাড়ী তোফা ব্যবস্থা, চা, কফি, পাঁঠা কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না, দেশের কাজ নিজের সুখ এক সঙ্গে সবই হচ্ছিল, হুড় হুড় করে টাকা আসছিল, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত হঠাৎ কোথা থেকে দৈত্য এসে তোমার ঘাড়ে চাপল, রাতারাতি একেবারে সন্ন্যাসী!"

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া সদুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল, "সে কষ্ট যে আর ভুলতে পারচ না! শুনেছিলুম সময়ে সকলি সয়ে যায়, তোমার দেখচি ঠিক বিপরীত।"

"ভুলতে দিলে কৈ বল, সেও ত তোমার কীর্ত্তি! মাছ —এমন তোফা টাট্‌কা মাছ চোখের উপর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যাবে, রোজ দুবেলা তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখচি। উপায় নেই! যত জিভে তত চোখে জল ঝরতে থাকে, কাছে কেউ থাকলে বলি, চোখে একটা পোকা না কি পড়ল! নিজে ত আলোচাল ধরেছ যেন মা কি বাপ—"

নীরদ সকৌতুক হাস্যে যোগেন্দ্রর দুঃখ কাহিনী শুনিতেছিল। শেষের দিকটায় অকস্মাৎ চমকিয়া সে বাধা দিয়া উঠিল, "যোগেন, যাকে যা খুসী তাই বলে বসোনা। ও সব কি কথা—"

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিছুক্ষণ বন্ধুর উত্তেজিত মুখের পানে তাকাইয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "একি তুমি যে একেবারে অবাক করে দিলে! তামাসা করে কি না কি একটা কথা বলেছি, তাতে এত চটবার কি পেলে শুনি? ঐতেই বলে, উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বল্লে

মানুষ রুষ্ট। সত্যি সত্যি ত আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমায় কাছা পরাবার জন্যে স্থানচ্যুত হয়ে আসচেন না। ভক্তি কত! বৎসরান্তে এক গণ্ডুষ জলও ত এদিকে দিতে পারোনা।”

নীরদকুমার যোগেন্দ্রর পিঠের উপর একটা অধীর চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ঈষৎ ঠেলিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, “ও সব কথা ছেড়ে দাও, যোগেন, তুমি যদি সত্য সত্যই এখানে ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাক, তাহলে সে কথা স্পষ্ট করে বলেই কেন অবসর নাও না। জোর ত কিছু নেই, আর জোর করলেই বা মানবে কেন?”

যোগেন্দ্র বলিল, “বলে নাও, ভগবান মুখ দিয়েছেন বলবার জন্য, বলো। জানো কিনা, হতভাগাটাকে বঁড়শিতে বিঁধে রেখেছ, ওর আর কোথাও এক পা নড়বার যো নেই, তাই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া? তাই যদি পারবো, নীরদ, তাহলে আর মথুরার তেমন চাকরীটে খুইয়ে তোমার সঙ্গে এই বনবাসী হই? স্ত্রী পুত্র সব ছাড়িয়েছ, আরও তুমি বল তোমায় ছেড়ে যেতে চাই।”

নীরদ মনে মনে লজ্জা বোধ করিল। যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রর স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থই অনুকরণীয়। নীরদ জানিত, যে কয়জন যুবক তাহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন নহে। অন্য সকলে দেশকে ভালবাসিয়া, কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া, অথবা যশোলিপ্সা লইয়া যে কার্য্যের জন্য তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল, যোগেন্দ্র সেই কার্য্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, শুধু

তাহাকে ভালবাসিয়া ! ইহাও নীরদ জানিত যে সেইটুকু পাইবার জন্য সে বেচারা ঘরে অনেকখানি নির্য্যাতনও ভোগ করিয়া থাকে। পাছে নীরদ মণিমালার চরিত্রের এই সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়েই যে সে এই কয়মাস তাহাকে এখানে আনিতে অবধি সাহস করে নাই, এ কথাও নীরদ যে একটু আধটু না বুঝিয়াছিল এমন নয়। একবার সে একটু আভাষে সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টাও করিয়াছিল,"গিন্নির কাছে অভিশপ্ত করো না ভাই,দেখো।"

যোগেন্দ্র কথাটা হাসির মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া কষ্ট কল্পনার সহিত জানাইয়াছিল, তাহার স্ত্রী তেমন নয়। বিশ্বাসের ভাণ করিলেও নীরদ তাহা ঠিক বিশ্বাস করিত না। আজ কথাটা একটু কঠিন হইয়া গিয়াছে। বিদ্রূপ বলিয়া যোগেন্দ্র তাহা উড়াইয়া না দিয়া গায় লইয়া অভিমান প্রকাশ করিল, তাহাব সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু কথা যোগাইল না। নীরদ চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র আরও একটু আশ্চর্য্য হইয়া দুই একবার তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, কিছু বুঝিতে পারিল না। নীরদের ব্যবহার আজ তাহার হৃদয়ে প্রথম আঘাত করিল। সে ত নীরদের নিকট তাহার জীবনের কোন সামান্য কথাটিও লুকায় না, কিন্তু নীরদ নিজের চিন্তা লইয়া এত দূরে সরিয়া থাকে যে কোনখান দিয়া যেন তাহাকে স্পর্শ করাও যায় না।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, আজ নীরদ অসুস্থ এবং তাহার আহার হয় নাই। মুহূর্ত্তের জন্যও যে সে বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, ইহা ভাবিয়া অনুতাপের ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই তাহলে—"

নীরদ মুখ তুলিয়া দেখিল, মাথা নাড়িয়া বলিল,“না,না, ডাক্তার কি হবে, তেমন কিছু ত হয়নি।”

“সেকি, মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! তবে না হয় থার্ম্মোমিটারটা আনি, নিশ্চয়ই তোমার শরীর বেশি খারাপ আছে—”

যোগেন্দ্র উঠিল। নীরদ ডাকিল, “না, না, ওসব কিছুই করতে হবে না। যোগেন, যোগেন, শোন, ওহে,—এসনা একটু গল্প করা যাক, একটা কথা আছে—”

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া বলিল, “অসুখটা বাড়িয়ে কি হবে?”

“বেশ ত তোমরা না হয় একটু সেবা যত্ন করবে, পারবে না?”

“রা অর্থে? রা আর আছি কই?”

নীরদকুমার হাসিয়া কহিল, “হওনা কেন, তোমরা! আমি কি বারণ করেছি, বিরহের পালা সাঙ্গ করে মিলনান্ত নাট্য রচনা কর আমি দেখে যাই—”

“কি বল্লে, দেখে যাই? অস্যার্থ?”

“ঐযে বল্লুম একটা আছে, এটা সেই তারই সূচনা।”

“সূচনা শুনেই ত হৃৎকম্প উপস্থিত। এখন আরম্ভ কর, দেখা যাক, কোথায় গিয়ে শেষ।”

প্রাতঃকালে নীরদের গুরু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। নীরদ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পর পারে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল। বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু অন্যমনস্ক হইবার আশায় ঘরটার চারিদিকে একবার প্রত্যাশিত নেত্রে ভাল করিয়া সে চাহিয়া দেখিল। ঘরের দুই কোণে দুইটা আলমারি পুস্তকে ভরা আছে, বাংলা সংস্কৃত ইংরাজী সকল ভাষার কিছু কিছু ভাল বইই তাহার সংগৃহিত ছিল। ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ ও মূল

সংস্কৃত ধর্ম্ম পুস্তকের উপরই ইদানীং তাহার সবটুকু অনুরাগ জমা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য কাব্যগুলা এতদিন অনাদৃত ভাবে একপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। আজ ম্যাক্সমূলারের উপনিষদের সংগ্রহ একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ঈষৎ ক্লান্তভাবে উপরের তাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্ব্বস্মৃতির সবটুকু মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে হাসিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া, নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো ও তাহার উপরে পিতলের উপর সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল এখনও তাহার শুষ্ক হৃদয়টির ভিতর হইতে ক্ষীণ শেষ সুরভি দান করিয়া সফলতার গৌরবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আসন্ন মরণের পানে চাহিয়া সে যেন হাসিয়া বলিতেছে, 'সবটুকু দিয়া দিয়াছি, অনুতাপ করিবার, শেষ করিবার কিছু বাকি নাই, এখন আমায় তুমি গ্রহণ করিতে পার, আমার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।' বাতাস তাহারই সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেও শুধু লইয়া শেষ করিতে প্রস্তুত নয়, দিতে চাহে। বইখানা খুলিতে প্রথমেই চোখে পড়িল—

"All look for thee, Love, Light and Song,
Light in the sky deep red above,
Song in the Lark of pinions strong,
And in my heart, true Love.

Apart we miss our nature's goal,
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my Love for thy Soul ?
Thy beauty for mine eyes ?
No longer sleep, oh, listen now :
I wait and weep, but where art thou ?

ছত্রগুলি অত্যন্ত ভাল লাগিল। 'And in my heart true Love' সে দুইবার উচ্চারণ করিল। true love ! হ্যাঁ সত্যই তাই, ইহাকেই true love বলে। স্বার্থ সিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ সে সব কি প্রেম ? ভুল, ভুল, সে ভুল বুঝিয়াছিল। সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে সবেগে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া সে ছুটিতেছিল, তাই সত্যের অধীশ্বর তাহার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার অমোঘ বজ্র নিক্ষেপে তাহার গতি প্রতিহত করিয়া দিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা ও সেই সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। নীরদ অন্তরের মধ্যে একটু লঘুতা বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত বলিয়া ভয় ছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল, তাহা উপরের সামান্য আঁচড়মাত্র, ভস্মচিহ্ন নয়।

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরি, তুমি সত্য ! দেখ কখনো তোমায় মানিনি, আছ কি না আছ এ বিষয়ে চিরকাল ধরে বিষম সন্দেহ পোষণ করে এসেছিলাম, আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্ব্ব যে তুমি আছ, আছ আছ, এই পৃথিবী ব্যেপেই আছ।"

নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হঠাৎ বেল্লিকের মুখে

তাঁহার নিকট একটা দুরূহ কার্য্যের মধ্যে ঠেকিত, সেই জন্য সব ঠিক করিয়াও অনেক সময় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ বিনোদকে প্রত্যহ ট্রেনে চাপাইতে ও তাঁহার সাহসে কুলাইত না, ভাবিতেন, 'তার চেয়ে যেখানে আছে, ভাল আছে, থাক্, একেবারে ছুটী হইলেই আসিবে'।

রজনীনাথ তাঁহার কলিকাতার উকীল। তাঁহাকেই সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া তিনি চিঠি-পত্র লিখিতেন। বয়সে নবীন হইলেও রজনীনাথের উপর তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সংস্পর্শে পুত্রের নৈতিক চরিত্রোন্নতি ও বুদ্ধি-বিবেচনার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাসেই তিনি রজনীনাথের হাতে বিনোদের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রজনীনাথের নিকট সংবাদ পাইতেন বলিয়া অনেক সময় বিনোদের চিঠির উত্তর দেওয়াও তিনি প্রয়োজন বোধ করিতেন না। বাটীতে সেই সময় ভাগবত কথা হইতেছিল, ভক্তিগদ্গদচিত্তে পুরাণ শ্রবণ করিয়া এবং দেওয়ান ও নায়েবের সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার নিরানন্দ দিনগুলা একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে বিনোদ বাড়ি আসিল বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া সে শান্তি খুঁজিয়া পাইল না। এতদিন পরে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, আত্মীয়ারা চোখ মুছিতে মুছিতে গায় মাথায় হাত বুলাইয়া নানা ছন্দে জানাইলেন যে জীবন্মৃত শরীরে তাঁহারা প্রাণ পাইলেন! কিন্তু কই পিতাতো একটি কথাতেও তাঁহার কয়মাসের বেদনার কোন আভাষই দিলেন না, বরং প্রফুল্লভাবেই দেওয়ানকে বলিতেছিলেন, "পণ্ডিতটিকে নিয়ে ক'মাস

হরিধ্বনি শুনলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! লক্ষণ ত বড় শুভ মনে হচ্চে না, যোগেন?"

যোগেন্দ্র নীরদের পৃষ্ঠে একটা প্রবল চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "তোমার শুভ লক্ষণ মনে হচ্চে না? আমার কিন্তু এই লক্ষণটা বড়ই সু বলে মনে হচ্চে, কি বলব দাদা যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি আজকের মত পেতুম, তাহলে একবার আহ্লাদটা প্রকাশ করে দেখাতুম। আমার ইচ্ছে করচে আনন্দে হয় নেচে, নয় গলা ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি।"

"কেন হঠাৎ তোমার হল কি, বল দেখি? শ্রীমতী মণিমালা তবে আজই আসছেন, কেমন?"

"তিনি আসছেন কাল, কিন্তু তা নয়, নীরদ, কি বলব তোর ওই রুচি পরিবর্ত্তনটা দেখে আমার যে কি আনন্দই আজ হচ্চে ভাই, তা আর কি বলব!"

যোগেন্দ্র খুব উৎসাহিত হইয়া আবার বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "বেঁচে থাক ভাই, আমার বড্ড ভাবনাই হয়েছিল এখন আবার আশা হচ্চে—"

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সরিয়া গিয়া ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "বেওয়ারিস মাল পেয়েছ, যোগেন! পিঠখানা ভেঙ্গে দেওয়ায় তোমার কোন লাভ দেখিনে! হঠাৎ অতটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর।"

যোগেন্দ্র নীরদের পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কহিল, "যাই বল ভাই, আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলুম। গম্ভীর মুখ আর 'ভাষ্য ভস্ম' আমার প্রাণটাকে একেবারে চেপে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। তোমার মুখে শেলি,

বারণ্স, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত মিষ্ট শোনায়! ও গলা কি মোহমুদ্গর আবৃত্তি করবার জন্যে? তুমি যে খোদার উপরও খোদাগিরি করছিলে। তিনিও—আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম—তোমার অতটা বিদ্রোহ বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।"

নীরদা সহসা যেন পাপভীত সরলচিত্ত শিশুর মত চমকিয়া উঠিল, "সত্য যোগেন! তাই কি? আমি কি বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলুম?"

যোগেন্দ্র কহিল, "ছোটবেলা থেকে শিবপূজা করে কুমারী মেয়েরা তাদের কল্পনা মন্দিরে যে দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করে এসেছে, সেই তাদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে ভগবান কি না এমন কন্দর্প কান্তিকে ছাই ঢাকা দেবার জন্যে তৈরি করে রেখেছেন, তিনি এমনি অবিবেচক। না, না, নীরদ, যাকে যা মানায় না, জেনো, সেটা তার জন্যে নির্দ্দিষ্টই হয়নি, আর আমি জানি, সেটা তার বেশি দিন সয়ও না।"

নীরদ চুপ করিয়া রহিল, নিজের অতখানি প্রশংসার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। যোগেন্দ্র একি বাতুলের মত কথা বলিতেছে? তাহার জন্য ব্যগ্র কে? উপেক্ষিত অপমানিত, সে! তাহারই এত স্তব গান? তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র বিষাদের ক্ষীণ হাসি ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখে বিদ্রূপের তরল উচ্চ হাস্যের পরিবর্ত্তে একটু ক্ষীণহাসির আভাষ দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। রাখিয়া খরচ করিবার কথাটাও মনে পড়িয়া গেল। কথা ফিরাইবার চেষ্টায় সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল কথা সেই যে তুমি একটা কি কথা বলবে বলেছিলে?"

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে ত্রস্ত হইয়া উঠিল, "বলবো এখন।"

"কখন বলবে, পাঁজি আনতে হবে নাকি? তারপর দুখানা নৈবেদ্য, একটা শাঁক, ফুল ও চন্দন—"

নীরদ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "জ্বালিও না, থামো, কি বলবো?"

"যা বলবে, বলেছিলে।"

নীরদ সহসা বলিয়া উঠিল, "কি বলা উচিত বুঝতে পারচি না—" তাহার চোখ মুখ গরম হইয়া উঠিল, মাথা ও মুখের ভিতর উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটি স্কুলের ছেলে ঘরে ঢুকিয়া একটু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। নীরদ তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলচো, সুধীর, বিনয়?"

সুধীর সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আপনি আজও কি বাগানে যাবেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?"

বালকের এই কথাকয়টা আচমকা নীরদকে যেন প্রহার করিল। ছি ছি, কি স্বার্থপর সে, নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছে!

তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আজ নীরদের শরীর ভাল নেই। সুধী, বিনু, তোমরা খেলতে যাও, কাল থেকে তোমাদের খেলার সময় আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব, দেখো।"

বালক দুইটিই এক সঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেদনার একটা অশ্রুপূর্ণ রেখা তাহার মুখের উপর কম্পিত হইতেছিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল, "তবে থাক, এসো সুধীর।" তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাহাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাহাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে অনুতপ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "চলো, আমি যাচ্চি, আজ তোমাদের ম্যাচ আছে, না?"

বিনয় ফিরিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল, "সেত কাল হয়ে গেছে।" সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছলছলভাব সরিয়া যায় নাই। সে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে দৃঢ় বচনে বলিল, "আপনার শরীর ভাল নেই, আজ থাক।"

"তা হোক, আমার কিছু কষ্ট হবে না, এসো।" ইহা বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। খেয়ালী লোকদিগের চরিত্র বুঝা তাহার সাধ্যাতীত, সে কথা সে পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, আজ আর নূতন করিয়া কি বলিবে?

ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল, যাহারা না খেলিতেছিল, তাহারা আপনাআপনি দাঁড়াইয়া হাসি গল্প করিতেছিল। ছোট ছোট চারাগাছগুলি বিকালবেলার বাতাসে তাজা হইয়া ঈষৎ মাথা কাঁপাইতেছিল। অদূরে নদীপারে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা কিরণটুকু ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়টির মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না?"

সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছিল। সে সেই হাতখানার উপর অল্প ঝুঁকিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

"আমি যদি কিছুদিন এখানে না থাকি ?"

ক্ষুদ্র মুষ্টিতে তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সুধীর গম্ভীরকণ্ঠে শুধু কহিল, "না।"

এই পৃথিবী এত সুন্দর! এই স্নিগ্ধ বায়ু, এই প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ ঐ আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া-আসা হাস্যমিশ্র কলরব, এখানকার কিছুই ত নিরাশার অন্ধকার গায় মাখে না! উত্তাপে তাহারা ম্লান হয়, আবার বাতাসে হাসিয়া উঠে, অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলোকস্পর্শে জাগিয়া উঠে। এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদের সহিত সে কেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না ? আর সবার উপর এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু তাহার জন্য জমা করা রহিয়াছে, এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলির দুইটা ফুলই যে তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল! কে কি পায়! সে ত অনেক পাইয়াছে! তাহার জীবন ব্যর্থ নয়, ধন্য!

৩৩

সেদিন ও তার পরদিনটা নীরদ যোগেন্দ্রর হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রয়োজন তাহার নিজের, কথাটা প্রথম সেই-ই তুলিয়াছে, বলিবার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুক যেন কাঁপিয়া উঠে! বুকের ভিতর ঢুপ্ ঢুপ্ করিয়া একটা অস্বাভাবিক ধ্বনি উঠিতে থাকে, হাতপায়ের তলাগুলা অসাড় হিম হইয়া আসে।

কিছুতেই এ দুর্ব্বলতার হাত হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিয়া ব্যর্থ ক্ষোভে মনে মনে জ্বলিতে থাকে।

মণিমালা তাহার দুইটি পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলে যোগেন্দ্রর হাত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইল মনে করিয়া সে একটু আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন সে শয়ন করিতে গেল তখন কল্যাণময়া জননীর মত সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার শ্রান্ত ললাটের উপর কোমল হাতখানি বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবনসংগ্রামে হৃদয়ের সহিত ধস্তাধস্তি, বিদ্রোহী চিত্তকে সহস্র প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে মুখের ভাবে গলার সুরে কথার ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশের শত ছিদ্র হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা!

তখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। দূরে পূর্ব্বাকাশের একটি প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পাখীরা সদ্য জাগ্রত শিশুশাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছিল। দুইটি পক্ষীদম্পতী একটি গাছের ডালে কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বালকদিগের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাম্ভীর্য্যময় ঝঙ্কার দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ প্রভাতের বাঁধা বীণায় সুর চড়াইয়া দিয়া, বাতাসে ও আকাশে কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাহাদের সহিত

যোগদান করিল। জননী প্রকৃতি যেন নিজে হাতে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত সঙ্কোচ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

আহারে বসিয়া যোগেন্দ্র চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "রান্নাটা আজ কেমন লাগচে, বল দেখি? তুমি যাই বল, এই শৃঙ্খলা প্রাণভূতা হি নারী বিহনে আমি ত আধপেটা খেয়ে আধখানা শুখিয়ে গেলুম।"

নীরদ ফুলকপির ডাল্‌নাটা আর একটু চাহিয়া লইয়া যোগেন্দ্রর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া দেখাইল যে, সেও এইখানটায় তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত।

কেশব, মণীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও সতীশ মিলিয়া তাহাদের রবিবারের বিশ্রাম অবসরটিকে যখন জমাইয়া তুলিয়াছে, এমন সময় নীরদ আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেদের মধ্যে যাহারা কোন কিছু পড়িতেছিল—বই হইতে চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, যাহারা গল্প এবং তর্ক করিতেছিল,তাহারা তাহার দিকে ফিরিয়া বসিল। কেশব একখানা মাসিকপত্র তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "রজনীবাবুর একটা প্রবন্ধ আছে, দেখেচেন?"

নীরদ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না, দিও, পড়ব এখন।" সে কি যেন একটা কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্কোচ কাটাইতে পারিতেছিল না। কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে নীরদের সাড়া পাইয়া ছবির খাতা ও সংগৃহীত দেশলাইএর ছবি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। নীরদ তাহাদের কাহারও মাথায় কাহারও পিঠে একটু হাত বুলাইয়া দিয়া

কাহাকেও নিজের কাছে একটু টানিয়া লইয়া আদর দেখাইল, তারপর বিনয়ের কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলা অঙ্গুলি দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে সেইদিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি কাল একবার কিছুদিনের জন্য এখান থেকে যাব মনে করেছি, তোমরা আমার অনুপস্থিতির সময়টা বেশ সাবধানে থাকতে চেষ্টা করো।"

যে সাত বছরের ছেলেটি তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে কোলের মধ্যে ঘেঁসিয়া আসিল। যে হাত ধরিয়াছিল, সে হাতটা চাপিয়া ধরিল। মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবেন, বাড়ী ?"

"বাড়ী ? না, হাঁ, বাড়ীই যাব।" এই বাড়ীই যাব কথাটা বলিতে বলিতে পরিত্যক্ত গৃহের একটি সুখস্মৃতিপূর্ণ চিত্র তাহার মানসনেত্রে নিমেষমধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার পানে সেই মুহূর্ত্তেই যেন তাহার দুই স্নেহ কণ্টকিত ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়া করুণায় অবরুদ্ধবাক্ হইয়া ডাকিয়া বলিল, "এস ফিরে এস, আমার কোলে এস, তোমার ঘরে এস, আর কেন, এস, এস এস !"

নীরদ অন্তরের মধ্য হইতে সাড়া দিল। জোর করিয়া বলিল, "যাব, তোমার কাছেই যাব, যে দণ্ড দিতে হয়, তুমিই হাতে করে দিও।"

সেইদিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কাননপথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন খঞ্জনি বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল,

"সামাল মাঝি এই পারাবারে, বান ডেকেছে সাগরে।
এবার তোমার দফা হল রফা, পড়ে গেলে ফাঁপরে।"

তখন পার্শ্বেই বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের

সহিত শত শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। জীবনব্যাপী মহাসমরের কাল প্রাতেই সমাপ্তি। তারপর—? আঃ কি সে অপূর্ব্ব শান্তি! লুব্ধ বালকের মত সে আপনাকে আপনি ভুলাইতেছিল। গান—একটা সামান্য ভিক্ষাজীবী গ্রাম্য বৈরাগীর অশিক্ষিত কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরটুকু মাত্র, সারাদিনের ধূলি-রৌদ্র-মাখা ক্লান্ত চিত্তের একটু আত্মতৃপ্তি! কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুর ঠেকিল। সেও যেন তাহার সঙ্কট বুঝিয়া এই দুরন্ত পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে! বান ডাকিয়াছে, যদি সে সতর্ক না হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র তরীখানি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

কয়দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া আর সব বিষয়গুলার সে এক রকম মীমাংসা করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু একটা দুর্দ্দমনীয় লজ্জা সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। লক্ষ্মীপুরে সে কাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শান্তির স্বামীকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া বসিয়াছে, সে দান আবার ফিরাইয়া লইবে? নীরদের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃপুন নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে দম যেন আর একটুও নাই! সামলান বুঝি দায় হয়, যাত্রী এবার ফাঁপরেই পড়িল। সম্ভফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলা সকৌতুকে তাহার লজ্জাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শীতের কনকনে বাতাস গায় তীরের মত বিঁধিয়া ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল। অনেক দূর হইতে ক্ষীণ

সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও শুনা যাইতেছিল, কিন্তু সব ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কলা ঝাড়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে সুগভীর লজ্জা দ্বিধা জোর করিয়া, পরিত্যাগ করিতে চাহিল!

"আমায় যেতেই হবে, আমি যাব। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তাই করব। আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

নীরদ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার অপর দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল। তাহার ঘরে টুলের উপরে একটি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছিল। যোগেন্দ্র আলোর কাছে একখানি চৌকিতে বসিয়া খপরের কাগজ হইতে পুনঃপুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল।

নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল, "হ্যালো ম্যান! তোমার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না, হল কি? কেবলই ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস—না, আর কিছু?"

নীরদ যোগেন্দ্রর চৌকি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "না আর কিছু না।"

"I wait and weep but where art thou? শুধু তাই?"

"তাই, কিন্তু যোগেন! তামাসা যাক, কাজের কথা বল, আমার কথার উত্তর কই?"

"আমার প্রশ্নটারই উত্তর কেন প্রথমে হোক না! তোমার মতলব কি?"

"কার মনে কখন কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় সব খুলে

বড় আনন্দেই কাটান গেছে, কি বলো হে!" হায়ে মাতৃস্নেহবঞ্চিত হতভাগ্য, এ জগতে কোথায় তোর আশ্রয়?

শ্যামাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কোন কষ্ট হয়না তো?"

এ প্রশ্নে বিনোদ প্রথমটা মনে করিয়াছিল, উত্তর দিবে, 'হয় বই কি, খুব হয়', কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিয়া গেল! সে শুধু নতমুখে উত্তর করিল, "না"।

"রজনীর সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হয়, না?"

"হ্যাঁ"।

"তিনি খুব যত্ন করেন, বোধ হয়? বড় ভাল লোক তিনি, তাঁর কাছে তোমায় রেখে নিশ্চিন্ত আছি।"

বিনোদ মুখ নত করিয়াই বসিয়া রহিল! তাহার মা তাহাকে তাহার পিতার কাছে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সেই কথাই কেবল মনে পড়িতে লাগিল। যাহা থাকিবে না, তাহা অতখানি কেন সে পাইয়াছিল! বুঝি, তার সব পাওনা একেবারে মা মিটাইয়া দিয়া গিয়াছেন!

শ্যামাকান্ত তাহার মুখে বেদনার অস্ফুট রেখা দেখিতে পান নাই, বলিলেন, "একটা ভয় করে, সহরে বড্ড গাড়ি ঘোড়া! ট্রামোয়েতে আবার একটা মানুষ মারা কল হয়েচে, ঐ গুলোর জন্যই বড় ভাবনা হয়।"

বিনোদ বলিতে গেল, 'তার জন্য ভয় কি? আমিতো নেহাৎ ছেলে মানুষ নই'! কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল! তবু একটা ভাবনা—একটুখানি ভয়ও ত আছে, থাক্ না কেন, এইটুকুই বা কেন সে ছাড়ে?"

পূজার ছুটীতে রজনীনাথের সঙ্গে সে বেড়াইতে গেল। শ্যামাকান্ত

বলা যায়? তবে এই, পর্য্যন্ত বলচি, মন্দ কিছু নয়, গুরুদেবের আদেশে আমি যাচ্চি।"

যোগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিবার ভাণ করিয়া কহিল, "ঐ ত ঐখানেই যে গলদ ঘটল। তাঁর যে একটি তল্পি বয়বার চেলার দরকার হয়নি, সে ভরসা করব কি করে? তোমার ভাগ্যবন্ত হবার আর দেরি নেই।"

লজ্জাই লজ্জাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল, "আমার ভাগ্য, তা ভাগ্য বই কি, সে রকম ভাগ্য আর হল কই? পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা ছাড়া তার আর কোন পথ নেই—"

যোগেন্দ্র বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইল না, সে মাথা নাড়িয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ, এটা বোঝ না! মহা মহা পাপীরাই ত শেষকালটা বড় বড় সাধু হন। 'জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরি নামের তরে গেল।' আর জান ত, মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব ইতিহাসটা? যত দেখবে, মস্ত জটা,ততই তাঁর পূর্ব্ব লীলার সন্ধান নিতে থাক,দেখবে যে, অনেকেই বাদ পড়বেন না।"

নীরদ আর একখানা চৌকি টানিয়া বসিতে বসিতে ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "যোগেন!"

"সত্যমপ্রিয়ম্ বলতে শাস্ত্রকারের মানা আছে বটে, কিন্তু আমার কি স্বভাব, সকল সময় আমি সব নিষেধগুলো মেনে চলতে পারিনে।"

তারপর একটু গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এখন ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক— ব্যাপার হচ্চে এই

যে, তুমি আপাততঃ কোন অজ্ঞাত মৎলবে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হচ্চ। না হয় পর্য্যটনে বেরুচ্চই বললুম। এখন তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এখানকার সব দায় ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, এই তোমার অনুরোধ—না, তাই বা কেমন করে বলি, এই রকম তোমার হুকুম! তা মহাশয়ের এ খেয়ালের সম্বন্ধে আর একটু আলো পেতে পারি ?"

"ও সব কায়দা কানুন ছেড়ে সাদা কথাটা কি বলে ফেল দেখি ?"

"আমি ত সাদা কথা কইতেই চাই, তোমরাই কইতে দাও না। এই ভারবাহী গর্দ্দভ কতদিন এ রকম শিকলি বাঁধা থাকবে ?"

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল, "তা ত জানিনা, হয় ত খুব শীঘ্রও হতে পারে। আর হয় ত অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে, কি জানি যোগেন, কি হবে !"

নীরদের স্বর কম্পিত হইতেছিল। যোগেন্দ্র জানিত, ভাবুক লোকদের কথাবার্ত্তা চাল-চলন সাধারণ লোকদের সহিত ঠিক সমান নিয়মে চলে না। সে কহিল, "তোমার আদেশ কবে অগ্রাহ্য করেছি, কিন্তু একটা কথা, এই বৎসবৃন্দ নিয়ে দিনরাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময়টা পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে উঠতে হবে, সেই সময়টিতেই যে ঠিক মানভঞ্জনের পালা গাইতে খুব ভাল লাগবে, এমন ত ভরসা করা যায় না। তাই ভাবচি উপরের ঘরগুলো ওঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারীবর্জ্জিত গৃহে আস্তানা গেড়ে একবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে—নৈলে আর পারা যায় না।"

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গ করিল, "যো থায়া উওভি পস্তায়া।"

"বল বল আর যো নেহি খায়া, দেখতে পাচ্চি মশায়, অন্ধ নই, ওভি পস্তায়া। প্রশ্নময় জগতে দেখচি প্রশ্নের জড় আর মরেনা, দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর তুমি দিতে পারবে বলে আশা হচ্চে। কোথায় যাচ্চ? কোন দেশে?"

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে এমন প্রবলভাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল যে তাহার নিশ্বাস আটকাইবার মত হইয়া আসিল। কষ্টরুদ্ধশ্বাসে মাটির দিকে চাহিয়া সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "মাপ করো ভাই, আজ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করোনা।"

যোগেন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল, "এত লুকোচুরি কিসের বল ত শুনি? তা যাও। যদি সঙ্গিনী সংগ্রহে ইচ্ছা হয়ে থাকে ত বলে যাও, আমি মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখি, আর যদি—ওকি, চমকালে যে, ঠিক ধরেচি নাকি? দেখ, আজ তোমায় বলি, শান্তিকে ভালবেসেও তুমি যখন তাকে পাবার চেষ্টা করলে না, তখনই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার আত্মলীলায় কোথাও কোন গলদ আছে। কে সে ভাগ্যবতী শুনি, এতদিন পরে যার কপাল ফিরল? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হবে, নৈলে এখনও আইবুড় বসে আছে! ওকি, নীরদ, রাগ কল্লে?" যোগেন্দ্র সহসা লজ্জা-জড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিবার জন্য তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহার বন্ধু তাহা লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়া বেত্রাহতের মত চমকিয়া দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে কিছুক্ষণ

অস্থিরভাবে বেড়াইয়া পরে স্তব্ধভাবে জানালার নিকট আসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদি তাহার বন্ধু যোগেন্দ্র তখন হতবুদ্ধি না হইয়া একটা আলো হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধেরই চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। যোগেন্দ্র তাহার বন্ধুকে দেবতার মত পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত বলিয়া জানে, সে যখন জানিবে সে তাহা নয়! ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে চাঁদ উঠিল। জানালার নীচে টবের মধ্য হইতে চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ আসিতে লাগিল, শাখা-বিরল সজিনা গাছের উপর হইতে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে বাতাসে ডানা মেলিয়া জানালার নিকট দিয়া উড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে নীরদ পূর্ব্ব কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে যেখানে সে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই থানটিতে সেই অবস্থায় যোগেন্দ্র তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখ অনুতাপের গ্লানিতে পরিপূর্ণ। নীরদ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যোগেন, তাই বলো, বরণডালা সাজাতেই বলো, আমি আমার স্ত্রীকে আনতে যাচ্চি।" তাহার জিহ্বায় তখন আর একটুও জড়তা ছিল না।

যোগেন্দ্রর কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চিৎকারের মত বাহির হইয়া পড়িল, "তোমার স্ত্রী ?"

নীরদ উত্তর দিল, "হাঁ, আমার পরিত্যক্তা, অত্যাচারিতা পত্নী, শিবানী!"

সম্মুখে কোন অশরীরী মূর্ত্তির ছায়া দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পলাইতে যায়, তেমন করিয়া পিছাইয়া গিয়া অস্ফুটকণ্ঠে যোগেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি, তবে তুমি, শাস্তির—"

পরিত্যক্ত চৌকিখানা সরাইয়া তাহাতে বসিয়া নীরদ স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল, "হাঁ, কিন্তু যোগেন ও-সব কথা নিয়ে আলোচনা এখন থাক। প্রতিজ্ঞা কর, আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করবে না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা।"

৩৪

গড়ের মাঠের নির্জ্জন রাস্তা ছাড়াইয়া একখানা গাড়ি অফিস কোয়ার্টারের জনহীন প্রকাণ্ড বাড়িগুলাকে অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকচলাচলপূর্ণ আলোকিত হাবড়ার পুলের নিকট আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সেই সময় স্তব্ধ শান্তি বিস্মিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত পথ দুই জনে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। কেহ কাহারও সহিত একটি কথা কহে নাই।

হেমেন্দ্রও একবার চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারের আলোকস্তম্ভ হইতে অত্যুজ্জ্বল, তীব্র একটা আলোকচ্ছটা গাড়ির ভিতরকার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের মুখে পড়িল। হেমেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে

দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি সন্দিগ্ধচিত্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "হাবড়া ষ্টেশনে নিয়ে এল যে?"

হেমেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই এমনভাবে সে বসিয়া রহিল। শান্তির বুক কি এক নূতন আশঙ্কায় সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। চঞ্চলভাবে সে পিছনের দিকে খড়খড়ি টানিয়া আবার উৎকুণ্ঠিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিল। গঙ্গার জলে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে। অগণ্য নক্ষত্র এখানে প্রভাহীন, সাদা ও লাল ফুলে গাঁথা মালার মত পশ্চাতে আলোকের শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "গাড়োয়ানটা ভুল করেচে, আমাদের শেয়ালদায় না নিয়ে গিয়ে হাবড়ায় নিয়ে এল।" হেমেন্দ্র এবারও কোন উত্তর দিল না।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তির নামিবার কোন চেষ্টা নাই দেখিয়া সে বলিল, "নেমে এস। একখানা গাড়ি বোধ হচ্চে, দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

শান্তি নামিল না, বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়াই বসিল! হেমেন্দ্রর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতায় গভীর বিরক্তিতে তাহা আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সে ডাকিল, "শুনছ, নেমে এস।" শান্তি দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্চ, তা না বল্লে আমি নামবো না।"

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখের উপর এমন জোরের

সহিত প্রতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে ইহা মনে হয় নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিন শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার সে ভর্ৎসনা নারী-হৃদয়ের উদ্যত অভিমানাশ্রুরাশির মতই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে এ কি কঠোরতা, এ কি বিচারের অলঙ্ঘ্য আদেশের কঠিন স্বর! হেমেন্দ্র ঘোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। সামান্য কীটপতঙ্গগুলাও তাহাকে এখন হইতে অপমান করিতে পারিলে ছাড়িবে না, বোধ হয়! অদূরে গাড়ি ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। স্বল্পসংখ্যক লোক কেহ মাথায় মোট, কেহ ব্যাগ হাতে ছাতা বগলে প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র উদ্যত রোষাগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির এস, এখনও। যদি এ গাড়ি না পাই, তা হলে হয়ত সকাল অবধি বসে থাকতে হবে।"

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু হেমেন্দ্রর অনুসরণ করিল না, প্রাচীরের গায় পিঠ রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্য যখন সে দাঁড়াইল, তখন হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল, শান্তি তাহার সঙ্গে আসে নাই! দারুণ বিরক্তি ও অপমানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টিকিট না কিনিয়াই সে ফিরিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল। দূরে আলোকের মালা ঈষৎ হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকজনও খুব বেশি চলিতেছে না। ষ্টেশনে প্রবেশ-পথের সম্মুখে কতকগুলি থার্ড ক্লাসের

যাত্রী গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছোট বড় বোচকা পার্শ্বে রাখিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। ক্রুদ্ধস্বরে হেমেন্দ্র বলিল, "এ কি রকম ব্যবহার, তোমার, শান্তি? শুধু শুধু ট্রেণটা ফেল করালে!"

শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মুছিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "বলেছি ত আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চো, না বল্লে আমি যাব না। কোথায় যেতে চাও, তুমি?"

হেমেন্দ্র এবারও বিস্ময় বোধ করিল, কিন্তু নিজেকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত করিতে আর সে সাহস করিল না। দিনের আলোকে কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের চোখে এই অবস্থায় যদি সে পড়িয়া যায়, তাহার চেয়ে অপমান আর কিছুই নাই। স্বরটা একটু কোমল করিয়া সে বলিল, "কোথা যাচ্চি, তা কেমন করে বল্‌বো বল? আমাদের স্থান কোথায়? যেখানে হয়, কোথাও যাই, এস।"

শান্তি রুদ্ধস্বরে বলিল, "না, আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাব। কেন, তুমি এখানে নিয়ে এলে? চল, ফিরে যাই। সেখানে না, গিয়ে আবার কোথা যেতে চাইছ?"

শান্তির চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার স্বর কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের সহিত তীব্রকণ্ঠে কহিল, "এ জন্মে আর নয়। জাহান্নমে যাব, সেও ভাল, তবু সেখানে নয়। তোমার খুসী হয়, তুমি যাও।"

চারিদিকের আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া উষার অল্লোজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না। কিন্তু গত দিবসের বৃষ্টির চিহ্ন রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল। লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দে ষ্টেশন ভরিয়া উঠিল। শান্তির

ঠোঁট কাঁপিতেছিল, প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। তাহার পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির স্বরে কহিল, "বেশ, তাই হোক, আমি জ্যেঠামশায়ের কাছেই যাব।" রোষে ক্ষোভে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন দাবী নাই! যে স্ত্রী ভিন্ন তাহার যথার্থ আপনার বলিতে আর কেহই নাই, সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে! সে কি এমন অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল! কিন্তু না! হেমেন্দ্র তাহাকে কিছুতেই এখন হাতছাড়া করিতে পারে না। সেই এখন তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র অবলম্বন।

হেমেন্দ্র বড় বিপদে পড়িল। শান্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজের মতে লইয়া আসা সম্ভবই নহে। এদিকে আর কতক্ষণই বা এমন করিয়া সাধারণের কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকা যায়! কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমলভাবে সে কহিল, "দিনকতক পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি, চল।" কথাটা এমন অসঙ্গত যে, নিজেই কেমন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিল। শান্তির মুখেও একটা অবিশ্বাসের ছায়া ফুটিয়া উঠিল,—সেটুকু হেমেন্দ্রর দৃষ্টি এড়াইল না, অপ্রতিভ হইয়া সে থামিয়া গেল। তার পর আবার বলিল, "যাবে না?"

শান্তি কথা কহিল না, শুধু তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল, "না।"

ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রর আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। কিন্তু সে কেমন করিয়া এই শান্ত শিষ্ট লজ্জানম্র শান্তিকে,—যে তাহার একটা মিষ্ট কথার জন্য লালায়িত, তাহার কৃপাদৃষ্টির

উপর মাত্র যাহার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে,—কেমন করিয়া তাহাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে, ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে ত আর তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না!

চারিদিকের লোক হাঁ করিয়া তাহার দিকেই চাহিয়া আছে! হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া আরোহীরা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেমের হাত ধরিল, "আরে ছোট বাবু যে, কোথায়?" বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শান্তির পানে সে চাহিল, "বৌদিও সঙ্গে যে! ব্যাপারখানা কি, বল ত? যাওয়া হচ্চে, কোথায়?"

শান্তি যোগেশকে দেখিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র যেন সেদিকের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। যোগেশকে পাইয়া সে এই সঙ্কটের মধ্যে যেন একটা কূল পাইল। কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত সে উত্তর দিল, "পশ্চিম।"

"পশ্চিম!" বলিয়া যোগেশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লোক জন বা লগেজ পত্রের অনুসন্ধান করিল। "কই, কাউকে ত দেখ্‌চিনা? আর এমন সময় পশ্চিমের গাড়ি কোথা?" যোগেশ সকৌতূহলে হেমেন্দ্রর পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একটু মাথা চুলকাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া সে কহিল, "তা বটে, এখন ত কোন ট্রেণই নেই। তাহলে যোগেশ কি করা যায়, বল দেখি?"

রজনীনাথের আবেদন মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে তাঁহাকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল,—পুত্র আশা করিতেছিল, পিতা তাহাকে দূরে না পাঠাইয়া কাছে ডাকিয়া লইবেন!

এমন করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেলে, একদিন সংবাদ আসিল, বিনোদ এফ,এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পরীক্ষা দিয়া বিনোদ বাড়ি গেল না। সে সময়টা সে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে গোপনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। রজনীনাথের সাহায্যে এক সাহেব কোম্পানির সহিত পরিচিত হইয়া সে তাঁহার অফিসে যাওয়া-আসা করিতেছিল, মনের মধ্যে কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সে-ই জানিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,"কল-টলগুলো দেখে বেড়াই! কেরাণী বাবুরা কেমন আরামে থাকেন, একটু বোঝবার চেষ্টা করা যায়, ক্ষতি কি?"

রজনীনাথ আপনার সময়ে কলেজের মধ্যে একজন উৎসাহশীল উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং এখন তাঁহার সমসাময়িক দলের মধ্যে নাম যশ ও অর্থ সকল বিষয়েই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে সকলের ভাগ্যে এমন সুবিধা আজিকালিকার দিনে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। শ্যামাকান্তের সহিত তাঁহার পরিচয়ও অনেক দিনের। দরিদ্রসন্তান রজনী পাঠ্যাবস্থায় দেশের জমীদার শ্যামাকান্তের নিকট হইতে সাহায্য না পাইলে, বোধ হয়, পরে এতটা উন্নতি করিতে সক্ষম হইতেন না,

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল, চট্ করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি খেলিল। হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি? শ্বশুরবাড়ী গেলেনা কেন?"

হেমেন্দ্রর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া সে কেবল উত্তর দিল, "না।"

"বাড়ীতে আর বনবে না, তা আমি আগেই জানতুম। তা কোন জায়গাটায় যাওয়া ঠিক হয়েছে?"

হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "এখনও কিছুই ঠিক করিনি।"

"ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি। সঙ্গে কে আছে, জিনিষ পত্র কই?"

এ কি পরিহাস! হেমেন্দ্রর লোকজন, জিনিষপত্র! তার কি আছে? কে আছে?

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "সঙ্গে কে থাকবে, যোগেশ? যখন বাড়ী থেকে এসেছিলুন, সঙ্গে কে এসেছিল? আর কিছুই ত আনিনি, যেমন এসেছিলুম, তেমনই যাব। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, সেইটেই বইতে হবে।"

"এর নাম পশ্চিম যাওয়া! পশ্চিমে গিয়ে কি করবে, চলবে কেমন করে?"

হেমেন্দ্রর আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারী সংসার-সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে, সাঁতার জানেনা, তথাপি গর্ব্বের সহিত কহিল, "কোথাও একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করব,

ভিক্ষের ভাত আর খাব না, যোগেশ, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।"

যোগেশ মৃদু হাসিল, বলিল, "ভিক্ষে? সবই ত তোমার। বুড়র ভীমরতি হয়েচে বলে দেশের আইন আদালত শুদ্ধ কি উঠে গেল? মাগী আদালতে প্রমাণ করুক না, কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।"

হেমেন্দ্রর চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা কে সরাইয়া দিল। সত্যই ত, মূর্খ বিনোদকুমারের মত সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হইবে নাকি? তাহাতে কাহার ক্ষতি? সাগ্রহে সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু শ্বশুর ত আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য কর্বেনা। আমার ত কিছুই নেই—"

যোগেশ বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল, "কিছু ভেব না, সব আমি ঠিক করে ফেলব। এখন তবে কোথায় থাকবে? ফরেসডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ী আছে. চল, তোমাদের বরং সেখানে নিয়ে যাই। তারা গেছে কাশীধাম করতে,—বাড়ীখানা ভাড়াও হয়নি, খালি পড়ে রয়েচে।"

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়িবে। যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল, "বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? গাড়িতে এসে বসুন, চারদিকে ভদ্রলোকের ভিড়।"

শান্তি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল! হেমেন্দ্র দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভাবিল, যোগেশ না জানি কি উপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে!

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলাহলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে শান্তি যখন মুখ ফিরাইল,

হেমেন্দ্র দেখিল, একরাত্রির ভিতরে তাহার যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, বহু বৎসরেও লোকের সেরূপ হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, "কাজ নাই, শান্তিকে লক্ষ্মীপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাই—!" কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্ত্তেই তিরস্কার করিয়া উঠিল, ভীরু! স্ত্রীর জন্য নিজেকে লোকের কাছে নীচু করিবে! হেমেন্দ্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকু পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে নানাবিধ পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে শান্তির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। হেমেন্দ্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল, শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে আসিয়াছে। তাহার মুখে আশাহীন বেদনার নিদারুণ চিহ্ন করাঘাত-চিহ্নের মতই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকরুণনেত্রে যোগেশ তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। তুমি যার হাতে পড়েছ, সে তোমায় চিনবে না, সে তোমার আদর বুঝবে না। তবে আমি যেটুকু পারি, তোমার মঙ্গল চেষ্টা করব।"

৩৫

চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ীর সাহায্যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্র ও শান্তিকে যোগেশ তাহার শ্যালীগৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। জনবিরল এক গলির ভিতর কলমিদল, পদ্ম ও পানাভরা পুষ্করিণীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ইটে গাঁথা ছোট একখানি পুরাতন বাড়ী। তাহার দেওয়াল আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বারে তালা লাগান। যোগেশ বলিল, "তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাক।" হেমেন্দ্র আপত্তি করিল, "না, না, তালা ভেঙ্গে পরের বাড়ী ঢোকে না। আর তাছাড়া যোগেশ, এই পচা পুকুরের ধারে এই নোংরা জায়গায় একদিন থাকলে আমি প্লেগে মারা যাব। বাড়ীও ত একতলা, আর সেঁৎসেঁতে বলেই মনে হচ্চে, এখানে কি করতে আনলে!"

যোগেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, "হ্যাঁ, বাড়ীটা তেমন ভাল নয় বটে, তবু দুদিন এখানেই কষ্ট করে থাকলে হ'ত না? টাকাকড়ি তেমন কিছু ত আমাদের সঙ্গে নেই, এই দেখনা—মোটে সতের টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা আর বাকি আছে—" ইহা বলিয়া সে হেমেন্দ্রর নিকট হইতে প্রাপ্ত মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাকে দেখাইল। আকস্মিক একটা লজ্জার আঘাতে হেম আরক্ত হইয়া উঠিল। লজ্জার আবরণ সে আর টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আহতগর্ব্ব হেমেন্দ্র মন্ত্রনিরুদ্ধ বীর্য্যহীন সর্পের মত মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। জীবনে যে বিনা সংগ্রামে পূর্ণজয়ী হইয়া নিজেকে কমলার বরপুত্র বলিয়া জানিয়াছিল, এখনই তাহার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কারে এমন করিয়া আঘাত-দান,—এ কি বিধাতার বিড়ম্বনা!

তালা ভাঙ্গিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করা হইল। যোগেশ শান্তিকে পাশের একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল, "আপনি ঐ ঘরে গিয়ে খাটের উপর একটু শুয়ে নিন, বড্ডই ক্লান্ত হয়েছেন, আমি এখনই সব জোগাড় করে ফেললুম বলে।" শান্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মানব-বর্জ্জিত গৃহ

ধূলায় ও ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কৃষ্ণকলি ও ডেঙ্গোশাকের সঙ্গে বিস্তর বুনো গাছ জন্মিয়াছে। একপার্শ্বে তুলসীহীন মঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যোগেশ সম্মুখের ঘরের শিকল খুলিবামাত্র দুইটা চামচিকা ভাঙ্গা জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। ঘরের ঠিক সম্মুখেই খানিকটা স্থান পাখীর পালকাদিতে অপরিষ্কৃত থাকিয়া গৃহস্বামীর পক্ষি-প্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছিল। ঘরের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ ও বড় একটা কাঠের সিন্দুকমাত্র পড়িয়া আছে। একটা কুলুঙ্গীতে দুইচারিটা মুণ্ডভাঙ্গা মাটির পুতুল ও ঘরের মেঝেয় খানকতক ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা হাঁড়ি ও আবর্জ্জনার রাশি। হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুই পদ পিছাইয়া আসিল, ঘরের ভারাক্রান্ত বদ্ধ বায়ুতে মুহূর্ত্তেই সে হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। যোগেশ জানালাগুলা খুলিয়া কোঁচার কাপড়ে তক্তাপোষের ধূলা ঝাড়িয়া একটা অংশকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া স্তম্ভিত হেমেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আসুন ছোটবাবু, আপনি এইখানে বসে' বিশ্রাম করুন, আমি একটা লোক ও কিছু খাবারের চেষ্টায় যাই।" হেম চৌকাঠের নিকট হইতে খুব সাবধানে কোঁচা গুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতভাবে বলিয়া উঠিল, "এযে ভয়ানক ড্যাম্প! নিশ্চয়ই ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে আমায় মরতে হবে দেখচি।"

যোগেশ আবার মনে মনে একটু হাসিল, কিন্তু বাহিরে সে সহানুভূতি দেখাইতে কোন ত্রুটি করিল না, বলিল, "কি করবেন বলুন, বিধির বিড়ম্বনা একেই বলে, যাহোক এখন দুদিন কষ্ট সহ্য করুন, আবার আমাদের দিন ফিরে আসবে। তখন সব দুঃখ মেটাবো। যে আপনাকে এতটা কষ্ট দিলে, তার কি

কখন ভাল হবে, মনে করেছেন? কখন না! ভগবান আছেন, তিনিই বিচার করবেন, দেখুন না, কেমন মাগীর জাঁল ফাঁসাই।"

হেমেন্দ্র আবেগের সহিত যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হল যোগেশ, নৈলে আমার ত কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছিল না। তুমিই জগতে প্রকৃত বন্ধু।"

যোগেশ বলিল, "ও কথা বলবেন না, ছোটবাবু। আমরা আপনার ভৃত্য, চিরকাল ত আপনাদের দ্বারেই মানুষ, কি আর করতে পেরেছুম বলুন, ক্ষমতাই বা কতটুকু? তবে এ শরীরটা প্রাণটা দিয়েও যদি আপনাদের বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষায় সামান্য সাহায্যটুকুও করতে পারি, তাতে পিছুব না। শাস্ত্রে বলে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব। তা আমি রাজদ্বারে দাঁড়াবার সব বন্দোবস্ত করে দেব, কোন ভাবনা নেই।"

হেমেন্দ্র আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যোগেশ, ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলুম!"

যোগেশ একজন দাসী ও আহার্য্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন হেমেন্দ্রর ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া সে সেই শয্যাহীন তক্তাপোষের ধূলিলাঞ্ছিত বক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। প্রতিবেশীর নিকট হইতে আনা গ্লাসে খানিক ঠাণ্ডাজল ও কিছু কেনা খাবারে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া হেম বলিল, "কি জঘন্য জিনিষই কিনেচ হে! কলেরা না হয়! তা যাহোক যোগেশ, তুমিও

কিছু খেয়ে নাও। এস, একটা কিছু পরামর্শ দাও, আমি ত ভাই, দুদিন এ অবস্থায় থাকলে নিশ্চয়ই মারা পড়ব, তা তোমাকে বলে রাখলুম। বাপ্! এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে।”

যোগেশ হঠাৎ ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিয়া ফেলিল, “বৌদিকে একবার দেখবে না? আশ্চর্য্য লোক ত আপনি, দেখ্‌চি! সে বেচারা এখনও যে মুখে একটু জলও দেয়নি, আমরা ত তবু শ্রীরামপুরে চা-টা খেয়ে নিয়েছিলুম।” হেমেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইল, তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, “তুমিই গিয়ে বলনা।” যোগেশের সমস্ত হৃদয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেইদিকেই টানিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে সেই প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল, “না, না, তা কি হয়? তিনি কি ভাববেন! আপনি যান, আমি ঝিটাকে দিয়ে বরং খাবার পাঠিয়ে দিচ্চি। ঝি, ঝি গেল কোথা?” হেমেন্দ্র অনিচ্ছার সহিত উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিল না।

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, রুদ্ধদ্বার ক্ষুদ্র ঘরে ধূলির উপর শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল, সে কাঁদে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই এই অবস্থায় রহিয়াছে। মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া সে ডাকিল, “শান্তি!”

শান্তি কোন উত্তর দিল না, হেমেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন বিপদেও সে পড়িয়াছে যে বলিবার নহে! এ কি গ্রহ! অথচ রাগ করাও অনর্থক। বুঝিবে কে? এবার একটু উচ্চস্বরে সে ডাকিল, “শান্তি, শুনচ?” শান্তি

মুখ ফিরাইল, প্রশ্নহীন মৌনদৃষ্টি একবারমাত্র স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া আবার চোখ নত করিল। ঈষৎ লজ্জার সহিত হেম তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "ওঠ, মুখে একটু জল দাও। উঠে এস।" কোন কথা না কহিয়া শান্তি শুধু হাতখানা টানিয়া লইল। নির্ব্বাক ওষ্ঠ একটু কম্পিত হইয়াই থামিয়া গিয়াছিল, চোখের পাতা আর একটুখানি নামিয়া আসিল মাত্র। নিতান্ত অপমান বোধ করিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেশকে গিয়া বলিল, "বল্লুম, তুমি বলগে, তা হলনা।" ব্যর্থরোষে জ্বলিয়া যোগেশের প্রতিই সে আক্রোশ মিটাইয়া লইল। "তোমাদের কেবল আমায় জ্বালাতন কর্ব্বার ফন্দি বৈত নয়!" যোগেশ বিরক্ত না হইয়া বরং খুসী হইয়াই উঠিয়া গেল।

দ্বারের নিকটে আসিয়া যোগেশ 'বৌদি' বলিয়া ডাকিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখেই কি কোন ক্ষমতাপন্ন চিত্রকর নির্ব্বাসিতা সীতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে নাকি? ঠিক সেই রকমই মুখের ভাব, বসিবার ধরণও ঠিক তেমনই! করুণস্বরে যোগেশ বলিল, "বৌদি, উঠে আসুন, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে নিন্, নৈলে আমি প্রসাদ পাইনে যে।" এবার শান্তির নিশ্চলপ্রায় হৃৎপিণ্ড সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুষার যেমন সূর্য্যকিরণে সহসা গলিয়া জলে পরিণত হয়, তাহার বুকের মধ্যকার জমাট বাঁধা বেদনা তেমনই সেই সহানুভূতির স্বরটুকুতে গলিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া সে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল। যোগেশ একবার চকিত কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

আবার বলিল—এবার স্বর ছোট করিয়া একটু কাছে আসিয়া বলিল, "আমার কথা শুনুন, আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রকৃতই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী,—আমি শীঘ্রই সব ঠিক করে দোব, দুদিনেই আবার আপনি লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীরূপে সেখানে ফিরে যাবেন, আমার প্রাণ থাকতে আপনাদের কোন ক্ষতি হতে দোব না, এই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম।" যোগেশের স্বর কাঁপিতেছিল, হঠাৎ সে চুপ করিল। শান্তির চোখে অশ্রু ঝরিতেছিল। সে বিস্ময়ের সহিত যোগেশের প্রতি চাহিয়া তাহার উৎসাহিত মুখের সাগ্রহ দৃষ্টিতে আশ্বস্ত হইল। যোগেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আবেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? আমায় লজ্জা করবেন না। আপনি লক্ষ্মীপুরে যেতে চান, না রজনীবাবুর কাছে? বলুন—আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব—"

শান্তির শিরায় শিরায় উত্তেজনার আনন্দ স্রোতের মত বহিয়া গেল। সে বালিকার মত সরল বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আমি লক্ষ্মীপুরে জ্যেঠামশায়ের কাছে যাবো—"

যোগেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আমি তার জন্যে চেষ্টা করবো, আর বিশ্বাস করুন, সে চেষ্টা সফলও হবে।"

এদিককার এক রকম বন্দোবস্ত করিয়া যোগেশ হেমকে বলিল, "টাকার জন্যই ত বড় মুস্কিল দেখছি, ছোটবাবু। এখনও মশারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে বাকি, এর মধ্যেই ত দেড়শো টাকা ধার হয়ে গেছে। কি করি?"

হেমেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল ও ছাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যোগেশের অভিযোগ শুনিয়া তাহার অপ্রসন্ন চিত্ত আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "নাওনা, শ-পাঁচেক টাকা কারো কাছ থেকে ধার করে। আমার কি কোথাও তালুক মুলুক আছে!"

"তাই ত, শুধু হাতে এখানে যে কেউ ধার দিতে রাজি হয় না, বলে, সত্য জমিদার হ'লে কি ঐ বাড়িতে থাকে! এ আবার ফরাসীর মুলুক, ওরা ভয় পায়, যদি এর পর কিছু গোল হয়। আমার ত জান, অন্য-ভক্ষ্যধনুর্গুণ।"

হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। সে কি পরামর্শ দিবে? তাহার নিকট ত আর একটি কপর্দ্দকও নাই! সে কি হাতে কিছু রাখিত? যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার খরচ পত্র কুলাইয়া উঠিত না—তবে এখন উপায়?

কি ভয়ানক! এমন ভয়ঙ্কর স্থান, এই সংসার যে, এক মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মধ্যে বাস করিতে হইলেও অর্থের প্রয়োজন! একটা দিনের জন্যও কেহ কাহারও পাওনা মাপ করিবে না? বেশ, তবে সেইবা কেন তাহার প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে? সেইবা কেন এ অপমান এ কষ্টের প্রতিশোধ লইবে না? নিশ্চয় লইবে! যে রমণী প্রতারণা দ্বারা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে আসিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত শাস্তি দিবে, সে!

হেমেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া যোগেশ বলিল, "এক কাজ কর না কেন, তোমার শ্বশুরকে লেখ কিছু টাকা পাঠাতে!"

গভীর ঘৃণার সহিত তীব্রস্বরে হেমেন্দ্র বাধা দিল, "চুপ কর, ও

এ কথা সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন, এবং এই জন্যই প্রতিপালকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। শ্যামাকান্ত চৌধুরীও তাঁহার উদার চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অটল অধ্যবসায়ের সহিত বিনয়-নম্র ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি এতটা স্নেহ ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য বিনোদকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শ্যামাকান্ত যতদূর নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, আর কাহারও নিকট, এমন কি নিজের কাছে রাখিয়াও ততটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন কিনা বলা যায় না। পুত্র বিষয়-কার্য্য শিক্ষা করিল না বলিয়া মুখে যতটা আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, আন্তরিক ঠিক ততটা অনুভব করিতেন না। মুখে না বলিলেও পুত্র রজনীনাথের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত হইয়া সকলের নিকট প্রকৃত সম্মান লাভ করে—সে ইচ্ছা মনের মধ্যে যথেষ্টই ছিল। তবে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে চালচলন ও মতিগতির পরিবর্ত্তন হইবে ভাবিয়াই তিনি মধ্যে মধ্যে আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শ্যামাকান্ত শুনিলেন, বিনোদ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কত সাধনার ধন, কত স্নেহের একমাত্র বংশধর,—ইচ্ছা করিলে যে বিলাসে, আদরে, আলস্যে দিন কাটাইতে পারিত, নিজের চেষ্টায় পিতার সাহায্য না লইয়া সে আজ নিজেকে দশের নিকট পরিচিত করিতে কত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছে! ধন্য সুপুত্র! শ্যামাকান্ত মনে মনে পুত্রকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু বাহিরে অধিক আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কেবল লিখিলেন, "অনেক দিন বাড়ি

নাম আমার কাছে করোনা। এই নাও, ঘড়িটা আর চেনটা রেখে কোথাও থেকে টাকা আনো। জানো ত, ওটা বড় কম দামী জিনিষ নয়।"

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আকাশ একেবারে মেঘশূন্য। চাঁদের আলোকে আকাশভরা নক্ষত্র দীপ্তিহীন দেখাইতেছে। হেমেন্দ্রর শয়নগৃহের খোলা জানালার মধ্য দিয়া গৃহতলে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছিল, অল্প অল্প বাতাস গৃহসম্মুখস্থ বাঁশ বনের পাতা কাঁপাইয়া, ঘরের মধ্যে মশারি ও আনলার কাপড় দুলাইয়া ফিরিতেছিল। যোগেশ শান্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, "বৌদি!" ধ্যানমুগ্ধার মত শান্তি নীরবে জানালার নিকট বসিয়াছিল। চমকিয়া মুখ ফিরাইয়াই সে মাথার কাপড় টানিতেছিল, যোগেশের অনুযোগে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। যোগেশ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সে তাহাকে কি বলিতে আসিয়াছিল, বোধ হয়, তাহা মনে পড়িতে ছিল না। প্রত্যাশিত নেত্রে তাহাকে মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া শান্তির চোখ আপনা আপনি নত হইয়া আসিল। ক্ষণপরে দৃষ্টি উঠাইয়া শান্তি দেখিল, তখনও সে তেমনই করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে! ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন বাহিরের লোক মাত্র! তাহার এ কি আচরণ!

শান্তিকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ নিজের দুর্ব্বলতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,

"আপনি শুতে যান, বৌদি, রাত হয়ে গেছে।" তাহার কথায় ও স্বরে শান্তির বিশ্বাস ও আশা আবার যেন তাহার হতাশান্ধকার হৃদয়প্রান্তে সহসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সেই এক মুহূর্ত্তের সন্দিগ্ধতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে তখন সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কবে আমি লক্ষ্মীপুরে যেতে পারব, আমায় আগে বলুন—"

যোগেশ আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়ই শীঘ্র যাবেন। আমি আমি সব ঠিক করে দেব। বিনোদবাবুর বউ সেজে যে মাগী আপনার এই কষ্টের কারণ হয়ে এসেছে, সেই জালিয়াৎনীকে জেল খাটাব, তবে আমার নাম যোগেশ মিত্তির! কিন্তু আপনি আমায় ভুলবেন না।"

পথের মধ্যে চলিতে চলিতে বিশ্বাসী পথিক সহসা সম্মুখে দংশনোদ্যত কালসর্পকে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে নির্ব্বাক আতঙ্কে যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, যোগেশের কথায় শান্তিও ঠিক তেমন করিয়া সেইখানে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার কোনখানে আশা নাই? তবে সে যে এতক্ষণ আবার নূতন আশায় কত নূতন নূতন কল্পনার কানন সৃজন করিতেছিল, সে সকল কিছুই নয়? সব প্রতারণা! কোথাও আর তাহার আশা নাই!

তাহার মনের অবস্থা ঠিক না বুঝিলেও সে যে তাহার কথায় বিশেষ খুসী হয় নাই, যোগেশ তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহাকে কি বলিলে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, সে কথাটা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াও সে ঠিক করিতে পারিল না। দূরে বারদোয়ারির ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অদূর পথে চৌকিদার

হাঁকিয়া গেল। যোগেশ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "যান, আপনি শুতে যান, বড্ড রাত হয়ে গেছে—"

কলের পুতুলের মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিতে পা জড়াইয়া আসিতেছিল, বিদ্রোহী চিত্ত পুনঃপুনঃ বিমুখ হইয়া সবলে তাহাকে বিপরীত দিকে টানিতেছিল, তথাপি সে অনিচ্ছামন্থরগতিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল। শাঁখের চুড়ির শব্দে সে চাহিয়া দেখিল। "এতক্ষণ ও ঘরে কি হচ্ছিল, শান্তি?" প্রশ্ন শুনিয়াই শান্তির হাতখানা মুহূর্ত্তে মশারির প্রান্ত হইতে সরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে হেমেন্দ্র বলিল, "যোগেশ আমার খুব বন্ধু তা সত্য, কিন্তু তাই বলে রাত দুপর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে বসে গল্প করা আমি পছন্দ করি না। ওরকম নির্লজ্জ ব্যবহার তোমায় ওঁরা শিখিয়েছেন, তা আমি জানি, কিন্তু আমি ওসব দু চক্ষে দেখতে পারি না।"

মানুষের শরীর কিম্বা মনের ঠিক যেখানটায় সম্প্রতি খুব বড় রকমের আঘাতের বেদনা সর্ব্বদা দপ দপ করিতেছে, সেইখানটিতেই আবার সামান্য একটু আঘাত লাগিলে অত্যন্ত সহিষ্ণু যে, সেও আচমকা একটা যন্ত্রণার ধ্বনি করিয়া উঠে। আজিকার তিরস্কারে হেমেন্দ্র প্রতিহিংসার বিষ নিষ্ঠুরভাবেই ঢালিয়া দিয়াছিল। পিতা ও কন্যা—তাহার প্রতি উভয়ের ব্যবহার সে ভুলে নাই,—সুযোগ পাইলেই তাই তাহার প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়া উঠে।

কিন্তু আজিকার এ আঘাত শান্তির পক্ষে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পরমুহূর্ত্তে আহতভাবে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনের ঝাল ঝাড়িয়া লইতে পারায় হেম ঈষৎ মধুচিত্তে আবার শয্যা আশ্রয় করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে শান্তিকে অপমানিত করিবার একটা পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তখন তাহার পার্শ্বের ঘরে শান্তির পরিত্যক্ত ভূমিতে শয্যা বিছাইয়া তাহাতে শয়ন করিয়া যোগেশ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্র ভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "হেমের কাজে আমায় প্রাণ দিতে হয়, তাও আমি দেব। আহা, আমার দ্বারা যদি তার একটু উপকারও হয়, তাহলে আমার জন্ম সফল হবে। আমার আর এতে লাভ কি? শুধু একটু দয়া বৈত নয়! কিন্তু হেম কি দুর্ভাগ্য, এমন রত্ন পেয়েও সে চিনলে না!"

৩৬

মাটিতে লুটাইয়া মন খুলিয়া কাঁদিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও প্রাণপণ বলে শান্তি সে ইচ্ছা দমন করিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর রাত্রি। বাঁশবন হইতে মধ্যে মধ্যে শৃগালের ডাক ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দে কোন জীবিতপ্রাণীর অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছিল না। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে রৌপ্যকিরণবর্ষী চন্দ্র বিরাজমান। এই বৈচিত্র্যময়ী সুখোজ্জ্বলা ধরণী, এই পরিপূর্ণ আশাবিহ্বল রাগিণীর অনাদি

গান, সমস্তই ব্যথিতপ্রাণা শান্তির নিকট কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া স্পন্দনহীন চক্ষে সে একবার অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিল। সুখের অতীত, সাধের অতীত জীবন! সে কি আনন্দের, কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! শৈশবের সে নিশ্চিন্ত সুখ, কি মধুর! সেই তাহারা দুটি ছোট ভাই বোনে এক সঙ্গে খেলা করিত, একসঙ্গে ঘুমাইত, একসঙ্গে ছোট দুটি প্রজাপতির মতই তাহাদের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, ছোট পাখীগুলির মতই আপনার মনে গান গাহিত, হাসিত, খেলা করিত। জগতে আর কাহারও সহিত কি শান্তির পরিচয় ছিল না? ছিল—কিন্তু সে সব গিয়াছে! ক্ষুদ্র একখানি হৃদয়মাত্র —তাহার উপর কত দিক হইতে কতখানি স্নেহ বর্ষিত হইত! কি অপূর্ব্ব সে সুখ, অনাবিল শান্তি! শান্তির চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে স্বপ্ন তাহার কেন ভাঙ্গিল? কোন রূপেই কি আর সে অতীতকে ফিরাইয়া আনা যায় না? হে ভগবান, শুধু একবার, শুধু একটিবার! "এখনও আপনি জেগে আছেন, বৌদি?" সহসা এই কথা শুনিয়া চমকিয়া সে সম্মুখে চাহিয়া দেখে, যোগেশ। যোগেশের আবির্ভাবে সহসা সচেতন হইয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিল, স্বপ্নের পরিবর্ত্তে বাস্তব তাহার বিরাট অন্ধকার ও অপর্য্যাপ্ত বেদনা লইয়া স্তব্ধ রজনীর অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর তালে জাগিয়া রহিয়াছে। ইহার মাঝখানে সে একেবারে একা। যোগেশের দ্রুতনিশ্বাসের শব্দ সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তির নিস্পন্দপ্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চালন করিল। উত্তেজনায় তাহার মাথার ভিতর দপ্

দপ্ করিয়া উঠিল। বিস্ময়হীন কোমল কণ্ঠে যোগেশ কহিল, "বৌদি, তুমি কি চাও, আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও—ত। তুমি যা বলবে, আমি তাই করতে রাজী আছি, শুধু তুমি বল একবার,—নিজের মুখে হুকুম দাও—"

শান্তি অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "না, না, তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, আমি কিছুই চাই না, তোমার কাছে। শুধু তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।" বলিতে বলিতে সে পাগলের মত হেমেন্দ্রর ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। যোগেশ তাহার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় ব্যাপারটা তাহার চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শান্তি ঘরে প্রবেশ করিবার পরই সে যেন একবার হেমেন্দ্রর উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়াছিল। ঠিক হইয়াছে,—তাহার মধ্যে যেন যোগেশের নামটাও ছিল! যোগেশ রোষে ক্ষোভে অধর দংশন করিল, "বটে, এটুকু পর্য্যন্ত সহে নাই! আচ্ছা, দেখা যাক্, এই যোগেশ নাহলে তোমার কেমন চলে! একবার তবে দেখ! অকৃতজ্ঞ! এত সন্দেহ, এত ভয়, তোমার!"

যোগেশ সহসা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, ভাবিল, "সেও কি কোন রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস করেচে? তাই যেন মনে হয়,—ছি ছি! না আমি এমনই কি দোষ করেছি? আমার উদ্দেশ্য কিছু মন্দ ছিল না। শুধু দয়া! ওদের অনেক খেয়েছি, অনেক পাবারও আশা রাখি, তাই। তবে চাঁদকে দেখে চোখ বুজবে, এমন মূর্খ কে আছে? ফুলটি দেখলে

মন যে সুন্দর বলে তারিফ করবে, তাতে মনের দোষই বা কি ?"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহে প্রবেশ করায় খুব সকালেই হেমেন্দ্রর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। জানালাটা বন্ধ করিতে বলিতে গিয়া হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। মনটা কাজেই একটু খারাপ হইল। শান্তি গেল কোথায় ? এই অজানা জায়গা, বিশেষ বাড়ীর গায়েই একটা পুকুর আছে! নূতন করিয়া আর ঘুমান হইল না। উঠিয়া সে বাহিরে আসিতেই দেখিল, দ্বারের পার্শ্বে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শান্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ভাবনার আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া সে হাঁফ ছাড়িল।

প্রভাত হইয়াছিল। উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। উদার উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গপক্ষের মত লঘু শুভ্র মেঘ প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিককার গাছ পালা হইতে পাখীর কাকলী, পাতার মর্ম্মর ও ফুলের গন্ধ একসঙ্গেই নির্ম্মল স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া আবার দাঁড়াইল।

সেই রাঙ্গামেঘের ছায়ায় শান্তির বিবর্ণ ললাটে, গণ্ডে, এক স্নিগ্ধ রক্তিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলুথালু কৃষ্ণ চুলের রাশি খুলিয়া পড়িয়া পত্রান্তরালস্থিত ফুলটির মত আধখানা মুখকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মুখের উপর হইতে সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার সকল বেদনা সকল ক্লান্তি নিঃশেষে

মুছিয়া লইয়া" তাহাকে প্রশান্ত বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন, তথাপি সেই নিদ্রাকাতর চোখের কোলে অশ্রুর একটি বিন্দু সকালবেলার শিশিরকণাটিরই মত টলটল করিতেছিল। প্রাতঃসূর্য্যেরই মত সেই গৌরবোজ্জল মুখ একবার হেমেন্দ্রর অন্ধকার চিত্তের মধ্যে তাহার কিরণরশ্মি ছড়াইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বালিয়া তুলিল। হেম শান্তির মাথা নিজের কোলে তুলিয়া সেইখানে বসিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাহার মুখের উপর হইতে চুলের গোছাটা সরাইয়া অত্যন্ত আদরের সহিত অনুতাপ ও আত্মগ্লানিপূর্ণ চিত্তে তাহার অধরে চুম্বন করিল।

"শান্তি, আমায় মাপ কর, শান্তি, কাল মাথাটা ঠিক ছিল না, তোমায় অন্যায় ভাবে বকেচি, তা ভুলে যাও।" জাগিয়া প্রথমটা শান্তি বুঝিতে পারে নাই, সত্যই হেম তাহাকে আদর করিতেছে! সে ভাবিতেছিল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে!

হেম আবার মুখের উপর নত হইয়া ডাকিল, "শান্তি, রাগ করোনা, কথাটা বড় শক্ত বলে ফেলেচি—"

শান্তি সাশ্চর্য্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সত্য! হেমেন্দ্রর এই সম্ভাষণ! অকস্মাৎ তাহার বেদনাবিদ্ধ বক্ষ আলোড়িত করিয়াও বহুদিনের আঘাত ও অভিমানের ব্যথা এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিল,—সে স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজিকার অম্লান প্রভাত তাহার নবীন সূর্য্যকরটিকে না জানি কি সম্মোহন শক্তিতে প্রভাবশালী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। আকাশে বাতাসে না জানি আজ কি করুণা, কি প্রেমের রাগিণী

বাজিয়া উঠিয়াছে! হেমেন্দ্র শান্তির অশ্রুসিক্ত কপোলে চুম্বন করিয়া আদর করিয়া বলিল, "আমি তোমায় লক্ষ্মীপুরেই পাঠিয়ে দেবো, শান্তি, কেঁদোনা তুমি।" হরি, দীনবন্ধু! একি সম্ভব! সত্যই কি শান্তির দুঃখ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে, প্রভু! শান্তি চোখের জল মুছিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আজই তবে যাব কি?" হেম তাহার চুলের উপর হাত রাখিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছিল। প্রশ্নটায় সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কথাটা শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্যই সে বলিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু— তাছাড়া উপায়ই বা কি? এমন করিয়া কয়দিন চলিবে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "না—কাল তোমায় পাঠিয়ে দেব,—আজ আর থাক।" শান্তির ম্লান চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সাগ্রহে সে কহিল, "সেখানে আমরা খুব সুখেই থাকবো,—"

হেমেন্দ্র বাধা দিল, "তুমি সুখেই থাকো, আমিত যাব না—" শান্তির বাহুপাশ মুহূর্ত্তে স্বামীর কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

হেমেন্দ্র উঠিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমি সেখানে যাব না। আর নাই বা গেলুম, আমার জন্যে কার কি ক্ষতি? কে আমায় চায়? তুমি যাও,—সুখে থাকো, আমার যা খুসী তাই করব। আমার প্রতি তোমার ত মায়া নেই, আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।" হেমেন্দ্রর শেষ কথাগুলা জড়াইয়া আসিতেছিল।

শান্তি দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া বেদনাপূর্ণ লজ্জায় সে স্বামীর হাত ধরিল,

"তোমার পায় পড়ি, ও সব কথা বলোনা, তোমার উপর কার স্নেহ কম? কেন, ওরকম মনে কর? ফিরে যাই, চল। আমি সব ছেড়ে তোমার সেবা করবো।" হেমেন্দ্রর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শান্তির হৃদয়ের সমস্তটাই—পূজা, সযত্ন সেবা—আর কিছু না হোক অন্ততঃ সেইটাও ত সে পাইবে, তাহা কি সামান্য? কই, আজিকালিকার মত আনন্দ ত ইহার পূর্ব্বে শত ভোগ বিলাসের মধ্যেও সে লাভ করে নাই! কি সুন্দর, কি কোমল, কি উচ্চ হৃদয়, তাহার এই স্ত্রীর! অন্ধের মত, এতদিন সে তাহার পানে চাহিয়া দেখে নাই! ব্যগ্র করে সে শান্তিকে বুকে টানিয়া লইতে গেল, আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিতে গেল, "তোমার শক্তি তুমি আমায় দিও, শান্তি, তোমার জন্য আমি সব সহ্য করবো—" কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে শান্তি চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, যোগেশ বারান্দায় আসিয়া হঠাৎ ফিরিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া শান্তি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। হেম ডাকিল, "যোগেশ!"

হেমেন্দ্রর জন্য চা তৈয়ার করিয়া নূতন রাঁধুনিকে রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া যোগেশ হেমেন্দ্রর ঘরে আসিয়া দেখিল, শান্তি ও হেম নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুইজনের মুখেই একটা উৎসাহের দীপ্তি। শান্তির অধরপ্রান্তে লজ্জাবিজড়িত সুখের হাসি, হেমেন্দ্রর মুখে তাহার স্বাভাবিক রুক্ষ অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে একটা কোমল ভাব পরিব্যক্ত।

ছাড়িয়া রহিয়াছ, কবে আসিবে?” বিনোদ পত্র পাঠ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। মা নাই, তবে কাহার জন্যই বা সে উন্নতির পথ চাহিয়া ফিরিতেছে? কই, কেহই ত তাহার সম্মান-সাফল্য কামনা করে না? তবে আর কাহার জন্য এ জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হওয়া! না, না, মা বলিয়াছেন। তিনি সম্মুখে না থাকিলেও দূরে আছেন, লক্ষ্যে না থাকিলেও অলক্ষ্যে তাহার মাথার উপর স্নেহাশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতেছেন!

সে পিতাকে লিখিল, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠানো হউক, সেখানে সে অধ্যয়ন করিতে একান্ত ইচ্ছুক।

পত্র পড়িয়া শ্যামাকান্ত স্তম্ভিত হইলেন। কি সর্ব্বনাশ! এই ভয়ই যে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছিলেন! উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি রজনীনাথের উপরও তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। কি কুক্ষণেই তিনি পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন। দেওয়ানকে ডাকিয়া পরামর্শ চাহিলে সে সুবিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িল। অর্থাৎ, সুদূর অতীতেই তো সে এ সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছিল! এখন আর ইহা নূতন কথা কি? শ্যামাকান্ত পরদিন একান্ত কাতর চিত্তে কলিকাতায় পুত্রের নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদি সে কোনদিন লুকাইয়া চলিয়া যায়? বিনোদ তাহার পিতার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে একটু আনন্দিত হইল। বুঝিল, সে যে এবার অভিমান করিয়া তাঁহার নিকটে যায় নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্যামাকান্ত পুত্রকে সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে না দেখিয়া আপনার আগমনের উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিলেন না।

৩৭

যোগেশ ভাবিল, "একেই বলে দম্পতি-কলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" সে ডাকিল, "হেম।" শান্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র প্রসন্ন চিত্তে ডাকিল, "এস না, যোগেশ।"

আসন গ্রহণ করিয়া যোগেশ কহিল, "আমায় ত এখনি বাড়ি যেতে হবে, ছোট বাবু, ছেলেটার ব্যায়রাম দেখে এসেছি।"

হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল, "এতক্ষণে ছেলের কথা মনে পড়ল? তা বেশ ত যোগেশ, কালই একসঙ্গে সকলে যাবো এখন। আমরাও ত আবার লক্ষ্মীপুরেই ফিরছি—"

বটে! আর তোমার যোগেশকে দরকার নাই, তবে! প্রকাশ্যে সে বলিল, "হ্যাঁ তাই চলুন, মিথ্যে কেন কষ্ট পাবেন, তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি গোমস্তাগিরি করাও ভাল। বৌদিকে বলে দেবেন, সিধুঠাকুরুণের হবিষ্যি বেড়ে যেন একটু ভাল করে ঘি ঢালেন, তবু প্রসাদটা আশটাও মিলতে পারবে—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমেন্দ্রর ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার মাথার ভিতরে এককালে ঈর্ষার সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে সমস্ত আলোকের উপর একখানা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্তেই সব অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনা ও সহানুভূতির সহিত ধীরকণ্ঠে যোগেশ কহিল, "আপনার শ্বশুর খুব চালাক লোক। কর্ত্তাকে তিনিই উইল করতে বারণ করে-চেন। তাঁর মতলব বোধ হয় বুড় মরলে তোমায় অক্ষম প্রমাণ করে নিজেই না-বালকের অভিভাবক হয়ে বসবেন। তারপর বুঝেছ ত?"

হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইল। যোগেশ এ কি বলিতেছে! সত্যই

তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে নাকি? সম্ভব বটে,—ঠিক তাই! সে কি মূর্খ! ছিঃ, ভাগ্যে যোগেশ ছিল! সে একটু নড়িয়া বসিল, সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "তাই ত কি হবে? আমায় না দেখতে পারলেও নিজের মেয়ে ত আছে?"

"হ্যাঁ তুমিও যেমন! মেয়ে আছে, আছেই! মেয়ের উপর ভারী দরদ, দেখতে পেলেনা? ওরা টাকা বোঝে, নিজের স্বার্থ বোঝে। তোমার মত ভাল মানুষ নয়, নিজের সর্ব্বস্ব ওদের হাতে দিয়ে পথে দাঁড়ালে, যেমন! তা যাহোক ছোট বাবু, আমাকে ত আজ যেতেই হচ্চে, ঘরে একটা কড়িও নেই! ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! আমরা ত আর বড়লোক বাপ নই,—ছেলে মেয়ে আমাদের প্রাণ!"

উত্তপ্ত জল একটু তাপ পাইয়াই যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মূঢ়! এটুকু বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই। কি মোহেই সে ডুবিতেছিল! যোগেশের হাত ধরিয়া সে বলিল, "যোগেশ, তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা,—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব তুমিই। কি করে আমি আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পাব, বল। আদালতে কি প্রমাণ হবে যে, ও মাগী বিনদার বউ নয়?"

যোগেশ মনের মধ্যে জয়ের হাসি হাসিয়া সদম্ভে বলিল, "বল কি তুমি! ওত হয়ে রয়েইছে! এর জন্যে আবার ভাবনা! বৃন্দাবনের বিশ-টে সাক্ষী হলপ নিয়ে বল্‌বে যে, ও বিনোদবাবুর বিয়ে করা স্ত্রী নয়। কুছ পরোয়া নেই! সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে ভাবনা এই যে, তোমার মনের সৎসাহস আবার না কোন সময় বৌদির চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। তাঁর হুকুম তামিল ত হওয়া চাই, তা--"

নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া হেমেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "রেখে দাও, তোমার বৌদিদি! আমায় কি এমনই ভীরু পেয়েছ? তবে আমায় এখন কি করতে হবে বল। আগে বরং একখানা উকীলের চিঠি বুড়কে পাঠান যাক্। কি বল? যদি ভালয় ভালয় দেয় ত মন্দ কি? নৈলে তখন—হাতেই ত উপায় রয়েছে।"

হেমেন্দ্র পরে একটু চিন্তিতভাবে আপনা আপনি বলিল, "উকিলের চিঠি—কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়, হাজার হোক জ্যেঠা হন; এতদিন কাছে ছিলাম।"

"ঐ ত গোড়াতেই বলেছি, ও সব আপনার কর্ম্ম নয়। লক্ষ্মীপুরেই বরং ফিরে যান। তবে মাপ কর্ব্বেন, তাঁরা কি আপনাকে মায়া করেছিলেন? আপনার শ্বশুর যে শেয়াল কুকুরের মত সেই রাত্রে—"

"যোগেশ, থামো—তুমি যা বলবে, আমি তাই করতে রাজি আছি। ভদ্রতা চক্ষুলজ্জা, সব ধুয়ে গেছে। ভাই, ভাগ্যে তুমি ছিলে।"

ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে পরামর্শ চলিল। ফলে যোগেশের বাড়ী ও শান্তির লক্ষ্মীপুর যাওয়া উভয় যাত্রাই বন্ধ হইয়া গেল।

৩৮

লক্ষ্মীপুরের বাটিতে আবার নিরানন্দ ও হতাশ্বাস দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাকান্ত পীড়িত। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন ও কবিরাজের বড়িপাঁচন ব্যবস্থার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না। শরীর অপেক্ষা মনের উপরই যে রোগের প্রভাব অধিক, ঔষধে তাহার কি করিবে?

শিবানী যথাশক্তি সেবার ত্রুটি করিত না। কিন্তু শ্যামাকান্তের তথাপি সকল সময় মনে হইত, শান্তি হইলে ইহার স্থলে এই করিত, এটা না বলিয়া হয়ত অন্য কিছু বলিত। নিদ্রাহীন প্রতি রজনীতে স্তিমিতালোকিত কক্ষে দ্বারের দিকে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন, মনে হইত, যেন এখনই ঐ দ্বারপথে নিঃশব্দে সে প্রবেশ করিয়া সতর্ক গতিতে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। বুঝি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হাতের চুড়িগুলির শব্দ বাঁচাইয়া সশঙ্ক ব্যাকুলতায় সে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। কি সে করুণামাখা কোমল দৃষ্টি! স্নেহকাতরা জননী রুগ্ন সন্তানের মুখের পানে যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতে কত, মাধুর্য্য কত মহিমা!

কোথা গেলে, তুমি স্নেহময়ী জননি! তুমি কেন গেলে! শুধু তোমার জন্য তোমারই অভাবে এত কষ্ট, এত হতাশা। সে যদি গেলই, তবে তুমি এস, হে বরেণ্য মৃত্যু, তুমিই এই বহনক্ষম শরীরকে, তাপক্লিষ্ট জীবনকে মুক্তি দান কর। হে বন্ধু, হে সুহৃৎ, তবে তুমিই এস।

নূতন ঠেলাগাড়িতে বেড়াইয়া আসিয়া অমূল্য চাকরের নামে নালিশ করিল, "দাদামশাই আমায় কেস্ত নাস্তায় নাম্‌তে দেয়নি, ও বড় দুত্তু হয়েচে।" শ্যামাকান্ত সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া শিশুকে ব্যগ্রভাবে কাছে টানিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ের পাষাণ ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া দিতে সক্ষম হইল। এইটুকুই তাঁহার সান্ত্বনার অবশেষ! কিন্তু অভাগ্যের ধন

অন্ধের নড়িটুকুর উপর দৃষ্টি ফেলিতেও যে সাহস হয় না, নিরালম্বের অবলম্বন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে শুখাইয়া যায়!

এই ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করা শিবানীর পক্ষেও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। আজকাল যদিও শ্বশুরের সেবা ও তাঁহার চিন্তা তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে অনেকখানি অবলম্বন দিয়া তাহাকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি তাহার নিকট সকলই অন্ধকার।

সময় পাইলেই সে চাবি খুলিয়া বালক বিনোদের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিত। চারিদিকে পুস্তকভরা আলমারি, দেওয়ালে বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষীগণের চিত্র; ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে লিখিবার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে বিনোদকুমারের হাতের লেখা ও তাহার টুকিটাকি দ্রব্য সকল সাজান। শিবানী সন্তর্পণে একবার ড্রয়ার খুলিয়া জিনিষপত্রগুলি নাড়িয়া আবার পূর্ব্বের মত করিয়া যথাস্থানে সব সাজাইয়া রাখিত। আঁচল দিয়া টেবিল মুছিয়া কেদারা ঝাড়িয়া সেই আঁচলখানি মাথায় ঠেকাইয়া অপরিতৃপ্ত চিত্তে আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। কই, সেখানে তাহার জন্য কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্রয় নাই! সে যে বিনোদকে জানিত—যে তাহার স্বামী—তাহার স্মৃতি—তাহার যোগ ত ইহাদের মধ্যে সে দেখিতে পায় না! হাতের লেখাগুলি এমন সুন্দর এমন রচনাসরস! মূর্খ শিবানী ত তাঁহার হস্তাক্ষর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই! এখানে আসিয়া শিবানী তাহার শাশুড়ির পরিত্যক্ত গৃহে স্থান পাইয়াছিল। সেই ঘরের প্রবেশ-দ্বারের উপর একখানা বিচিত্র ফ্রেমে বাঁধান বিনোদের চিত্র। কিশোর বিনোদ, অজাতগুম্ফ, কুঞ্চিত কেশ

উৎসাহচঞ্চল দৃষ্টি, মাতা ভুবনমোহিনীর কোল ঘেঁসিয়া তাঁহারই বাহুর উপর ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শিবানী প্রভাতে সর্ব্ব দেবতার পূর্ব্বে ইহাকেই প্রণাম করিত।

প্রথম ভাগ্যপরিবর্ত্তনের বিস্ময় ও শান্তির ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া কিছুদিন যেন সে একটু আরাম পাইয়াছিল। কিন্তু শান্তির গমনে তাহার অন্তরে পূর্ব্বের মতই হাহাকার পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, আর কখনও যে পারিবেন, সে আশাও অধিক ছিল না। সেই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বেইমানি মেয়েকে কোন কথাই আর বলিবেন না। তবে মায়ের প্রাণ,—সেইজন্যই মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন নেহাৎ 'অসৈরণ' হইলেও তাহার ভালর জন্য দুটা কথা না বলিলেও চলে না। পোড়া মেয়ের 'বরাত' যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, শ্বশুরকে দিয়া ইহার একটা প্রতিকার করান যে তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য, এই সামান্য কথাটি 'আবাগীর বেটি'কে না বুঝাইয়াই বা থাকেন কি করিয়া? কিন্তু একগুঁয়ে মেয়ে এখনও সেই পূর্ব্বের মত নিজের গোঁ করিয়া চুপ করিয়া সব কথা শুনিয়া যায়, না হয় কাঠের মত শক্ত হইয়া শুধু বলে, "আমি বলব না।" এদিকে সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন, কর্ত্তা নাকি উইল করিতেছেন! তাহাতে হেম ও হেমের বউ তাঁহার অর্দ্ধেক বিষয় পাইবে! এমন সময় শিবানী যদি শ্বশুরকে বলে, সেটা ঠিক নয়, তবে অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা ত সে বলিবে না! পোড়া কপাল, অমন বুদ্ধির! রাগ করিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "আমার এখানে আর মন টিকচে না,

আমি বৃন্দাবনে যাই, কি বলিস্?" শিবানী সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ বলিল, "তাই চল মা, তাই চল, আমরা দুজনেই যাই।"

হা রে বুদ্ধি! সিদ্ধেশ্বরী আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। কিন্তু শিবানীর চিত্তে এই সম্ভাবনাটা যেমন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমন শীঘ্রই মিলাইয়া গেল না। একদিন রাত্রে সে মায়ের ঘরে গিয়া তাঁহার কাছে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী একটু বিস্মিত হইলেন। সে আপনা হইতে বড় একটা তাঁহার কাছে আসিয়া বসে না। কোমলস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শিবু? এমন সময় এলি যে?"

শিবানী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই এলুম একবার।" সিদ্ধেশ্বরী একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না, কথাটা বোধ হয় তেমন বিশ্বাস হইল না। বিমলাদাসী তাঁহার পায় তৈল মালিশ করিয়া আগুনের তাপ দিতেছিল। তাহার কার্য্য শেষ হইলে আগুনের কড়া লইয়া সে বাহিরে গেল। তখন শিবানী বলিল, "মা?" "কি, মা?" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী সস্নেহে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল, "মা চল না, কেন, আমরা আমাদের সেই নিজেদের ঘরেই আবার ফিরে যাই!"

সিদ্ধেশ্বরীর ওষ্ঠপ্রান্তে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। "হ্যাঁরে দিন দিন কচিটি হচ্ছিস, না:কি? কি বলিস্ বল দেখি? অমূটার কি হবে?"

শিবানী উত্তর দিল, "সে এখানে থাক না, শুধু আমরা দুজনে চলে যাই চল, মা। চল, আর আমি এখানে থাকতে পারচি না।"

শিবানীর কণ্ঠস্বরে আজ সিদ্ধেশ্বরী রাগ না করিয়া বরং বেদনা

বোধ করিলেন। তাহার প্রাণের প্রচ্ছন্ন ব্যথা, নিগূঢ় অভিমান ও শূন্যতা তাঁহাকে একমুহূর্ত্তে যেন আঘাত করিল। সত্যই ত, কেমন করিয়া এখানে তাহার মন টিঁকিবে? চারিদিকে সুখ ঐশ্বর্য্য সবই ছড়ান, অথচ সে সকল ভোগেই বঞ্চিত! যার জন্য সব—সে আজ কোথায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "যেমন কপাল করে এসেছিলি! কি করবি বাছা, সহ্য কর। সত্যি ভগবান কি কখনও মুখ তুলে চাইবেন না? এখন কোথায় যাবি—এ যে তোরই ঘর।"

শিবানীর সর্ব্বশরীরে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া গেল। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন! চাহিবেন কি? ওগো সর্ব্বান্তর্যামী! তবে আর কতদিন বিমুখ থাকিবে? একবার মুখ তোল! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার একটু দৃষ্টির উপর এখনও কি সব নির্ভর করিতেছে না? এ কথা সে ত প্রায় ভুলিয়াই বসিয়াছিল! যদি আবার স্মরণ করাইয়া দিলে, তবে কৃপা দৃষ্টি কর। সিদ্ধেশ্বরী শিবানীকে নীরব দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া ফেলিবার আশায় বলিলেন, "এবার 'পৈরাগে' অদ্ধ কুম্ভ হবে। মনে কচ্চি 'ছান'টা করে চুলগুলো মুড়িয়ে আসবো, কল্পবাস কর্ব্বারও বড় সাধ আছে। সেজবোন, নিস্তারিণী ওরাও যেতে চায়। দেখি, শরীরটা ভাল থাকে ত যাব।"

শিবানী সে কথাগুলা হয় ত সব শুনিতে পায় নাই। সে তখন ভাবিতেছিল, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সব আবার ফিরিয়া আসে! তিনি নিশ্চয় ঠাকুরপোকে ফিরাইয়া আনেন। চাও ঠাকুর, মুখ তুলিয়া চাও।

৩৯

যোগেশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে শ্যামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হেমেন্দ্রর সংবাদ দিয়া যাইত। একদিন সে আসিয়া জানাইল, শিবানী ও তাহার পুত্রকে জাল প্রমাণ করিবার জন্য হেমেন্দ্র শীঘ্রই মকর্দ্দমা আনিবে। শুনিয়া বৃদ্ধ জমিদার বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বজ্রাহতের মত সভয়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি, কি হেম এমন কেলেঙ্কারীর কাজটা করতে পারবে? যোগেশ, তুমি তার বন্ধু, তুমি তাকে বুঝিও বাবা। শুধু শুধু একটা ঝোঁকে পড়ে সে যেন একেবারে কুলমর্য্যাদা ভুলে গিয়ে শত্রুপক্ষের মুখ না হাসায়। আমি ত তাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ করে দিতে এখনই রাজি রয়েছি। সে আমার কাছে না থাকতে চায়, স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকতে পারবে। তুমি তাকে ফিরে আসতে বল। না হয়, সে কোথায় আছে—আমায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে আমি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

চতুর যোগেশ টলিল না। বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে তাহার মনে করুণা আসিতেছিল। কিন্তু হেমকে এখন তাহার জ্যেঠার হাতে সঁপিতে দিলে তাহার বেগার খাটা সার হয়! না, নিজের একটা উপায় না করিয়া শিকার ছাড়া যাইতে পারে না। হেম দারিদ্র্যের মধ্যে এমনই উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে, অর্দ্ধেক বিষয়েই হয় ত সম্মত হইতে পারে।

সে বলিল, "আপনি হঠাৎ গেলে, সে যে রকম ছেলে, হয় ত একেবারেই বেঁকে বসবে, বিশেষতঃ আপনাকে তাদের ওপর

দিয়েছি, জান্‌তে পারলে আমার উপর শুদ্ধ, অবিশ্বাস হয়ে যাবে, কোন কাযই হবে না! তার চেয়ে বরং আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে নোয়াতে পারি, তার চেষ্টা করি। দেখুন, আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদেরই খেয়ে মানুষ! আপনাদেরই সেবক আমরা—আমার দ্বারা চেষ্টার কিছু ত্রুটি হবে না। আপাততঃ এক কাজ করুন, তাদের ত একটা কড়িও হাতে নেই, বৌঠাকুরুণের গহনা বাঁধা রেখে পরশু চারশ টাকা ধার করে দিয়েছি—জানেন ত আমার অবস্থা! আমার নিজের কিছুই নেই। তা সেই টাকাটা বরং আমায় চুপে চুপে দিন, গহনা খালাশ করে দিইগে। জিজ্ঞেস করলে না হয় বলব, অন্য জায়গা থেকে ধার করে ছাড়িয়ে এনেছি। আহা, বৌঠাকুরুণেরই কষ্ট!"

মর্ম্মের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া যোগেশ খোঁচাইয়া তুলিল। যোগেশ চলিয়া গেলে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শ্যামাকান্ত বালকের মত কাঁদিয়া বলিলেন, "মা আমার! কি চণ্ডালের হাতে তোকে দিলুম!"

দেওয়ানকে ডাকাইয়া সেইদিন তিনি রজনীনাথকে পত্র লিখাইলেন, "হেম শুনিতেছি সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য নালিশ করিবে। আমি স্থির করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বেই আমি আমার বিষয় বিভাগ করিয়া ফেলিব। অর্দ্ধাংশ বিনোদের পুত্রকে ও অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তুমি একবার আসিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাও। মা ও হেম শারীরিক ভাল আছে বলিয়া শুনিলেও আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। যোগেশ তাহাদের দেখিতেছে, সে বড়ই ভাল ছেলে। শুনিলাম, তাহারা চন্দননগরে আছে।

আজিকালিকার দিনে ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া উচিত কি না এই বিষয় লইয়া একদিন সন্ধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একটা তর্ক উঠিল! শ্যামাকান্ত এই অনার্য্য মতের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষে বেশ একটু বাক্-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রজনীনাথ ধীরভাবে কহিলেন, "আপনাদের মধ্যে কেউ, বোধ হয়, অস্বীকার করবেন না যে, আমাদের দেশে সম্যক্-রূপে বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের মধ্য হতে বুদ্ধিমান যুবক নির্ব্বাচিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানশিক্ষা করতে যাওয়া কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য দেশত্যাগ করবার আবশ্যক কি? দেশে থেকেও কি বিজ্ঞান-চর্চ্চা করা চলে না? কেন, ইউরোপ হতে শিক্ষিত লোক এনে যদি বড়লোকেরা কল-কারখানা স্থাপন করে শিক্ষার উপায় করে দেন, তা হলে তো চলতে পারে। তবে শিক্ষার ছল করে অশাস্ত্রীয় পথ নেবার প্রয়োজন কি?" রজনীনাথ অতিশয় উত্তেজিতভাবে ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন।

উভয় পক্ষে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। বিনোদ একপাশে বসিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতে লাগিল এবং প্রস্তরে যেমন চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায় তেমন করিয়াই রজনীনাথের সমস্ত কথাগুলা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে বসিয়া যাইতেছিল। যথাসময়ে বাদানুবাদ শেষ হইল। বিনোদ রজনীনাথের সমস্ত কথাগুলি একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। সে ভাবিল, সত্য, শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাই আমাদের পতিত জাতির উদ্ধারের একমাত্র পথ!

কোথায় আছে, হেমের বিরক্তির ভয়ে তাহা বলিতে সে সাহস করিল না।"

তিনদিন পরে রজনীনাথের নিকট হইতে পত্র আসিল। এতদিন ধরিয়া শ্যামাকান্ত মনে মনে অনেকখানি আশা গড়িয়া রাখিয়াছিলেন, পত্রপাঠে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। সে পত্র এইরূপ,—

"কিসের পুরস্কারস্বরূপ আপনি তাহাকে এত বড় একটা সম্পত্তির অধিকার দান করিতে চাহিতেছেন? উচ্ছৃঙ্খলতার? অবাধ্যতার? ঈর্ষার? না, অকৃতজ্ঞতার—কিসের? বিষয় আপনার, আপনি যদি তাহা রাস্তার লোক ডাকিয়া বিলাইয়া দেন, তাহাতে বাধা দিবার আমার কি অধিকার? কিন্তু আমার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহারই জন্য শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। দোষীকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার দান যদি নিতান্তই আপনার অভিপ্রেত হয়, অন্য কাহারও দ্বারা সে কার্য্য করাইয়া লইবেন, আমায় ক্ষমা করুন। আবশ্যক হইলে আপনার দলিলপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমায় অনুগ্রহ করিয়া কোন সংবাদই দিবেন না।"

কি ভয়ানক! এই সেই রজনীনাথ, সেই সন্তানবৎসল পিতা! প্রাণাধিকা স্নেহের কন্যার সম্বন্ধে আজ তাঁহার এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পত্র!

শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

৪০

শ্যামাকান্তের প্রথম পত্রের উত্তর যে রজনীনাথ তেমন নিষ্ঠুরভাবে দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা গোপন রহস্য ছিল।

শান্তিকে দণ্ড দিবার পর যখন অনুতপ্ত চিত্ত বেদনার কশাঘাত করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিল, "মূঢ়, তুমি নিতান্তই মূঢ়। ধিক্ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে! এই বুদ্ধিতে তুমি নিরীহ মক্কেল, ঠকাইয়া খাও। তোমার নিজের সন্তানের প্রকৃতি তুমি নিজে জাননা? একটা বালক তোমায় ঠকাইয়া গেল!" তখন ইহাও তাঁহার স্মরণ হইল যে, হেমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে, তাহা জানিবারও কোন উপায় রাখা হয় নাই। সেদিন তাহাদের সঙ্গে তিনি একটা লোকও দেন নাই! দিলে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিল, কি কলিকাতার ভিতরে রহিল, অন্ততঃ এটুকুও জানা যাইত। ছি ছি, একি আত্মবিস্মৃতি! একি বিচারের ভাণে পূর্ণ অবিচারকে আশ্রয় করা! শান্তির সেই জলসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত সজল চোখ দুটি বেদনাবিক্ষত পিতৃবক্ষে রাত্রি দিন কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

অনুসন্ধানের পথ নাই। কাহারও নিকট বলিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। অসুস্থতার দোহাই দিয়া বসুমতী শয্যাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার নিকটই বা সান্ত্বনা কোথায়? গুরুভার চিত্ত কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিন কাটিতেছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহী রাত্রি যেন কিছুতেই আর পোহাইতে চাহিত না। নিঃশব্দে নিরানন্দে সময় আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

খুকু এখন অনেকটা বড় হইয়াছে। সে এখন লোকের

সুখদুঃখ অনেকটা অনুভব করিতে পারে। দিদি হঠাৎ আসিয়া অন্তর্ধান হইবার পর হইতেই যে পিতার মনে একটা সুগভীর ক্লেশ আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, তাহা সে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিতে পারিত। তাই দিদির সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ সত্ত্বেও পিতাকে সে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিত না। কিন্তু এবার দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়া তাহার চারিখানা চিঠির একখানারও জবাব দিল না কেন? এ প্রশ্নে সে বসুমতীকে দিনের মধ্যে অনেকবার বিচলিত করিয়া তুলিত। কখনও সে অভিমান করিত, আবার কখনও বা "মা আমি দিদির কাছে যাব, আমায় পাঠিয়ে দাও" বলিয়া আব্দার ধরিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া মাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও রজনীনাথ আজ ঘর হইতে বাহির হন নাই। সুকু তাহার পেঁপে গাছের নলে তৈয়ারি টেলিফোন যন্ত্র আনিয়া আপনার অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দান করিয়া তাঁহার হাস্যবিহীন অধরপ্রান্ত স্নেহের মৃদু হাস্যে চকিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় চাকর একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া ডাকের ছাপ ও হাতের লেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চকিতভাবে রজনীনাথ বলিয়া উঠিলেন, "চৌধুরী মশায়ের চিঠি যে।" ক্ষিপ্রহস্তে খামখানা তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মানসিক উদ্বেগে থর থর করিয়া তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। কি সংবাদ আছে? তারা কি তবে সেখানে? পত্র শেষ হইলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তিনি কাগজখানার উপর দৃষ্টিস্থির করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন। তবে তাহারা ফিরিয়া আসে নাই! তবু একটা খবর পাওয়া গেল। ফরাসডাঙ্গা কি এমন মস্ত সহর যে সেখানে

তাহাদিগের সন্ধান মিলিবে না। সুপ্রকাশ আসিয়া উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। রজনীনাথ সাগ্রহ আনন্দে পুত্রকে বুকে টানিয়া সহসা অজস্র চুম্বনে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিলেন। সুসংবাদের আনন্দ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সুকুও বুঝিয়াছিল, এ আদরটা ঠিক তাহার জন্য নহে, ইহার মধ্যে তাহার দিদিরই প্রাপ্য অধিকাংশ। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দিদি ভাল আছে ?" রজনীনাথ চিঠিখান আবার একবার পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন, "ভাল আছে।" "দিদি কি আর আসবে না, বাবা ?" পিতা শিহরিয়া উঠিলেন। বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত সহসা একটা বাধা পাইয়া থমকিয়া গেল, কিন্তু তখনই জোর করিয়া মনকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি কাল ভোরেই তাকে আনতে যাব।" সুপ্রকাশ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল, "আর আমি ?" "তুমি তোমার মার কাছে থাকবে, দিদির জন্যে নতুন নতুন জিনিষ সব তৈরি করে রাখবে, দিদি এসে বলবে, সুকু যেন বাঙ্গলার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ হয়েচে।" গৌরবে বালকের ললাট ও নেত্র দীপ্ত হইয়া উঠিল।

একটা শিল্পকার্য্য লইয়া বসুমতী অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিলেন, কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইতেছিল না। আজকাল আঙ্গুলের মধ্যে সূচ বিঁধিয়া যায়, চোখের ভিতর করকর করে! এমন নানা বাধায় আজকাল শিল্পকুশলা বসুমতীর সকল কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকে, তথাপি সময় কাটাইবার একটা অবলম্বনও চাই।

সবেমাত্র একটা ভুল করিয়া মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে,

এমন সময় বাহিরে দুপ দাপ শব্দ সুপ্রকাশের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। রজনীনাথের সাড়া পাইয়া বসুমতী হঠাৎ কাজের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিলেন। সুকু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "মা, মা, বাবা কাল সকালেই দিদিকে আনতে যাবেন।" সেলাইটা বসুমতীর হাত হইতে ভূমে পড়িয়া গেল। বিদ্যুৎসঞ্চালিতের মত তিনি স্বামীর পানে চাহিলেন।

রজনীনাথ ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কাল ফরাসডাঙ্গায় যাব।"

"ফরাসডাঙ্গা! কেন, সেখানে—"

"হ্যাঁ, সেখানে তারা আছে, খবর পেয়েছি।"

দাসীকে ডাকিয়া বসুমতী হরির লুটের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন ফরাসডাঙ্গায় গিয়া একজন ধনী মক্কেলের সাহায্যে রজনীনাথ তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রর বাসার সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। কাজে কাজেই রজনীনাথকে সে রাত্রি সেখানেই থাকিতে হইল।

পরদিনও অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। ডাকঘরেও খবর লওয়া হইল, হেমেন্দ্র চৌধুরীকে কেহ চিনে না। হতাশ হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া চলিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যোগেশের সন্ধানে তিনি লক্ষ্মীপুর যাইবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই প্রবেশ-পথের সম্মুখে দেখিলেন, যোগেশের বাহু অবলম্বন করিয়া হেমেন্দ্র আসিতেছে। অভাবনীয় সাক্ষাৎ! প্রথমটা দুইজনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এবং রজনীনাথও বিস্মিত

হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যোগেশ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দুই হস্তে রজনীনাথের পদধূলি মাথায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে এসেছিলেন। কাজ ছিল?"

হেম যোগেশের আড়ালে আপনাকে একটু ঢাকিয়া অল্প দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল, সম্মুখে আসিল না, প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না। রজনীনাথ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কাজেই এসেছি, তবে সে কাজ এখনও আমার বাকি রয়েছে, যোগেশ! শান্তির কাছে আমায় নিয়ে চল, আমি বাড়ির সন্ধান করতে না পেরে ফিরছিলুম।"

যোগেশ হেমেন্দ্রর দিকে চকিত কটাক্ষনিক্ষেপ করিল, দেখিল, তাহার মুখ ঈর্ষার বিদ্বেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কি একটা কথা বলিবার জন্য তাহার অধর কম্পিত হইতেছিল। ইঙ্গিতে যোগেশ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "বেশ ত আসুন না। আপনি না এলে আমিই বোধ হয় কাল আপনার ওখানে যেতুম। দাঁড়ান্, একটা গাড়ি ঠিক করি—"

গাড়ি ডাকিতে যোগেশ একটু অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার অনুসরণ করিয়া গিয়া হেমেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল, "যোগেশ, তোমার মতলবটা কি? ওঁকে কেন তুমি নিয়ে যেতে রাজি হলে? কি তেজ দেখেচ? আমাকে দৃক্‌পাতও নেই, যেন দেখতেই পেলেন না! মনে করেছেন, মেয়ে নিয়ে যাবেন, দিচ্চি তাই নিয়ে যেতে!"

যোগেশ মৃদুস্বরে বাধা দিয়া বলিল, "থামো না, লোকটাকে চটিয়ে কি হবে? দেখনা, সহজেই কাজ সারা যাবে এখন।

আমার উপর যদি নির্ভর কর' ত তুমি একটিও কথা কয়োনা; আর যদি পার ত ভাল ব্যবহারই করো।"

হেম যোগেশের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে যেমন গড়িতেছে, শিব বা বানর, নির্ব্বিবাদে সে তাহাই হইতেছে। সে সম্মত হইল। গাড়ি আসিলে প্রথমেই রজনীনাথ উঠিয়া বসিলেন, হেমের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "এস, যোগেশ।" যোগেশের ইঙ্গিতে হেম সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। যোগেশ ও হেম গাড়িতে উঠিলে মুমূর্ষুপ্রায় অশ্বদ্বয় চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মন্দগতিতে চলিল।

অনেকটা দীর্ঘ পথ, অশ্বের গতি অত্যন্ত মন্থর, কাজেই সময় লাগিল বিস্তর। পথের মধ্যে যোগেশ বলিল, "আপনার কাছে যাব বলছিলুম, এই জন্যে যে, বৌঠাকরুণের মাথাটা যেন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্চে! তাই ছোট বাবু আমায় বলছিলেন, তিনি হঠাৎ রাগের মাথায় বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেচেন, এখন কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, কেমন করেই বা আপনাদের কাছে মুখ দেখাবেন! আরও বলছিলেন, বৌঠাকরুণেরও যে কি হয়েচে, তিনি কিছুতেই লক্ষ্মীপুরে বা কল্‌কাতায় যেতে চান না। জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বলেন, ট্রেণের তলায় পড়ে মরবো! তাই আমায় একটা উপায় করতে বলছিলেন। তা দেখুন, এর আর আমি কি করব? আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হোল এই যে, আপনাকে আমি গিয়ে সব বলি! আপনি যখন নিজেই এসেছেন, তখন আর কথাই নেই? আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখন বাড়ী নিয়ে যান।"

রজনীনাথ ভালমন্দ কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু মনের

মধ্যে হঠাৎ সে বেত্রাঘাতের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গাম্ভীর্য্যের চেষ্টার মধ্য দিয়াও তাহা গোপন করা গেল না।

যোগেশ পুনরায় একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা নৈলে আর অমন বুদ্ধি কি এমন করেই বদলে যায়? কর্ত্তার নামও শুনতে পারেন না, আপনার কাছে যাবার কথা শুনলেও— তা ও সব কথায় কাজ নেই আর, আপনাকে দেখলে হয় ত আবার মন ফিরতেও পারে। আমি কত বোঝালুম, তা বল্লেন কি,—আমি মনে করি, আমার কেউ নেই, এখন বুঝতে পেরেচি, স্বামীই জগতে শুধু আপনার, আর কেউ আপনার নয়,—কারুকে চাই না।"

রজনীনাথের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি একটা সন্দেহ, একটা আশা—কিন্তু লাভ কি? যোগেশের এত মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লাভ থাকিলে অনেক লোক মিথ্যাকে কি রকম সাজাইয়া তুলিতে পারে, সে কথা রজনীনাথ ভালই জানিতেন, কিন্তু এ অহেতুকী মিথ্যা যোগেশ কেন বলিবে? বিশেষতঃ সেই ত শ্যামাকান্তকে ইহাদের সংবাদ দিয়াছে; সে তাহাদের শুভার্থী।

কশাঘাতে জর্জ্জরিত অশ্ব একটা গলির সম্মুখে থামিলে তেমনই কশাজর্জ্জরিত চিত্তে রজনীনাথ যখন সেই প্রদর্শিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁহার হৃদয় অনুতাপপূর্ণ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে! কেনই বা হইবে না? এইখানে সে বাস করিতেছে, আর সেই ব্যবহার পাইবার পর! সম্মুখেই হেমেন্দ্রর বাড়ী।

যোগেশ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, রজনীনাথকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশের ইঙ্গিতে হেম কহিল, "আসুন। একটু দাঁড়ান, আমি একবার খবর দিয়ে আসি।"

যোগেশ কহিল, "হ্যাঁ, আসুন, আপনার কথা শুনলে তাঁর মন ফিরতেও পারে।"

রজনীনাথ কিছু বলিলেন না। বলিবার শক্তিও বোধ হয় তাঁহার অল্প ছিল। আবার দারুণ সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সত্যই কি তবে সে এতখানি ভুল বুঝিয়াছে! পিতার একান্ত বিশ্বাস ও অপরিসীম স্নেহ কি সেই শাস্তির মধ্যে সে প্রকটিত দেখিতে পায় নাই? তাহাকে দোষী ভাবিতে তাঁহার বুক যে ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না? সে কি জানেনা, কি কষ্ট এতদিন ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছেন? কৈ সে বুঝিয়াছে? এতদিন একখানা পত্রও কি সে কোনরূপে লিখিতে পারিত না? হায়, বুকের রক্ত দিয়া গড়া তাঁহার শাস্তি! উত্তেজনায় মাথায় ও মুখে গরম রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সে দেখা করতে চায় না,—বলে—"

রজনীনাথ উদ্যত আঘাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দুই পদ পিছাইয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাম, আমি শুনতে চাই না, সে কি বলে, নিজে একবার—"

তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "তবু শুনুন, কি বলে। সে বলে, কুকুর শেয়ালের মত ত রাত দুটোর সময় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচেন, তাতেও কি সাধ মেটে নি?

আর কেন? বেশ, একবার চলুন, দেখা করবেন, আমার কোন আপত্তি নেই—"

সমরনিপুণ সেনাপতি যেমন আপনার দৃঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত বক্ষে সহসা একটা জ্বলন্ত গোলার আঘাত পাইলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বেদনাত্রস্ত হইয়া উঠেন, সেইরূপ আশাহতভাবে রজনীনাথ দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশও তাঁহার অনুসরণ করিল। হেমেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেও সে গেল না। নিকটে গিয়া যোগেশ তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিল, একটু অনুতপ্তও সে হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বাভাবিক স্বার্থপরতা করুণাকে সর্ব্বদা পরাজয় করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও অসুরের জয় হইল। হেমেন্দ্র শ্বশুরের সহিত মিলিত হইলে মকর্দ্দমা বাধে না, তাহা না বাধিলেও যোগেশ যে তাহার ভাঙ্গা বাড়ী সারাইয়া দ্বিতল গৃহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়, সেজবধূর কোমরের বিছা ও ডায়মণ্ড-কাটা তাবিজ পরার সাধও অপূর্ণ থাকে। শ্যামাকান্তের ন্যায় রজনীনাথকেও তাহার স্বার্থসিদ্ধির কল তৈয়ার করিবার লোভে যোগেশ রজনীনাথের সঙ্গে আসিয়াছিল। কুণ্ঠিতভাবে সে কহিল, "আমায় মাপ করবেন,—নিজে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হত না? হেম যদি ঠিক না বুঝতে পেরে থাকে! তা ছাড়া যদি অভিমান করেই কিছু বলে থাকেন, আপনারই ত সন্তান—"

রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমার সন্তান? না,

পরদিন কোর্টের কাজটুকু সারিয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী রজনীনাথের সহিত তাঁহার গৃহে ফিরিয়া জলযোগে বসিয়াছেন, এমন সময় গৃহস্বামীর পাঁচ-ছয় বৎসরের কন্যা শান্তিলতা তাহার ক্ষুদ্র নীলাম্বরী সাড়ির অঞ্চলে মাথার কালো চুল ঢাকিয়া মোটা মোটা শুভ্রহস্তে পানের ডিবা লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইল।

বালিকার অম্লান কচি মুখখানিতে স্বর্গের জ্যোতি, পুষ্পপুটতুল্য অধরপ্রান্তে মধুর হাসি! রজনীনাথ কন্যাকে ক্রোড়ে বসাইলে, সে পিতার অঙ্ক হইতে শশব্যস্তে নামিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে একটু ধমক দিল, "আমি এখন বড় মেয়ে হয়েছি, কোলে বসবো কি? কাজ কর্বো না?"

শুনিয়া শ্যামাকান্ত হাসিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো মস্ত মেয়ে হয়েছ যে! বাঃ, আবার ঘোমটা দেওয়া হয়েছে! এস তো বুড়ি, কেমন বউ হয়েছ, দেখি"—বালিকা স্বচ্ছন্দে অপরিচিতের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাকান্ত সস্নেহে বলিলেন, "বাপের উপযুক্ত মেয়ে বটে! রজনীবাবু, আপনার মেয়েটি বেশ সুন্দরী! যাদের বৌ হবে, তাদের ঘর আলো কর্বে। হাঁগা লক্ষ্মী, তুমি আমার বউমা হবে?"

পার্শ্বোপবিষ্ট বিনোদকুমারের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে এতক্ষণ নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিতেছিল, কিন্তু এখন বাধ্য হইয়া তাহাকে মাথা নীচু করিতে হইল। যদিও সে জানিত, তাহার পিতার এ পরিহাসের মধ্যে একবিন্দু সত্য নাই, কারণ, সে অষ্টাদশ বৎসরের যুবক এবং রজনীনাথের কন্যা ছয় বৎসরবয়স্কা বালিকা মাত্র, তবু একটু লজ্জা হইল!

রজনীনাথ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, আপনি

আমার সন্তান হ'লে আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারত না। ঐ আমি কাকে খুঁজতে কোথায় এসেছিলাম? আমার সন্তান কাকে বলচ, যোগেশ! যে আমায় চেনেনা, সে আমার সন্তান? না।"

রজনীনাথ প্রায় একরূপ ছুটিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, হাঁকিয়া বলিলেন, "ষ্টেশন চল, হাঁকাও"। হতবুদ্ধি যোগেশ দাঁড়াইয়া রহিল, বুঝিল, সবাই শ্যামাকান্ত নহে।

হেমেন্দ্র যখন সেই জনহীনপ্রায় নিস্তব্ধ বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন তাহার দুই চোখে যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল। তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুর মৃদু হাসি অত্যন্ত গৌরবের ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সুন্দর চেহারাটিকে উপাখ্যানবর্ণিত দৈত্যের মত ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ যে সে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে, তাহার জন্য যোগেশকে ও নিজেকে সে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। গম্ভীরপ্রকৃতি শ্বশুরের সম্মুখে মনটা এখনও সঙ্কুচিত হইয়া আসে বটে, কিন্তু তথাপি পৌরুষের সাহায্যে সে সে-দুর্ব্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে!

পশ্চিম দিকের ছোট ঘরখানায় তক্তাপোষের উপর মলিন শয্যায় ম্লান ছায়াখানির মত শান্তি শয়ন করিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘর কনকনে হইয়া উঠিয়াছিল, দুই একদিন, বোধহয়, মেঝেয় ঝাঁট পড়ে নাই। হেমেন্দ্র দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি মনে করচি, আজ একবার কল্‌কাতা যাব। কাঁহাতক আর এই বনের মধ্যে পড়ে থাকি। তোমার অসুখ একটু কম আছে ত?"

শান্তি দেওয়ালের দিক হইতে মুখ ফিরাইল, কহিল, "আমি? আমি ভালই আছি—বাইরে কে এল, ও? জুতোর শব্দ যেন চিনি,—উঠতে গেলুম, পারলুম না, কে এল?"

হেমেন্দ্র একটু চকিত, একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে উত্তর দিল, "ও একটি বাবু, ঐ রায়েদের বাড়ীর।"

শান্তি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে আপনাআপনি কহিল, "বাবার মত জুতোর শব্দ কিন্তু—"

হেমেন্দ্র মনে মনে বিস্ময়ানুভব করিলেও প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমার বাবার ত তোমার জন্য ঘুম হচ্চে না। তুমিই বাবা বাবা করে মর, তাঁর ত ভারী মায়া!"

আহতভাবে শান্তি মাথা তুলিল, কহিল, "অমন কথা বলোনা, তাঁর দোষ কি? তিনি ত বলেছেন, জ্যেঠামশায় ক্ষমা করলেই তিনি ক্ষমা করবেন। আমরা—"

হেম অধীর হইয়া উঠিল, কহিল, "থাম, থাম, আমার লেকচার শোনবার অবকাশ নেই। আমি চল্লুম, কালও হয়ত আসতে পারব না। যা দরকার হয়, ঝিকে দিয়ে করিও, আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি, আর পারছিনে—"

হেমেন্দ্র গমনোদ্যত হইল। শান্তি ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে কহিল, "পারবার দরকার কি? আমায় জ্যেঠামশায়ের কাছে দিয়ে এসোনা—"

হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ক্ষেপেচ!"

সেদিন সন্ধ্যার পর রজনীনাথ বাড়ী পৌঁছিলে প্রথমেই সুপ্রকাশ

গাড়ির কাছে ছুটিয়া আসিল। "দিদি, এল ভাই ?" গাড়ির মধ্য হইতে রজনীনাথ ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ির ভিতর দিদির কোন চিহ্ন না পাইয়া বালক তাহার গভীর আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত আঘাত বোধ করিল। বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত নেত্রে পিতার পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দিদি ?"

রজনীনাথ কোন উত্তর দিলেন না বা পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, একেবারে নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্যামাকান্তের পত্রের উত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে তাহা ডাকে দিতে দিয়া যখন তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন, বসুমতী ইহা পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন। শান্তি যে আসে নাই, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। ভয়ে ভাবনায় তিনি শুখাইয়া উঠিয়াছিলেন, সুপ্রকাশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

৪১

যমুনার পুলের উপর হইতে মথুরাপুরীর প্রাসাদ-মন্দিরময়ী সমৃদ্ধা নগরী বড়ই মনোরম দেখায়। সারি সারি উচ্চ প্রাসাদমালা ও তাহার নিম্নে প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী অগ্রসর হইয়া যমুনার সুনীল জলতলে নামিয়া গিয়াছে। প্রতি ঘাটেই ঘাট আলো করিয়া অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গী ব্রজরমণীগণ স্নান করিতেছে, তাহাদের হাস্যের ঝঙ্কারে ও সৌন্দর্য্যের ছটায় মূক প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছেন।

নীরদ গাড়ির গবাক্ষ হইতে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চারিদিককার দৃশ্য পরম আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। অনেক দিনের পর

কোন আত্মীয়জনকে দেখিতে পাইলে মনের মধ্যে যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়া উঠিয়া নানা কথা নানা স্মৃতিকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনে, তেমনই একটা স্মৃতিপূর্ণ আনন্দের ভাব তাহার চিত্তকে ইহাদের দিকে টানিতে লাগিল। ক্রমে পুল ছাড়াইয়া সবুজ ও হরিৎ শস্য পুষ্পখচিত মাঠের মধ্য দিয়া কৃষকবালিকার সকৌতুক কালো চোখে ছায়া ফেলিয়া মৃদুমন্দ গমনে ট্রেণ আসিয়া যথাস্থানে থামিল। সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে একটিমাত্র ব্যাগ ও একখানা ছাতা, কাজেই কুলীদের ঝাঁক চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল না বটে, তবে ঘেরিয়া ফেলিল, পাণ্ডার দল। "কি নাম? গোত্র কি? নিবাস? বাসা চাই কি না?" ইত্যাদি প্রশ্নে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শিকার লইয়া ছেঁড়াছিঁড়িতে যাত্রী এক মুহূর্ত্তেই কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া উঠিল। নীরদ তীর্থদর্শন করিতে আসে নাই, আত্মীয়গৃহে আসিয়াছেন, এই সামান্য কথাটা কোনমতেই যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিল না, তখন অসহায়ভাবে তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সে বলিল, "তবে আমায় কোথায় যেতে হবে, না হয়, চল, তাই যাচ্ছি।" কিন্তু তাহাতেও সে মুক্তি পাইল না। সে কাহার ভাগে পড়িল, তাহা স্থির না হইলে কেহই ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে। এবার রীতিমত কলহ বাধিয়া উঠিল। এমন কি শেষটা প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হইল। একজন আসিয়া নীরদের ডান হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বলিল, "চলুন, বাবু, আমি আপনার পাণ্ডা হলুম, রঘুবল্লভ মিশ্র, সাড়ে সাত ভাই আমরা, আমরাই সকলের প্রধান, আমার সঙ্গে চলুন।"

আর একজন তাহাকে ধাক্কা দিয়া নীরদের অন্য হস্ত ধরিয়া

টানাটানি আরম্ভ করিল। বলিল, "কি মতলববাজ লোক তুমি হা? এ বাবু, আমার এস বাবু, আমি তোমায় ভাল বাড়ী দেব। আমার সঙ্গে এস। 'হাতে নাড়ু' গোপাললাল ব্রজবাসী আমি। ক্রমে ক্রমে সাড়ে পাঁচ ভাই পড়ে তিন ভাই ও 'হাতে নাড়ু কানে নাড়ু'র দল' সকলেই বাবুকে লইয়া টানাটানি করিতে করিতে বিবাদ বাড়াইয়া তুলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পণ্য দ্রব্যের মত টানাহেঁচড়ার পর অবশেষে যে সর্ব্বপ্রথম ধরিয়াছিল, নীরদ তাহারই অংশে পড়িল বলিয়া স্থির হইলে অপর সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেলে নীরদ মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিল। এই পাণ্ডার দল, নেকড়ে বাঘের মত, যাত্রীর ঘাড় ভাঙ্গিতে মজবুৎ! ইহারা মানুষকে ধৈর্য্য রাখিতে দেয় না, ধর্ম্ম-বিঘ্নকারিগণ, সে ইহারাই।

গাড়িওয়ালাদের মধ্যেও একবার এইরূপ একটা অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল, কিন্তু সে গাড়ি চাহে না বলিয়াই তাড়াতাড়ি তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া আসায় একটু ডাকাডাকি করিয়া অগত্যা তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে নিবৃত্ত হইল।

নীরদ ষ্টেসন পার হইয়া সহরের দিকে গেল না, বিপরীত পথ ধরিল। দেখিয়া সঙ্গী পাণ্ডা কহিল, "বাবু, এই তোমার পাণ্ডা চাই না! এখনি পথ ভুল কবলে! ও রাস্তা নয়, সহরে ঢোকবার এই রাস্তা—"

নীরদ দাঁড়াইল, পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি টাকা লইয়া পাণ্ডার হাতে দিবা বলিল, "তোমার যা পাওনা, তা দিলুম, বাপু, তুমি ঘরে যাও, আমার সঙ্গে ঘুরতে তুমি পেরে উঠবে না।"

পাণ্ডা বিস্মিত হইয়া নূতন ধরণের লোকটাকে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর দেখবেন, না ?"

নীরদ বলিল, "তোমার কাজ ত হয়ে গেল, তুমি কেন এইবার যাওনা।"

পাণ্ডা ভাবিল, এ লোকটা নিশ্চয় খৃশ্চান, যাই হোক দুই দুইটা টাকা ত দিয়াছে অথচ পরিশ্রমও করিতে হইল না! সে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেল।

নীরদ সম্মুখে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিল।

তিনদিকে প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অপর দিকে যমুনা। মাঠের মধ্যে মধ্যে গম, সরিষা ও ছোলা মটরের ক্ষেত অর্দ্ধপক্ক শস্যে হরিতাভ হইয়া উঠিয়া মাতা বসুন্ধরার শ্যামাঞ্চলের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কলাই সুঁটির প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ ভায়োলেটের মত বেগুনী রংয়ের উজ্জ্বল আভায় ক্ষেত আলো করিয়া রহিয়াছে! কোথাও সর্ষেফুলের নিকট মৌমাছির দল মাতাল হইয়া ঘুরিতেছিল। মৃদু বাতাসে গাছের মাথা নুইয়া পড়িয়া একটা সর সর তর তর শব্দ উঠিতেছে এবং তাহার সহিত মিশিয়া যমুনার তীর হইতে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের এক চরণ ভাসিয়া আসিতেছিল। নীরদ শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল, "কৈসে যাঁউ রে যমুনা ?"

নীরদ মুগ্ধনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পশ্চিমে সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাধাহীন মাঠের শেষে সূর্য্যাস্তের বিপুল সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। ভূমার সহিত ভূমির, ক্ষুদ্রের সহিত মহতের এই যে অনাদি সম্বন্ধ চির সম্বদ্ধ রহিয়াছে, ইহা কি কোন একদিনের জন্যও ছেদিত হইতে

পাবে! রক্তবর্ণ কিরণচ্ছটা সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ধরণীবক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিতেছে। আকাশে পুঞ্জ মেঘের শুভ্র স্তর তাহার গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! নীরদ নিকটবর্ত্তী একটা দেবদারু গাছের তলায় বসিল।

আর অল্লক্ষণ পরেই সসীমের সহিত অসীমের মিলনে যে একটু-মাত্র বাধা আছে, অন্ধকারে সেটুকুও মুছিয়া যাইবে। এই যে মিলনের জন্য ব্যগ্র ব্যাকুলতা. এই যে দুই বাহু বাড়াইয়া কাতর আবাহন, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার মধ্যে সমর্পণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ হইবার যে একটা ঐকান্তিকতা, ইহাদেরও ত অর্থ আছে!

নীরদ নীরবে চাহিয়া রহিল। চারিদিকের সাড়া শব্দ ডুবিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, মধুকরের গুঞ্জন ও রাখালবালকের হাস্যপরিহাস থামিয়া এখন কেবল এক অবিচ্ছিন্ন মহারাগিণীর অনন্ত অব্যক্ত সঙ্গীত জনহীন প্রান্তরে ও অন্ধকার জগতে ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। নীরদ নক্ষত্র-বিরল আকাশের পানে চাহিল। স্নিগ্ধ কিরণবর্ষী জ্যোতিষ্কগণ বিপুল স্নেহে জগতের দিকে চাহিয়া আছে, আর অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে তেমনই চিরপ্রশান্ত, তেমনই চির উদাসীন। সূর্য্যের প্রতপ্ত কিরণ, গ্রহ-তারকার বিমল জ্যোতিঃ কিছুই তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কি মহান্ উদারতা, কি অপূর্ব্ব মহিমা!

নীরদ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্তব্ধ অন্ধকারে ঝিল্লীর একতান বিশ্বতপোবনোচ্চারিত সেই এক অনাদি ধ্বনির সহিতই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। শীত রাত্রের মুক্ত আকাশ ঘন কুয়াশার আবরণে অর্দ্ধাবরিত হইয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতিকে যোগীন্দ্রের সমাধি মূর্ত্তির মতই, স্থির ও প্রশান্ত দেখাইতেছিল।

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিসের লজ্জা কিসের সঙ্কোচ? এখনও এত অভিমান! আমিত্বের এতখানি অহঙ্কার, এখনও হৃদয়দ্বারের কবাট চাপিয়া প্রহরা দিতেছে! না! বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত বিভক্ত যেমন, এই একের মধ্যে মিশিয়া, এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ও অবিভক্ত মাত্রে পরিণত হইয়া গেল, তেমনই ভাবে লজ্জা সঙ্কোচ সব সেই এক কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতে হইবে!

অন্ধকারে কষ্টে পথ চিনিয়া সে সহরের দিকে চলিল।

সূর্য্য পৃথিবী ও গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই আকর্ষণের বলে সূর্য্যের পানে তাহাদের গতি অবিরাম। আবার গ্রহগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া উপগ্রহসকল তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইরূপে কত কোটি সূর্য্য, কত শত গ্রহ উপগ্রহকে অবিশ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? আবার সেই সমুদয় সৌরজগৎই যে কোন এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির পার্শ্বে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুরই মত আকৃষ্ট হইয়া অহরহ ভ্রমণ করিতেছে না—তাহারই বা প্রমাণ কোথায়! আকর্ষণই সৃষ্টির ধর্ম্ম, তাই সৃষ্ট পদার্থমাত্রই আকর্ষণধর্ম্মী, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকর্ষিত! নীরদ কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল, যমুনাতীরের সেই ক্ষুদ্র বাতায়নটি! যমুনার জল স্থির হইয়া রহিয়াছে, আকাশের আপ্রান্ত নক্ষত্রখচিত, বাতাস গাছের পাতার মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া বহিতেছিল, আর সেই স্তব্ধ নির্জ্জন গৃহে, দূর আকাশের দিকে অচঞ্চল নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, সে একা বসিয়া। কোথাও কোন মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, বিরামশয়নে সকলেই নিশ্চিন্ত শান্তি উপভোগ করিতেছে, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকেই আপন

স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। শুধু সে-ই একা জাগিয়া! নীরদ নিজেরও অজ্ঞাতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। ঐ যে দুইটি নিদ্রাহীন নেত্র তাহাদের সুদীর্ঘ কৃষ্ণপল্লবের মধ্য হইতে যুগল তারকার মত রাত্রির পর রাত্রি অনিমেষে চাহিয়া আছে, ঐ যে হৃদয়খানি বাহিরের সকল ঝটিকা, সকল বজ্রনাদ উপেক্ষা করিয়া মৌন দৃঢ়তায় আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিয়া সদাজাগ্রত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কি একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণী-শক্তি নিহিত নাই?

জগতে কোন শক্তি ব্যর্থ যায় না। চুম্বক লৌহকে বুঝি এমনই করিয়া টানিয়া আনে! গভীর রাত্রে রুদ্ধ গৃহের দ্বার ঠেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে নীরদ ডাকিল, "শিবানী!"

শীতের রাত্রে রুদ্ধদ্বার প্রতিবাসীগণ সকলেই নিদ্রামগ্ন। গলির মধ্যে অন্ধকার নিবিড়ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে যমুনার জল কল কল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। ঘুমন্ত রাত্রে কেবলমাত্র পল্লীর প্রান্তবর্ত্তী একটী স্থান হইতে এসরাজ ও তবলার চাঁটির সহিত একটা সঙ্গীতের সাড়া আসিতেছিল। নীরদের আহ্বান তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেহই উত্তর দিল না। গৃহে কেহ বাস করিতেছে এমন কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত কোথাও নাই। হঠাৎ সে দেখিল, দ্বারে বাহির হইতেই তালা বন্ধ। নীরদের হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট রাতটুকু, সেই দ্বার—যে দ্বারে সে একদিন আশ্রয়হীন, নিরাত্মীয়, দারিদ্র্য ও রোগক্লিষ্ট পথিকরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নিতান্ত দুরদৃষ্টের সময় যে তাহাকে সাদরে নিজের কোলে স্থান দিতে

কুণ্ঠিত হয় নাই, আবার একদিন যাহার অনুযোগ তিরস্কার ও মিনতি উপেক্ষা করিয়া সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল,—সেই দ্বারে বসিয়াই কাটাইল। যেটুকু সুখ, সে মাতৃহীন হইবার পর লাভ করিয়াছিল, তাহা এইখানেই—সে কথা আজ খুব পরিস্ফুটরূপেই সে অনুভব করিতে লাগিল। নিজেকে অপমানিত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া যে ক্ষোভ হইত, সেইটা মুছিয়া দিলে তাহার সঙ্গে ততখানি প্রাণঢালা নির্ভরতা ও প্রেম সে ত এইখানেই পাইয়াছে!—সে যে তাহাকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল, আর নীরদ তাহার মূল্য না বুঝিয়া তাহাকে ধূলায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া এতদিন পরে আবার সেই অনাদৃত দান কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু কই? তাহার সম্মুখে কি এই ক্ষুদ্র দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

ভোরের আলোক প্রকাশিত হইতে না হইতে রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হইল। ঠাকুরবাড়ির নহবতে ভৈরবী রাগিণী বাজিতে লাগিল। নীরদ নিকটবর্ত্তী দোকানের সদ্যজাগ্রত ছোক্‌রা দোকানীর নিকট গিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর অধিবাসীদিগের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। এ দোকানী নূতন লোক, নীরদকে চিনিত না। বাঙ্গালী বাবুকে একজন ভাল খরিদ্দার পাইল ভাবিয়া সে তাহাকে খাতির দেখাইয়া বলিল, "আপনি ও বাড়ী ভাড়া নেবেন? তা নেন্ না, কলি ফিরিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যাবে। না হয়, একটু বিলিতি ওষুধ ছড়িয়ে দিলেই হবে।"

নীরদ তাহার কথার প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া

আমার মেয়েটিকে নিয়ে আপনার ছেলেটি আমায় দিন না! আমি ওকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে বিলেত পাঠাই। এমন বুদ্ধিমান উন্নতিশীল ছেলেই তো আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা।"

এ পরিহাস প্রৌঢ় জমিদারের ভাল লাগিল না। তিনি ইহাতে কান না দিবার ভাণ করিয়া শান্তির সুগোল নরম হাতখানি ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন, কহিলেন, "কেমন, বুড়ি, আমার বৌমা হবে তো? আমার বাড়ী গিয়ে আমায় পান সেজে দিতে পারবে?"

নির্লজ্জা বালিকা পিতার সম্মুখেই অপরিচিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হবো! আমি পান সাজতে পারি, কমলানেবু ছাড়াতে পারি, কলাইশুঁটী ছাড়াতে পারি, সব পারি।"

উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। বিনোদ ঈষৎ হাসিল, কিন্তু তাহার মন তখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; সে ভাবিতেছিল, "রজনীবাবু যা বল্লেন, বাবাতো তা কানেও তুললেন না, বোধ হয় তামাসা বলে গ্রাহ্যই কল্লেন না। কিন্তু আমি এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম, বিলেত যাবোই যাবো; আর এসে রজনীবাবু যেমন বলচেন, তেমনি করে দেশের উপকার করবো, এতে আমাকে যতো বাধা বিঘ্ন ঠেলতে হয়, আমি প্রস্তুত। সত্য, আমরা কি মানুষ! উদ্যম নেই, উৎসাহ নেই, শেকলবাঁধা কুকুরের মত—এ কি মানুষের জীবন!"

শ্যামাকান্ত বলিলেন, "রজনীবাবু, বিনোদের জন্য একটী পাত্রী স্থির করে দিতে পারেন? বিনোদের বিয়ের জন্য আমি বড়

একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ও বাড়ীতে কি হয়েছে? বাড়ির লোকেরাই বা গেল কোথায়?"

দোকানী গম্ভীর হইয়া বলিল, "আর সে কথা কি বল্‌বো, বাবু! ঐ সেদিন পেলেগ হয়ে বাড়ীতে দুজন মারা গেল না! আহা, মেয়ে ত নয়, যেন সাক্ষাৎ রাধিকা ঠাকরুণ, একখানি থানপরা—তাতেই যেন রূপ ফেটে পড়চে—"

নীরদ আর দাঁড়াইল না।

বন্ধন কাটিয়া আসিতেছে! শিবানী নাই! পাষণ্ডের নিষ্ঠুর অত্যাচার বক্ষে লইয়া নীরবে জীবনের দুঃখভার বহন করিয়া সে সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে! ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মচ্ছেদী তৃষা আজ তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া নাই, অনাদৃত সেই প্রেমমাল্য, যাহা সে ছিঁড়িয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরভি-হার, আজ, যাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনদিন তাহা স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই, তাঁহারই বক্ষে লুণ্ঠিত। অনাদৃত ও অনাদৃতা উভয়কেই তিনি তাঁহার অমৃত বক্ষে তুলিয়া সাদরে স্থান দিয়াছেন!

নীরদ আজ মুক্ত! যে বন্ধনের ব্যথা, বন্ধন ছাড়াইয়া গিয়াও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ে নাই, আবার যে বন্ধনের মধ্যে আসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও ভাবনায় তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া যাইয়া তাহাকে পৌরুষহীন জড়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে প্রায় সক্ষম হইয়া আসিয়াছিল, সে আজ স্বয়ংই যখন তাহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া গিয়াছে, শুনিল, তখন নীরদ কই মনে করিতে পারিল না ত যে, সে আজ ভাগ্যবান, সে আজ মুক্ত! মুক্ত! ইহারই নাম মুক্তি? সে কি

ইহাই চাহিতেছিল ? না, না, না, কখনও তাহা নয়! একবারও এমন সম্ভাবনা সে মনে স্থান দেয় নাই। ইহা তাহার পক্ষে মুক্তি নহে, বন্ধন! চিরকালের জন্য লোহার শিকল দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন! যে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির দাহ সহ্য করিতে না পারিয়া, সে অস্থির হইয়া বেড়াইয়াছে, কোথাও শান্তি পায় নাই, তাই সব গর্ব্ব, অভিমান ও লজ্জাকে পদদলিত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা যে জীবনব্যাপী চতুর্গুণ দাহ লইয়া তাহাকে নিয়ত দগ্ধ করিতে থাকিবে। একটি দিনও যদি অবসর দিতে, শিবানী ?

অনাহারে ও অনিদ্রায় যেমনই সে আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া চলিল।

ত্বরিত হস্তে নীরদ এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে হিমকুহেলিকার ন্যায় সমস্ত নগরী তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল। বাষ্পযান প্রচুর ধূমোদ্গারণের সহিত উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। দুই পার্শ্বে গিরি, নদী, দেবালয়, গ্রাম ও সুবিস্তীর্ণ মাঠ, বায়স্কোপের বিচিত্র চিত্রের মত, একটার পর একটা দেখা দিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কত পুরাতনের স্মৃতি, কত নূতন অধ্যবসায়, কত সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সম্মিলিত রূপ, ইহাদের মধ্যে মিশ্রিত, কতদিনের কত কথাই ইহাদের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নীরদ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। চলন্ত গাড়ির সহিত দৃশ্য-সমুদয়ও ছুটিয়া চলিয়াছে। চঞ্চল চিত্তের ভিতরও সহস্র স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে উঠিতে পড়িতেছিল। তাহার জীবনের

গতিও এইরূপ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিল না কি? বেদনায় বুকের ভিতর টনটন করিয়া উঠিতেছিল, মাথার মধ্যে যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, হাত-পায়ের তলা শীতল ও বলহীন হইয়া আসিতেছিল। হায়, কোন দিনই কি সে শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? অভিশপ্ত, এমন করিয়াই কি আমরণ, বিমানমার্গে, কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত, লক্ষ্যহীন পথেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, নিজের কক্ষায় ফিরিতে পারিবে না?

এবারও সে আর একবার তাহার কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎকে সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তাহার আশা, উৎসাহ বা উন্নতির সহিত শিবানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, বরং তাহাদের নিকট হইতে মূর্খা শিবানীকে সে সন্তর্পণে দূরেই সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা, স্বদেশপ্রেম, কর্ম্মোদ্যম প্রভৃতি উচ্চ ভাব যে সে তাহার ভাত-রাঁধা ও তরকারী বানান-কুশল চিত্তে ধারণা করিতেও সক্ষম নহে, এইটাই তাহার আগাগোড়া বিশ্বাস থাকিলেও, ইদানীং সে সেই ভ্রমটা সংশোধন করিয়া তাহার স্থলে নূতন একটা অনুকূল ধারণাকে মনে স্থান দিয়াছিল। ভাবিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল, যাহাকে সে বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানকর্ম্মে তাহার অনুপযুক্তা বলিয়া অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া আসিয়াছিল, বস্তুত সে তাহা নহে। নম্রতামিশ্রিত তেজ ও মমতায় পরিপূর্ণ সেই কালো চোখের ছায়া, নিবিড় পক্ষ্মতলে বুদ্ধি ও জ্ঞানের একটা অনন্যসাধারণ জ্যোতি, কি সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে না? তার পর, হৃদয়ধর্ম্ম! সিদ্ধেশ্বরীর কন্যা হইলেও সে কত মহৎ! কিসে সে তাঁহার উচ্চ আদর্শের

সহিত মিশিতে পারিবে না? পরের গণ্ড মূর্খ ছেলে লইয়া সে আদর্শ মনুষ্য তৈয়ার করিতে বসিয়াছে, আর নিজের স্ত্রীকে মনের মত গড়িয়া লইতে পারিবে না? শিবানীর শেষ ব্যবহার মনে করিয়া সে নিজেকেই ধিক্কার দিল, কেন সে ঘৃণা করিবে না? যাহাকে জীবনের সকল সুখদুঃখের অংশভাগিনীরূপে, ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া, গ্রহণ করিলাম, সে জানিল না যে, যাহার সহিত তাহার আজীবনের লাভলোকসান দুঃখসুখের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, সে কে? কেন যে, রাত্রির পর রাত্রি তাহার প্রতীক্ষায় কাটিয়া যায়, কেনই বা সে অক্লান্ত সেবা ও প্রেম দিয়া কিছুই ফিরিয়া পায় না?

নীরদ কয়দিন ধরিয়া অনেক ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অবশেষে একটা চিত্রকে কল্পনায় তুলিতে বেশ ফলাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার তপোবনে, ঐ ক্ষুদ্র আশ্রমগৃহের মধ্যে, সে গৃহলক্ষ্মীর আসনে তপস্বিনীর প্রতিষ্ঠা করিবে। ক্ষৌমবসনা শঙ্খবলয়ধারিণী প্রশান্ত-বদনা নারী, তাহার পূত হস্তে আশ্রমখানিকে পবিত্রতম করিয়া তুলিয়াছে! আনন্দময়ী জননীরূপে শিশুবৃন্দকে স্নেহ, রুগ্নকে সেবা ও শিশুকে শুশ্রূষা দ্বারা সে তাহার কর্ম্মভার লঘু করিয়া নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছে, আবার নিয়মিত পূজা উপাসনা কালে তাহার পার্শ্বে বিরাজিতা রহিয়া তাহার শাস্ত্রালোচনা, তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া, বিশ্রামে, কর্ম্মে, ক্লান্তিতে, সুখে, দুঃখে এক হইয়া গিয়াছে! এমনই করিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর একখানি ছবিকে বড়ই সাবধানে অল্পে অল্পে হৃদয়ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দিকেই সে লোলুপ দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়াছিল। সেই কল্পনামূর্ত্তির সহিত এক শুভ্রবসনা, সৌম্য

মূর্ত্তি বিধবার গৌরব-পবিত্র মূর্ত্তির সম্মিলন করিতে গিয়া লজ্জা ও আত্মগ্লানির সহিত একটু কৌতুকও সে অনুভব করিতেছিল, এমন সময় আবার সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল।

নীরদের কল্পনা, তাহার আশা, শুধুই যেন মরু মরীচিকা বা আকাশকুসুমের কল্পনাতে পর্য্যবসিত হইবার জন্যই সৃষ্ট। আজীবন জ্বলাই যাহার পাওনা, তাহার দাহ থামিবে, কি করিয়া? শূন্য কামরায় জানালার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া নীরদ জ্বালাময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। হায়, সে যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে আসিত! সেই যখন আসিলই, তখন কেন এত বিলম্ব করিয়া ফেলিল?

হাট্‌রাস্ জংসনে আসিয়া গাড়ী থামিল। এইখানেই আরোহিগণের মেল ধরিবার কথা। কুলীর 'বাবু! বাবু!' ডাকে সজাগ হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে নামিয়া পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

অদূরে বিশ্রামস্থান। পঞ্জাব মেল আসিতে তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি! একটা কুলীর হাতে ব্যাগটা দিয়া নিশ্চলপ্রায় চরণকে টানিয়া লইয়া, সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। শরীরটাকে যেন সে আর বহিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিয়া পা টলিতেছিল। এমন সময়, "মিঃ রায়, না? হাঁা, এই যে, তুমি কোথা থেকে?" বলিয়া পিছন হইতে কে কাঁধে হাত দিল। গলাটা চেনাচেনা। নীরদ পিছন ফিরিয়া দেখিল, মাদুরার একটি পরিচিত বন্ধু, বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর তাহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহার স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা গেছলে? এখন যাচ্ছ, কোথায়?

নীরদ বলিল, "বৃন্দাবন থেকে আসচি, বোধ হয়, কল্‌কাতায় যাব।"

"বোধ হয়? ঠিক নেই, নাকি?"

নীরদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না কল্‌কাতাতেই যাব, তুমি কোথায়?"

"আমি যাচ্ছি, একটু ভ্রমণে। এই দিল্লী পর্য্যন্ত যাব। তারপর আর কি, ঘরের ছেলে ঘরে। তুমি দিল্লী গেছলে?"

নীরদ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, সে যায় নাই।

"বল কি, জগতের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষই দেখলে না, অ্যাঁ? না, না, তা কি হয়? চল, আমার সঙ্গেই চল, একটু ঘুরে আসবে। কটা দিন বা? তারপর আমি চন্দননগর, আর তুমি হাবড়া, ব্যস্। কি হে, কথা কওনা যে! যাচ্ছ ত তাহলে? তোমার চেহারাটা বড্ড শুখিয়ে গেছে, তা অসুখ বিসুখ হলে কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে, তা দেখ, হোমিওপ্যাথির বাক্স, রুবিণীর ক্যাম্ফর, কুইনিন্, তারপর দেখ, ডিসেন্ট্রি পিল্ সব আছে। পেটেণ্ট টেটেণ্ট কিছুই আমি কিনতে বাকী রাখিনি। আমার শরীরটা ভারি দুর্ব্বল কি না, তাই ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখলেই পড়ি। হ্যাঁ, তবে আমার রোগটার একটা ভারি সুলক্ষণ দেখতে পাই এই যে, যখন যে রোগের কথা পড়ি, আমার রোগের সব লক্ষণই প্রায় তার সঙ্গে মিলে যায়। এখন ডাক্তারের হুকুমে বেড়াতে বেরিয়েচি। হ্যাঁ, তাহলে তুমি দিল্লী যাচ্ছ, কেমন? চল, চল, একা মন লাগেনা।"

দুইটা দিন অন্ততঃ তাহার অন্তরের আঘাত সামলাইয়া লইবার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই নীরদ উত্তর করিল, "চল, তবে, কিন্তু ঐখান থেকেই ফিরব।"

বীরেশ্বর মহাস্ফূর্ত্তির সহিত তাহার হাতটায় একটু ঝাঁকানি দিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "ভয় নেই, তাই হবে।"

৪২

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ এবং কেল্লা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসকল খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা হইয়া গেলে, চারিদিনের দিন বীরেশ্বর নীরদকে মুক্তি দিয়া বলিল, "এবার ফেরা যেতে পারে, আর তোমায় ধরে রাখব না।"

শুনিয়া, নীরদ যতটা উচিত ছিল, সে পরিমাণে খুসী হইতে ত পারিলই না বরং একটু বিপন্ন বোধ করিল। অতীত গৌরবের সহস্র স্মৃতিজর্জ্জরিত সমাধিক্ষেত্রে কয়দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে চাহিতেছিল শান্তি! কিন্তু এখানে প্রতি প্রস্তরখণ্ডটির সহিত পুঞ্জীকৃত অবসাদ বিজড়িত রহিয়াছে। শ্রান্ত উপকূলপ্রয়াসী প্রাণ যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথায়! তথাপি যখন বীরেশ্বর বলিল, এখন ফিরতে পারো, তখন ছাঁৎ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, থাকাটাতে কিছু আকর্ষণ নাই সত্য, তথাপি ফিরিবার আগ্রহ আরও কম।

সন্ধ্যার সময় আকাশের বিচিত্র শোভা যমুনাবক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। কূলে কূলে পরিপূর্ণা নদী সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বক্ষমগ্ন গগনছবি আনন্দে নাচাইতেছিল, মৃদুমন্দ বাতাসে জল পুলককম্পিত ও মৃদু তরঙ্গিত। প্রকৃতি অলক্ষ্যে অন্তর ও বহির্জ্জগতে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছিলেন। নদীবক্ষে স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ধীবর সময়োচিত ভাষায় আপনাকে ধিক্কার দিতেছে। দিবস-অন্তে পরিশ্রমের পরিসমাপ্তির

মনোজ্ঞ স্ফুরণ। দূর সমাগত পরিশ্রান্ত তরঙ্গটি যেন তাহার বিরামের উপকূল খুঁজিতেছে। ধীবর গাহিতেছিল, দিন চলিয়া গিয়াছে, সম্মুখে গভীর রজনী সমাগতা, যাত্রীর দল চলিয়া গেল। এখনও ওরে মূঢ়, ওরে ভ্রান্ত, এখনও পশ্চাতে ফিরিয়া কাহার পানে চাহিতেছিস্? আর কেন, আর কেন? পিছনে না চাহিয়া সোজা নিজের পথে চলিয়া আয়, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আর না, যে গেছে, তার সঙ্গ লইবি যদি ত ছুটিয়া যা, যে পড়িয়া রহিল, তাহার জন্য, ওরে ভীরু! তাহার জন্য, দেরি কেন? প্রকৃতির মধ্যে শোভা আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে যেন প্রাণ নাই। সঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কার ও পুষ্পে সৌরভ-হীনতার মত সর্ব্বত্রই যেন একটা অপূর্ণতা অতৃপ্তি ভরিয়া রহিয়াছে।

নীরদ তাহাদের বাগানবাটির একতালার বারান্দায় অগণ্য জ্যোতিষ্কস্ফুরিত মহিমান্বিত মুক্ত চন্দ্রাতপতলে একা দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গ ত একদিনও তাহার প্রার্থিত ছিল না! হায়, সে যে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে ম্লান বিশুষ্ক হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে, সে যদি শুধু দুই দিন পূর্ব্বে আসিত! তবে এখন, আর কেন, তাহার অনুসরণে ছুটিয়া ফিরা? না, কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ছিল না, তাহা নাই বা থাকিল! লঘুচিত্ত মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত সে তাহার স্বহস্তরচিত কানন-পাদপছায়ায় নিঃসঙ্কোচে ফিরিয়া যাইবে, অলক্ষ্য উপহাস বিদ্যুৎস্ফুরিত হইয়া হৃদয়ের নিভৃত প্রান্ত হইতে আকর্ণ কপোল রঞ্জিত করিয়া তুলিবে না! জগতের একটি মাত্র প্রাণী ভিন্ন এত বড় একটা কাপুরুষতার

ইতিহাস জগৎ হইতে চিরবিস্মৃতির সমাধিগর্ভে লীন হইয়া যাইবে! এ কি মুক্তি দিলে, তুমি, শিবানী!

নীরদ ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের প্রতি চাহিয়া কাহার উদ্দেশ্যে যেন তাহার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই চিত্ত লঘুতর হইয়া ক্রমে শূন্য হইয়া আসিল। সে যে তাহাকে বিদায় দিল, তবে কাহাকে সেখানে স্থাপন করিবে? যাহা লইয়া আছে, যাহা তাহার আজন্মের উপার্জিত, তাহার চেয়ে কি অনাদৃত, একটা দুর্দ্দান্ত বালিকার স্মৃতি! এতদিন ত এ স্মৃতি তাহার নিকট কশাঘাতের মতই যন্ত্রণাকর ছিল। ইহাকে ত সে সভ্রূভঙ্গে দূরে ঠেলিয়াই ফেলিতে গিয়াছে, কখনও ত করুণা-কটাক্ষে কাছে টানিয়া লয় নাই। আর আজ যতই তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই যেন সে তাহার নিকট তাহার গোপন সৌন্দর্য্য রাশি ইন্দ্রজালের মত প্রকাশ করিয়া শত প্রলোভনে তাহাকে তাহারই পানে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। আজ সংযত শিক্ষার শত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রাণটা কাঁদিয়া বলিতেছে, "সে ভিন্ন সব বৃথা, সব শূন্য!" মনের ভিতর পুঞ্জীভূত অনুশোচনা তীক্ষ্ণ ছোরার মত বিঁধিয়া তিরস্কার করিতেছে—বৃথাই এতদিন নষ্ট করিলি, চিরদিনই নষ্ট করিলি! সে দেখিল, চিরদিনই সে নিজের সম্বন্ধে নিজেই অন্ধ, কোনদিনই আপনাকে চিনিল না।

অবজ্ঞায় যাহাকে একদিন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবারও অবসর ঘটে না, আবার একদিন যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থিততম হইয়া দাঁড়ায়, বৈচিত্র্যময় জগতে ইহা যে একটা

কি গূঢ় রহস্য, কি অখণ্ডনীয় প্রতিশোধ, তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু ইহাতে বাধা দিবার শক্তিও কাহারও থাকে না, এইটুকুই আশ্চর্য্য !

ইহাও কি সেই অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাময়ী প্রকৃতিরই লীলান্তর মাত্র, না, ইহাও সেই সর্ব্বনিয়ন্তা চৈতন্যপুরুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ফল, যিনি জড় অচেতন প্রকৃতির অঙ্গে চৌম্বকাকর্ষণের ন্যায় চেতনার সঞ্চার দ্বারা তাঁহাকে সকল প্রকারে অসম্ভব সম্ভবের শক্তি প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন? নহিলে কল্যাণময়ী জননী এমন করিয়া প্রতিশোধ-গৃহিত্রী বিমাতায় পরিণত হইয়া যান, কেমন করিয়া !

এই পুণ্যভূমে, এই ভারতভূমে কোন্ আদর্শ প্রদর্শিত হয় নাই? দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগকারিণী পত্নী সতীর দেহ দেবাদিদেব স্কন্ধে বহন করিয়া উন্মাদের মত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন, জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই ! হা সতী, হা সতী বলিয়া ত্রিনেত্রে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বজ্ঞানী আজ শক্তিহীনতায় সর্ব্বজ্ঞান হীন ! কি পবিত্র মহান্ দৃশ্য এ ! শিবানী গিয়াছে? না, কোথায় গিয়াছে, সে? সে আছে, সে আছে, নিকটে না হউক, দূরে আছে— না দূরেই ছিল, আজ সে নিকটে অন্তরের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেন্দ্রাণীর মহিমায় সেই সংযত-বাক্ দীনা বালিকা তাহার নিজের অ . কারমধ্যে সগর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ আর তাহার সেই কৃষ্ণ তারকোজ্জ্বল বিশাল চক্ষে ভিক্ষার নীরব আবেদন নাই। মৌন অধরপ্রান্তে নিবিড় ছায়া ফেলিয়া অভিমানের হতাশা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই, নিজের পরিপূর্ণ গৌরবে সে পত্নীর আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। তাহার

ভাবনায় পড়েছি ; ঘটক ব্যাটারাও জ্বালাচ্চে, একটী সুন্দরী মেয়ে পেলে শীঘ্রই বিয়ে দিয়ে ফেলি। আমার তো জানেন, ঘরদ্বার সব শূন্য—বৌমা না হলে আর মানায় না। লক্ষ্মীহীন সংসার যেন শ্মশান হয়ে রয়েছে।"

রজনীনাথ একটু হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে! এখন কেন? এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিনোদের মত ছেলে হতে অনেক উন্নতির আশা আছে। অসময়ে বিয়ে দিলে সমস্তই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।"

"না, হে, না, তোমরা নব্যতন্ত্রের লোক, তোমরা এখন সাহেবদের মত বুড় করে ছেলেমেয়ের বে দেওয়া ভালবাসো ; সেটা অনিষ্টকারক। আমাদের সেই সাবেক চালই ভাল। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বার বৎসর, আর বিনোদের গর্ভধারিণী সাত বৎসরের। আমি তবে নিতান্ত বালিকা পছন্দ করিনা, দশ এগারো বৎসরের একটী ভদ্র ঘরের মেয়ে চাই। কিন্তু মেয়েটী খুব সুন্দরী হওয়া দরকার"—বলিয়া ক্রোড়স্থা শান্তিকে চুম্বন করিলেন, "এই এমনি বউটা আমি চাই, পাবোনা? আহা বুড়ি যদি দু বৎসর আগে আসতিস্?"

রজনীনাথ ঈষৎ স্নেহগর্ব্বে কন্যার দিকে একবার নেত্রপাত করিয়া মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "কেন পাবেন না? আচ্ছা, আমি দেখবো, জগৎপুরের ভাদুড়ীরা আমার মক্কেল, তাদের বাড়ি একটী মেয়ে আমি একবার দেখেছিলাম, সেটি আমার শান্তির চেয়েও সুন্দরী।"

"এর চেয়ে সুন্দরী কি আছে, রজনীবাবু?"

বিনোদ পিতার এই অসময়োপযোগী প্রস্তাবে মনে মনে একটু

কোথাও যেন এতটুকু অসম্পূর্ণতা নাই! নীরদের সর্ব্ব শরীর পুলকে বিস্ময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল। মুদিত নেত্রে, স্তম্ভিত বক্ষে, স্বপ্নাভিভূতের মত, সে বলিল, "এস তুমি, সতী, পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী!"

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিবার সময় নীরদ বলিল, "এস বেনারসের টিকিট কিনি।"

বীরেশ্বর ঈষৎ বিস্মিত হইল। "হঠাৎ?" "ইচ্ছা হল" বলিয়াই নীরদ মুখ নীচু করিয়া রহিল। বীরেশ্বর কহিল, "কখন তোমার যে কি খেয়াল! প্রথমে ত দিল্লী যেতেই নারাজ। এখন আবার ফিরতেই চাও না, তা যা হোক যাবে ত, চল, আমার কোন আপত্তি নেই। অগস্তকুণ্ড ১০০।১২ নম্বরে আমার মাসিমা আছেন, সেখানে বেশ সুখেই দুদিন থাকা যেতে পারবে, তাছাড়া যাচ্ছি ত, কটা দিন থেকে কংগ্রেসটাও দেখে আসা যাবে। তোমার বোধ হয় এতে খুব সহানুভূতি আছে, এই বয়কটটার সঙ্গে? না?"

"সমস্ত ভারতবাসীরই থাকা উচিত। যার নেই—"

"সে মানুষ নয়, এই না?"

"ঠিক।"

বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "আমরা তাহ'লে পশু।"

"যা বল। তোমার ছুটী কদ্দিনের?"

নীরদ কথা উল্টাইতেছে দেখিয়া বীরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "বোধ হয়, চিরদিনেরই। আমার আর পোষাচ্ছে না সেখানে, কলকাতায় ফিরে যদি কোথাও একটু সুবিধা করতে পারি ত ...র নাবালকের মোসাহেবী করতে যাচ্চিনে।"

টিকিট বেঁনারসেরই কেনা হইল। প্ল্যাটফর্ম্মে লোক বেশী ছিল না। দুইজনে বেঞ্চে আসিয়া বসিলে, নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কত পাচ্ছ?"

বীরেশ্বর শালখানা ভাল করিয়া গায় টানিয়া দিয়া কাশীর একটা পিল পকেট হইতে বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া বলিল, "তা মন্দ দেয় না, দেড়শো টাকা মাইনে, তাছাড়া বাড়ী—"

"তবে হঠাৎ ছাড়বে যে?"

"কি করি বল না। ও রকম হস্তিমূর্খ ছেলেকে পড়ানোর চেয়ে সপরিবারে না খেয়ে মরা'ও ভাল। তার উপর কিছু বলবার যো নেই। একদিন রাজকুমারকে একটু ধমক দিয়েছিলুম, অমনি দুদিক থেকে দু বেটা মোসাহেব ছুটে এসে তার মাথায় খানিক ফুলেল তেল থাবড়ে হাওয়া করতে আরম্ভ করলে। জিজ্ঞাসা করলুম, তা বল্লে কি না আপনার ধমক খেয়ে বাবুয়াজী মূর্চ্ছা যাবে যে, তাই মাথা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। শুনে ত আমি অবাক। আবার তাতেই শেষ হল না! বিকেল বেলা গিয়ে শুনলুম, আমার ধমকে বাবুয়াজীর জিউ ঘাবড়ে গেছে, আজ রাণীজী তাকে পড়তে আসতে দিতে পার্ব্বেন না। এই ত ব্যাপার, তুমিই বল না, এমন চাকরী কি পোষায়?"

ঘণ্টা পড়িল ও গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে নিকটবর্ত্তী হইল। নীরদ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমার স্কুলে কিন্তু পারিশ্রমিক কম! কি করে তাতে পোষাবে?"

বীরেশ্বর যেন বর্ত্তাইয়া গেল। "আঃ, তাহলে ত ভাল হয়, তুমি ত পঞ্চাশ টাকা দাও বলছিলে, তাতেই কোন রকমে চলে যাবে-এখন। গিন্নিও সম্প্রতি তাঁর পৈতৃক ধন কিছু পেয়েছেন,

বলচেন, ব্যবসা করতে, তা তোমার সঙ্গে থাকি ত বিলাতী জিনিষ আর ব্যবহার করব না, তা বলে রাখচি। আর গায়ত্রী সন্ধ্যে টন্ধে ক্রমে ক্রমে শিখবো এখন।”

নীরদ আবেগের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

৪৩

বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। এখনও আকাশ মেঘে ভরা। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টিরও যেন কয়দিন ধরিয়া বিরাম নাই। এক পা কাদা মাখিয়া ছাতা বা তালপাতার-টোকা মাথায় দিয়া পথিকেরা পথ চলিতেছিল। রাস্তার ওপারে মুদির দোকানে বিলাতী কম্বল গায় বুড়া দোকানী কারিকরকে বেগুনির জন্য তেওড়ার দাল ফেনাইতে উপদেশ দিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে থেলো হুঁকায় কলাপাতার নলে টান দিতে দিতে খাঁচার পোষা ময়নাটিকে সীতারাম বুলি শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। শীতে ও বাদলায় পক্ষীশিশু একেবারে অস্ফুটবাক হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গলিপথ,—দুই একখানা গোরুর গাড়ি কেরোসিনের টিন বোঝাই লইয়া বলাইচন্দ্র শীলের আড়তের দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছুক মন্থর গমনে চলিয়াছে। তাহাদেরই চক্রমথিত কর্দ্দমে পার্শ্বের ইষ্টক প্রাচীরগুলা চিত্র-বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অপ্রশস্ত পথের ধারে ক্ষুদ্র একখানা বাড়ীর মধ্যে রাস্তার ধারের একটি একতল ক্ষুদ্র গৃহের খোলা জানালার নিকট বসিয়া এক রমণী সেলাই করিতেছিল। ঘরখানি ক্ষুদ্র, ঘরের আসবাব পত্রও সামান্য, দেখিলে দরিদ্রের গৃহ বলিয়া মনে হয়।

রমণী কোলের উপর সেলাইটা রাখিয়া কিছুক্ষণ কার্য্য

করিতেছে, আবার অল্পপরেই যেন ক্লান্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, মধ্যে মধ্যে জানালার কপাটে পিঠ রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া লইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মত শীত রাত্রির কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন পাণ্ডু চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণা এই অপরিচিতা নারীই যে শান্তি, তাহা তাহাকে দেখিলে সহসা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। সুবিধা এইটুকু যে, এখানে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন একটি পরিচিত লোকের সহিতও শান্তির সাক্ষাৎ হয় না। তাহার স্বামী, সেই যে তাহাকে তাহার সকল আশ্রয়, সকল আনন্দ, সকল গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্বামিত্বের সমস্ত দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছে, সেই পর্য্যন্তই এই নিরানন্দ নির্ব্বাসনে সে বন্দিনী। সেই পর্য্যন্তই জগতের সমস্ত আশা আনন্দের আলোক যেন তাহার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির ম্লান আভা-টুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে নিঃশেষে মিলাইয়া আসিবার পূর্ব্বক্ষণে যেমন বিষণ্ণ কাতরতার সহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া ধরণীর পানে চাহিয়া দেখে, অতীত দিনের সুখস্মৃতির পানে শান্তির বর্ত্তমান জীবনও তেমনই অবসানোন্মুখ ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পথ দিয়া দিনের মধ্যে একটিবার করিয়া লাল-পাগড়ী মাথায় ডাকের পিয়ন স্কন্ধবিলম্বিত চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া 'চিঠি আছে' হাঁক দিয়া দুই একটা দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় এবং চিঠি বিলি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দূর হইতে যতই সে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, শান্তির আশা উদ্বেলিত বক্ষ ততই যেন স্থির হইয়া আসে। অবশেষে সে যখন তাহার

দ্বার অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থ আম বাগানের জুরী পথ ধরিয়া দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ীর অভিমুখে চলিয়া যায়, তখন তাহার অশ্রু-রাশি বন্ধনমুক্ত জলস্রোতের মতই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।

সেদিন সে রাস্তায় আর লাল পাগড়ী দেখা গেল না। শীতের বাতাসে গায় কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, আলস্যে সমস্ত শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি লৌহাকৃষ্ট চুম্বকের ন্যায় সেই লাল পাগড়ীধারী চামড়াব্যাগস্কন্ধ পিয়নের আকর্ষণে জানালা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছিল না। ক্লান্ত মস্তক জানালার কবাটের উপর রক্ষা করিয়া অদূরস্থ বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীরের দিকে সে তাকাইয়া ছিল।

সেও একদিন অমনই বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিত। এই রকমই আমগাছের ছায়ার মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকার সান-বাঁধান ঘাট পাখীদের মধুর সঙ্গীতে ও পুরবাসিনী নারীগণের হাস্য-কলরবে মুখরিত থাকত। যখন অদূরস্থ কোন দেবালয়ে সন্ধ্যারাত্রির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন তাহার মনের মধ্যে আরও উদ্দাম ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। দুই চোখের জলধারায় অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে সেই এক পরিচিত মন্দিরের পরিচিত মূর্ত্তিগুলি মনে পড়িয়া যায়। হয় ত এতক্ষণে সেখানেও এমন করিয়া কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতির প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকিত মন্দিরের মৃদু সৌরভরাশির মধ্যে দেবপ্রতিমার সমস্ত দৃশ্যটা মনের ভিতর একখানা ছবির মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সবই তেমন আছে, শুধু সে নাই! শ্যামাকান্ত সেই যে নববধূর হরিদ্রাবর্ণের সূতা বাঁধা হাতখানি ধরিয়া আনিয়া সর্ব্বপ্রথম দিনেই শ্যামসুন্দরের

কাছে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "হরি! আমার মা তোমায় স্থাপন করে গেছলেন, এই দেখ, আবার তিনি তোমার কাছে এসেছেন।" শ্যামার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখছিস, মা পাষাণি! এই দেখ্, মাতৃহীন আবার মা পেয়েছে। তুই ত ভাল করে আদর করলিনে, শুধুই কাঁদালি—তাই আবার নিজের মাকে খুঁজে আনলুম।" তাহার অধিকৃত স্থানটি আজ কেবল শূন্য, আর সবই তেমন আছে। পাষাণ-প্রতিমা তেমনি হাস্যাধরা, মন্দির কক্ষের শুদ্ধ বায়ু তেমনই সুরভিস্নাত, সাধক পুরোহিত ও দর্শকগণ তেমনই ভক্তি-বিহ্বল। এইরূপে দিনে নিশীথে, তাহার শ্বশুর ও বাপের বাড়ীর কত কথা, কত আদর অবিরাম মনে জাগিয়া উঠে। আর সব চেয়ে বেশি করিয়া মনে পড়ে, তাহার পিতার কথা। কি স্নেহময়, পুণ্য-চরিত্র পিতার প্রাণে সে আঘাত দিয়া আসিয়াছে! তাহা ভাবিলেও তাহার সর্ব্ব শরীরের রক্ত এককালে হিম হইয়া আসে। হায়, এ ভুল কি এ জন্মে আর ভাঙ্গিবে না? দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অসম্বরণীয় আবেগে সে কাঁদিয়া ফেলে।

সহসা রাস্তায় গমনশীল পথিকজনের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া উঠিল, "আঃ, পিছল দেখ! এখানের মিউনিসিপালিটী কি ঘুমুচ্চে? রাস্তা ঘাটের এমন অবস্থা!"

এ পরিচিত স্বর! শান্তি চমকিয়া মুখ তুলিল। পথিক যুবকের প্রতি চোখ পড়িতেই সে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল, "মিষ্টার রায়!" পথিকও শব্দানুসরণ করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বপ্নজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "রজনীবাবুর মেয়ে না?" অনেক দিন পরে শান্তির পাণ্ডু মুখখানা একটু লাল

হইয়া উঠিল, ঈষৎ ম্লানহাসি হাসিয়া সে বলিল, "চিনতে পারচেন না, নীরদবাবু ?"

"না পারলে কি কথা কইতে সাহস কর্ত্তেম ? কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ, শান্তি ! কাদের বাড়ি এ ?"

শান্তি উত্তর দিল না, তাহার সব শক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছিল ! তাহার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া নীরদকুমার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি বাড়ীর মধ্যে যেতে পারি ? কেউ আপত্তি কর্ব্বেন না ত ?"

শান্তি উঠিয়া কম্পিত স্বরে "আসুন না" বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দুইএক কথার পর নীরদ মোটের উপর ব্যাপারটা এক রকম বুঝিয়া লইল। যে কারণেই হউক, হেমেন্দ্র তাহার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া শান্তিকে তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে। এই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আবাসই যে এখন শান্তির গৃহ, তাহা বুঝিতে নীরদের বিলম্ব হইল না। সহসা ঈষৎ তীব্রভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "এমন নিকৃষ্ট লোকের হাতে তুমি পড়েছ শান্তি, কি ভয়ানক !" বলিতে বলিতে শান্তির অপ্রতিভ ভাবে লজ্জা পাইয়া হঠাৎ থামিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া মনে মনে নিজেকে সে তিরস্কার করিল, "সংসারে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহাও শিখিলাম না।"

নীরদ অত্যন্ত আহতভাবে কাতর চিত্তে কহিল, "আমায় কিছু লুকিও না, সব কথা খুলে বল। মনে কর, আমি তোমার বড় ভাই, তোমার দাদা আমি, তেমনই বিশ্বাস করে আমায় সব বল। কেন, তোমরা লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এলে ? আর এলে

যদি, তবে এ অবস্থায় কেন? রজনীবাবুর মেয়ে তুমি, তুমি আজ এই অবস্থায়? উঃ, কি রকম চেহারা হয়ে গেছে তোমার! এ সবের মানে কি?”

এই সুগভীর মর্ম্মস্পর্শী স্নেহসম্ভাষণে শান্তির এতদিনকার অনাদৃত বেদনারাশি আবেগ তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতেছিল,—সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। কতদিন সে এমন স্নেহের ভাষা শুনে নাই! মাতুবার সেই বিদায়-দুঃখের পর আজ এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মহৎ বন্ধন-স্থাপন! এত কষ্টের মধ্যেও ইহা যেন তাহাকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দতা দান করিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল, “সেখানে দিদি এসেছেন, তাই আমরা থাকতে পারিনি, চলে এসেছি।” বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নীরদ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি? দিদি কে?”

শান্তি অন্যদিকে ফিরিয়াই উত্তর দিল, “আপনি বুঝি জানেন না,—আমার জা! তিনি বৃন্দাবনে তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে থাকতেন, আমরা গিয়ে তাঁকে এনেছি।”

আকস্মিক বজ্রপাতে স্তম্ভিত পথিকের মত, স্তব্ধ দৃষ্টি বহুক্ষণ পরে ফিরাইয়া নীরদ গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, “কে এসেছে? বিনোদের স্ত্রী! সে বেঁচে আছে? সত্যি কথা?”

তাঁহার ভাব দেখিয়া শান্তি বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল, “আছেন বই কি। তাঁর নাম, শিবানী, তাঁর ছেলেটি কি রকম যে সুন্দর, আর এমন শান্ত—”

নীরদ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, “বুঝেছি শান্তি, শিবানীর নাম নিয়ে কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তোমাদের বিষয় অধিকার করতে এসেছে। সে ত বেঁচে নেই, সে স্বর্গে। তাই হেম সহ

করতে পারেনি, রাগ করে চলে এসেছে! আচ্ছা, আমি তার ষড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করে দিচ্ছি, দাঁড়াও—"

লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া শান্তি আর্ত্তভাবে কহিল, "ওকথা বলবেন না, আপনি অমন কথা বলবেন না! ঐ এক জন ভিন্ন কেউ এ কথা বলেনি। তিনি সতী, লক্ষ্মী, পুণ্যবতী, আজন্ম দুঃখ পাচ্ছেন, তার উপর এ রকম অপবাদ দেওয়া মহা অধর্ম্ম! নিজে ত তিনি আসেনও নি, আর তাঁর স্বামীর পরিচয়ও তিনি এতদিন জানতেন না। জ্যেঠামশায়ই প্রথমে আমার ভাসুরের সঙ্গে অমুর মিল দেখে কাঁদতে লাগলেন, তার পর তাঁর কাছে জ্যেঠাইমার একখানি ছবি ও আংটি ছিল, তাই থেকে বোঝা গেল, কে তাঁরা! সবাই বলে,—অমু ঠিক তার বাপের মত দেখতে হয়েছে।"

শান্তির কথাগুলি নীরদ স্থির হইয়া শুনিল। সত্যই এমন কিছু ত সে শুনে নাই, যাহাতে সে মনে করিতে পারে,—নিশ্চয়ই শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক! সে তাহার সন্তানের মাতাকে এতদিন ঘৃণা ও তাচ্ছল্যভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে নিজের মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া আবার একজনকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল! শান্তি যখন তাহাকে তাহার দিদির স্বামী বলিয়া জানিতে পারিবে!

গভীর লজ্জায় আরক্ত হইয়া নীরদ মাথা হেঁট করিল। অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া হৃদয়ের আকুলতাটুকু দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে শান্তভাবে কহিল, "হেম কোথায়?"

ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি উত্তর দিল, "কি জানি?"

"কখন আসা সম্ভব ?"

"আজও আসতে পারেন, দুদিন দেরিও হতে পারে।"

নীরদ বিস্মিত হইয়া কহিল, "এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে তোমায় একলা ফেলে সে বাড়ীতেও থাকে না, না কি ?" বিরক্তিতে তাহার চিত্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। "তোমার বাবার সঙ্গে বোধ হয়, সে ঝগড়া করেচে ? নিশ্চয়ই তাই, না ?"

অশ্রুজলে শান্তির দৃষ্টি লোপ পাইয়া আসিতেছিল। সে উত্তর দিল না।

বিরক্ত, বিস্মিত, অনুতপ্ত নীরদ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিদ্যুৎ হানিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া আসিতেছে। নীরদ বিপন্নের মত কিছুক্ষণ জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আবার শান্তির পানে চাহিয়া দেখিল, নিঃশব্দে উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। সেই অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। সেই শান্তি! সুন্দর, চঞ্চল, আনন্দময় সংসার-সুখোদ্যানের সেই ফুটন্ত সুবাসিত ফুলটি দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্যটুকুরই মত পবিত্র! সংসার সমরক্ষেত্রের এই নিষ্ঠুর আঘাত হইতে সে-ও রক্ষা পাইল না! কি বিচিত্র, এই জগতের গতি!

সহসা নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা বাবা ত ভাল আছেন, শান্তি ? তাঁদের কাছে গেলেও ত হ'ত ? তাঁরা কেন তোমায় এখানে থাকতে দিয়েছেন ?"

আবার দমিত অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহিল, জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া শান্তি মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বালিকার প্রতি তাহার অত্যধিক আকর্ষণ বশতঃ ঈষৎ কৌতূহলের সহিত গোপন কটাক্ষে একবার সে তাহার দিকে চাহিল। বালিকা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার চেন ধরিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছিল; গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের মধ্যে প্রফুল্ল সুন্দর মুখটী সবুজ পাতাব মাঝখানে গোলাপের মত যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদের মনে কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হইল।

পথে পিতা-পুত্রে বেশী কথা হইল না। গাড়িতে উঠিয়া পিতা এমন স্নেহের সহিত তাহার হাত দুইখানা আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া সাগ্রহ নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিলেন, যে বিনোদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত হৃদয়বেদনা এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়া উঠিল। তাহার চোখে জল আসিল। এই পিতা, এই স্নেহময় পুত্রবৎসল জনক, ইঁহারই স্নেহের প্রতি সে কতবার না সন্দেহ করিয়া আসিয়াছে! কি সে ভ্রান্ত! কি মূঢ়! পিতৃস্নেহের অবাধ রাজ্যে কোথাও সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টানিয়া তাহার, স্বাধীন অধিকারকে খর্ব্ব করা হয় নাই ত। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নীরবে সে ক্ষুদ্র শিশুটির মত পিতার জানুর উপর মাথা রাখিল।

এবার গৃহে আসিয়াও শ্যামাকান্ত প্রথম দুইচারিদিন নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন।

কোন প্রকারে বিলাত যাওয়ার কথা ভুলাইয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি পুত্রকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন, কিন্তু খুব বেশি দিন নিজেকে এরূপ অসহায়ভাবে একটি বালকের ক্রীড়া পুতুলে পরিণত করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছিল!

নীরদ উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল, মহৎপ্রকৃতি রজনীনাথের সহিত লঘুপ্রকৃতি জামাতা হেমের বনিবনাও না হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। শান্তিকে ভালবাসিয়া না হউক তাঁহাদিগকে দুঃখ দিবার মানসে সে হয়ত তাহাকে আটক রাখিয়াছে। ভালবাসিলে, তাহার মনে কখনই সে এত কষ্ট দিতে পারিত না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা ও আত্মগ্লানি মিশ্রিত করুণ চক্ষে নীরদ চাহিয়া রহিল। ধরিতে গেলে, সে-ই শান্তির সকল কষ্টের মূল!

শীতের অপরাহ্ন মেঘাড়ম্বরে বর্ষা-রজনীর ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আসন্ন বর্ষণের একটা বিপুল আয়োজন হইয়া উঠিতেছে। দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরদের হঠাৎ স্মরণ হইল, তাহাকে যাইতে হইবে, এখানে পুরুষহীন গৃহে সে একজন বাহিরের লোকমাত্র। অথচ শান্তিকে এই দুর্য্যোগের রাত্রে একা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও ত তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় না! ভাবিয়া চিন্তিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "হেম যদি না আসে, রাত্রে কি একাই থাকবে? চাকররা বিশ্বাসী ত?"

শান্তির ম্লান অধরে বিষাদের এক ফোঁটা অতি সূক্ষ্ম হাসি ফুটিতে ফুটিতে বিদ্যুতের ক্ষণ রেখাপাতের ন্যায় চারিদিকের পুঞ্জীকৃত অন্ধকাররাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল। "চাকর ত নেই, একজন ঝি আছে, সেই থাকে, সে খুব ভাল।"

নীরদ চমকিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল, "আমি তোমায় এ অবস্থায় এই বনের মধ্যে ফেলে ত চলে যেতে পারি না,—না হয়—"

তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তাড়িতাহতের মত চমকিয়া শান্তি তাহার আর্ত্ত দৃষ্টি মেলিয়া ঈষৎ উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিল, "না না, আমায় কোন সাহায্য কর্ত্তে হবে না। আমি ত কত দিনই এই রকম থাকি।" পাছে হেমেন্দ্র আসিয়া আবার কোন একটা বিরুদ্ধ ভাব ইঁহার সম্বন্ধে মনে আনে, সেইজন্যই হঠাৎ শান্তি এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নীরদ তাহার ভিতরের অর্থটা না বুঝিয়া উল্টাই বুঝিল। পূর্ব্বেকার লজ্জাস্কর অভিনয়গুলা চকিতের মধ্যে বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রের মত মনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার কর্ণমূল অবধি রাঙ্গা করিয়া তুলিল। ধিক্কারের সহিত সে নীরব হইয়া রহিল। এখন যে সে সকল দুরাশাস্বপ্ন মনের কোণেও জাগিয়া নাই। যৌবনের সে সব উদ্দাম চপলতা তাহার উৎপত্তিস্থলের মধ্যেই নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে, সে কথা কেমন করিয়া সে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে? একবার তাহার ইচ্ছা হইল, বলিয়া উঠে,—আমি তোমায় রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃই অধিকারী। সেই আত্মীয়তার সম্পর্কেও আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না। কিন্তু সে কথাটা বলা এখন যেন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিদি শান্তির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সামগ্রী, সেই দিদিরই স্বামী সে! অমু তাহারই অংশ, তাহারই হৃদয়-শোণিতের বিন্দু—তথাপি এ কথা কেমন করিয়া ঘৃণা লজ্জার মাথা খাইয়া সে স্বমুখে ব্যক্ত করিবে! দর্পহারী, এ কি প্রায়শ্চিত্ত!

তারপর আবার একটা বাধার কথাও মনে আসিল। হিন্দুর ঘরে তাহাদের সম্পর্কটাও এমন জটিল যে, তাহার

আত্ম-প্রকাশে এ অবস্থায় বড় একটা সুবিধা না ঘটিবারই সম্ভাবনা। অনিচ্ছার সহিত সে বিদায় চাহিল। শান্তি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর একবার আসবেন, কি ?"

নীরদ আগ্রহের সহিত উত্তর দিল, "নিশ্চয়, কাল সকালেই আমি আসবো।"

নীরদ চলিয়া গেল। শুষ্ক অশ্রুহীন নেত্রে শান্তি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ান্ধকারের মধ্যে গলির বাঁকের মুখে নীরদের সুদীর্ঘ আকৃতি মিলাইয়া গেল, তখনও সে পলকহীন নেত্রদ্বয় সেইদিকেই স্থির রাখিয়া গঠিত মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে যখন মেঘভরা আকাশ হইতে বজ্রপাতের সাড়া আসিয়া ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘরখানাকে শুদ্ধ কাঁপাইয়া তুলিল এবং ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন সে সেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বহুদুর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বিছানার উপর দেহভার লুটাইয়া দিল।

৪৪

পরদিন প্রভাতে মাথার যন্ত্রণায় শয্যাত্যাগ করিতে না পারিয়া শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "চন্দর, আজ কি রোদ উঠেছে ? তবে জানালাটা খুলে দাও না, আমার প্রাণটা যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে।"

কয়দিন হইতেই শান্তির অসুখ চলিতেছে—গত রাত্রি হইতে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। শরীর অসুস্থ হইলেও, এখানে

আসিয়া শরীরের প্রতি তাহার যত্ন একেবারেই নাই। কাজেই রোগ দিনে দিনে দুষ্ট কীটের মত জীবনী-শক্তির আধার-স্থল কর্ত্তন করিয়া পুষ্ট হইতেছিল। দাসী জানালা খুলিয়া দিলে, খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দ্বারে জুতার শব্দ শুনা গেল ও পরমুহূর্ত্তে হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল। শান্তির উৎসুক নেত্র মুহূর্ত্তে নিরাশায় ম্লান হইয়া আসিল। সে অবসন্নভাবে বালিসের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হেমেন্দ্র তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিল না,—সে আজ দীর্ঘদিন পরে অনেকটা প্রফুল্ল। ছাতা ও শালখানা একটা বাক্সের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্তভাবে সে বিছানার উপর বসিয়া পকেট হইতে একখানা রসিদ বাহির করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিল, প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "আঃ, এতদিন পরে কতকটা সুবিধা হয়ে এসেছে,—এইখানা ভাল করে রেখে দাও দেখি ?"

শান্তি বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল, কাগজখানা লইতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হেম তখন আপনা হইতেই বলিল, "তোমার গহনাগুলো লক্ষ্মীপুর থেকে যোগেশ আদায় করে এনে একজন ব্যারিষ্টারের কাছে বন্দক রাখিয়ে দিলে। টাকাগুলো তাঁর কাছেই জমা রইল, তিনি ত খুব উৎসাহ দিচ্চেন। তিনি নিজে সব ভার নিচ্চেন, বলচেন, কোন ভাবনা নেই! এইবার একবার তবে অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখাই যাক্,—আর ত চলে না, নৈলে। চারিদিকে ধার, কেবল নেই, নেই! বাসন্তী থিয়েটারে কাল যমুনা প্লে হল, তাতে কুমার উৎপলাদিত্য সেজে কি নামটাই আমার বেরিয়ে গেছে! ম্যানেজার ত যোড়-হাত, মাইনে দিতে চায়, দেড়শো টাকা, হপ্তায় একবার করে অভিনয় কর্ব্বার

জন্য। কিন্তু এখন দিনকতক সব ছাড়তে হ'ল, ভাল করে এইবার অদৃষ্টকে বোঝা যাক্।"

শান্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবু ঘরে ঢুকিতেই চন্দর ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরে যোগেশের সহিত তাহার কোন্দলের একটা উচ্চ সুর শুনা যাইতেছিল! সহসা সে তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর পানে ফিরাইয়া প্রদীপ্ত নেত্র তাহার মুখে স্থির রাখিয়া উচ্চ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভাগ্য পরীক্ষা! ভাগ্য পরীক্ষা বলোনা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বল,—বিদ্রোহ বল"—উত্তেজনায় তাহার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে ছিল, "বেশী দিন নয়, আর দুচারটে দিন অপেক্ষা কর, আমায় মরতে দাও, তারপর তোমার যা খুসী করো, কে বারণ করবে? শুধু এই সামান্য দিনকটা ধৈর্য্য রাখো, ভিক্ষা চাইচি, দয়া চাইচি, কিছুই কি পেতে পারি না? কখনও ত কিছু পাইনি, শেষ ভিক্ষা, শেষ—"

হেমেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আকস্মিক একটা ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, "শান্তি! শান্তি, তুমি পাগল হলে নাকি? একি করচ? থামো—"

আলুথালুভাবে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চিরসহিষ্ণু শান্তি সবেগে মাথা নাড়িয়া তেমনই তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আর আমি থামতে পারি না। কত আর থামব, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, একটুখানি তুমিই থামো—আমায় মরতে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যা তোমার সাধ, তাই করো, কেউ বাধা দেবে না। মাগো।" বলিয়া সহসা সে আবার বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। শক্তির অতিরিক্ত ব্যয়ে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল।

নির্ব্বাক হেম তাহার নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরের দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "শান্তি, শান্তি!" গায় হাত দিয়া দেখিল, দেহ নিশ্চল, তখন ভয়ে বিস্ময়ে তাহার হাত পা যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল, "যোগেশ!"

যোগেশ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধোত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি পাজী, তোমার ঐ ঝি মাগীটা! আমায় বলে কি না, তুমিই ত বাবুর শনি হয়েচ,—এ কি, হেমবাবু?"

হেম মাটিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদের সুরে কহিয়া উঠিল, "দেখ, যোগেশ, আমি ওকে খুন করেচি!"

"এ্যাঁ! সে কি!" তড়িতাহতের মত যোগেশ তীব্রভাবে হেমের দিকে ফিরিতেছিল, কিন্তু সেই সময়ই শান্তিকে একটু নড়িতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কাছে আসিল, "না, না, মূর্চ্ছা হয়েচে! একটু জল আন, দেখি। এখনই সেরে যাবে, কপালটা ভয়ানক গরম! আমি একজন ডাক্তারকে বরং ডেকে আনি, তুমি কাছে থাক।"

হেম সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "না, যোগেশ, আমিই তার চেয়ে ডাক্তারের জন্য যাচ্চি। তুমি এখানে থাক।"

যোগেশ বলিল, "আচ্ছা, তাই যাও" মনে মনে ভাবিল, ভীরু! সব তাতেই তোমার সমান ভয়! এদিকে আবার যোগেশকে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা কইতে দেখলেও সয় না! শান্তির পরিণাম তাহাকেও যেন অলক্ষ্যে অনুতাপের কষাঘাতে ক্লিষ্ট করিতেছিল। সেই ত হেমের মন্ত্রণাদাতা! সেওত কম পাপী নয়! আহা,

দুইজনে মিলিয়া কি তবে সত্য সত্যই বেচারাকে হত্যা করিয়া ফেলিল না কি? এতটা হইবে, কে জানিত!

হেমেন্দ্রকে অধিক দূর যাইতে হইল না। গলির মধ্যেই পরিচিত প্রসন্নবাবু ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে হেম ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আঃ, বাঁচা গেল! আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম যে। আসুন, ডাক্তারবাবু, শিগ্‌গির একবার আমার বাড়ী আসুন—"

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সমভিব্যহারী লোকটী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বল দেখি? শান্তি কেমন আছে?"

হেমেন্দ্র অপরিচিতের এই অযাচিত আত্মীয়তায় মনে মনে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও এ বিপদের সময় বিরক্ত হইতে পারিল না বা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাব প্রকাশ করায় আগন্তুকের ধৃষ্টতার কথা মনেও ধরিল না। সে তখন ঘোর বিপন্ন,—মনে হইল, হয়ত ইহার নিকটও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে যে কে, সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত না তুলিয়া ঈষৎ আশ্বস্ত চিত্তে হেম বলিল, "হঠাৎ তার মূর্চ্ছা হয়েচে। আপনারা শিগ্‌গির আসুন।" শান্তির চেহারা দেখিয়াই নীরদ তাহার শারীরিক অবস্থার বিষয় বুঝিয়াছিল, তাই সে সকালে উঠিয়াই বীরেশ্বরের নিকট হইতে সন্ধান লইয়া ডাক্তারের নিকট গিয়াছিল।

ডাক্তারের সঙ্গেই যোগেশ তাঁহার লিখিত প্রেস্ক্রিপ্সন দুইখানা লইয়া চলিয়া গেলে নীরদ পরুষ কণ্ঠে মুহ্যমান হেমেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, "এমনই করে মেরে ফেলতে হয়?" নীরদের ব্যবহারে হেম বুঝিয়া লইয়াছিল—তিনি রজনীনাথেরই কোন

আত্মীয়,—শান্তির আপনার লোক। হেমেন্দ্র লজ্জিত মৃদুস্বরে গুণ গুণ করিয়া বলিল, "চিকিৎসা হচ্ছিল ত, ডাক্তার বল্লে ম্যালেরিয়া—"

নীরদ বাধা দিল, "ছাই চিকিৎসা হচ্ছিল! ও কি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় থেকেচে? তা একবার মনে হল না!"

অপরিচিতের এই তীব্র তিরস্কারে গর্ব্বিত হেমেন্দ্র আজ রাগ করিল না, বরং লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সে যে কত বড় অপরাধে জগতের ও নিজের হৃদয়ের নিকট অপরাধী, সে কথা জলন্ত লোহার নাড়ি দিয়া বুকের ভিতর আগুনের অক্ষরে বিধাতা সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন! নীরদ তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারে সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনলে ত, ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখনও কি রজনীবাবুকে খপর দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে? ভেবে দেখ, শান্তি যদি না বাঁচে, চিরদিনের জন্য তাঁদের কি আক্ষেপই থেকে যাবে!"

হেমেন্দ্র শিহরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "ও কি বাঁচবে না? দয়া করে আপনি ওকে বাঁচান, আমায় যা করতে বলবেন, আমি করতে প্রস্তুত আছি! আমিই ওকে মেরে ফেল্লুম!"

হেমেন্দ্রর চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বিমর্ষ মুখে সে কহিল, "সে যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব, কেমন করে? আমার এ সংসারে শান্তি ছাড়া আর আছেই বা কে! আমার—" থামিয়া গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে কহিল, "বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে উঠবে, আপনার বলতে আমার কেউ নেই।"

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হেমকে সে যেরূপ

কঠোর-চিত্ত. মমতাহীন পাষণ্ডরূপে কল্পনা করিয়াছিল, তাহাকে ঠিক সে রকম না দেখিয়া নীরদ অনেকটা আশ্বস্ত হইল। অবস্থার গতিকে পড়িয়া সেও যে কত সময় তাহার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করিয়াছে! যে দোষী, সে অন্যের বিচারক হইবে, কোন মুখে? তাহাকে যে তিরস্কারগুলা শুনাইবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, নিঃশব্দে সেগুলা মনের ভিতর চাপিয়া সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে নীরদ কহিল, "হতাশ হয়োনা, হেম, প্রারব্ধ প্রবল বটে, কিন্তু পুরুষকারও সামান্য বল নয়। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই। তারপর কর্ম্মফল-দাতা তাঁর কাজ কর্ব্বেনই ত। তবে টেলিগ্রাম করি? শান্তির পক্ষে এখন তার রোগের মূল ওষুধেই সব চেয়ে বেশি কাজ করবে।" লজ্জায় হেমেন্দ্র কোন কথা বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে মুখ না তুলিয়াই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন?"

হেমেন্দ্র সব কথাই অপরিচিত আত্মীয়ের নিকটে খুলিয়া বলিল, —কেমন করিয়া রজনীনাথকে যোগেশের সাহায্যে বিদায় দিয়া সেদিন সে তাহার অপমানের তীব্র প্রতিশোধ লইয়াছিল। তাঁহার আহত মুখের সেই রক্তহীন বিবর্ণতা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আজ সে লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র কশাঘাত অনুভব করিল।

অদূরে দত্তবাবুদের শ্বেত প্রাসাদের উপর হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্যরশ্মি নামিয়া যাইতেছিল এবং শীতের অকাল সন্ধ্যায় শান্তির ললাটের মতই পশ্চিম আকাশ-প্রান্ত ম্লান হইয়া আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া নীরদ আগ্রহ-হীনভাবে প্রশ্ন

করিল, "তোমার বিনোদদার স্ত্রী সত্য সত্যই জাল না কি! সে না কি লোক ভাল নয়?" এমন বিপদের মধ্যেও একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলের হাত সে এড়াইতে পারিল না।

হেম ঈষৎ বিস্মিত ও অপমানিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে সে কহিল, "তা আমি কি করে জানব? তা ছাড়া সে সব পারিবারিক কথা—" বলিতে বলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ অপ্রতিভভাবে সে বলিল, "আমায় মাপ করবেন, সেও যা ঘটেছে, সব আমার দোষ। সত্য কথা বলতে কি, আমি তাঁকে কিছুই জানি না, তবে তাঁর উপর শান্তির যে রকম মনের ভাব, তাতে তাঁকে দেবী বলেই মনে করা উচিত ছিল।" আবার দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। "সেখানেও একটা খপর দিলে হয় না? তিনি হয়ত এলেও আসতে পারেন। শুনেছি, জ্যেঠা মশায় এখনও আমায় স্নেহ করেন। আমার জন্য না হলেও, শান্তির স্বামী বলে তাঁরা হয় ত আমায় ক্ষমা করতে পারেন,—"

হেমের এই কথায় নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তুমি শান্তির কাছে যাও, আমি টেলিগ্রাম দুটো করে আসছি।"

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, শান্তি জাগিয়াছে। সে যেন ব্যাকুল নেত্রে কাহার অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভিমানে শান্তি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সেই রোগক্লিষ্ট চিত্তের অভিমানের নীরব বেদনা হেমকে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিগত আত্মাভিমানের বশে মুখটা মুহূর্ত্তের জন্য একবার লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বিছানার উপর তাহার

ক্রমে তিনি পুত্রের সম্বন্ধে নিজেকেও কতকটা বিপন্মুক্ত বিবেচনা করিয়া একটু করিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ ও নিজের নিয়মানু-যায়ী কার্য্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিনোদ একটু ক্ষুণ্ণ হইবে, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্যামাকান্ত বিনোদের বিবাহের কথা পাড়িয়া বলিলেন, রজনীনাথের নির্দ্দিষ্ট মেয়েটি তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছে,সেখানেই শীঘ্র কথা দিবেন, অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে, এমনই তাঁহার ইচ্ছা।

সহসা কে যেন তাহাকে বেত্রাঘাত করিল,—বিনোদ চমকিয়া উঠিল। তাহার সকল আশা ভরসা এক কালেই ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল। শ্যামাকান্ত পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিলেন না, দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "শীঘ্রই তাঁরা বিনুকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন, জানতো? বাড়িটার এর মধ্যে একবার রং ফেরাতে পারলে ভাল হয়! এঁর মৃত্যুর পর বাড়িতে কোন বড় কাজ হয়নি, এবার আবার আমার উপরই সব ভার! আঃ, তিনি থাকতে এ সকল বিষয়ে আমাকে কি নিশ্চিন্তই রেখেছিলেন!—" শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। দেওয়ান মহাশয় তাঁহার বিরলকেশ মস্তক আন্দোলিত করিয়া গভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "তা আর বল্‌তে? কি লক্ষ্মীই ছিলেন! আমাদের প্রতিই কতখানি তাঁর স্নেহ! আহা, মা আমার আজ থাকলে কত আনন্দই করতেন।"

বিনোদ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল! তাহার হৃদয়ের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছিল।

অত্যন্ত নিকটে আসিয়া হেম বসিল ও কিছুক্ষণ তাহার অভিমানাহত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "শান্তি!" সেই এক উৎসব-রজনীর পুষ্পমণ্ডিত প্রাঙ্গণে শঙ্খরোলের মধ্যে যে দুইটি লজ্জা মুকুলিত নেত্র অর্দ্ধমুদিত কুসুম-কলিকার মত, তাহার দিকে প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে তখন কি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল, আজ কে তাহার পরিবর্ত্তে এ হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল? সেই না!

"আমার দিকে চাও, শান্তি—" বলিয়া সে শান্তির একখানা শীর্ণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তাহার স্বর অশ্রুজলে জড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তি আশ্চর্য্য হইয়া মুখ ফিরাইল, নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার জন্য দুঃখ করচো, আমি মরে যাব বলে?"

হেমেন্দ্র দুই হাতে শান্তির দুর্ব্বল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া পড়িয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, তোমারি জন্য শান্তি, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! আমি সব দুরাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে মানুষ হব, শান্তি, শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! শান্তি, লক্ষ্মী তুমি আমার, তোমায় চিনিনি, তাই আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি। আমার মঙ্গললক্ষ্মী, অমঙ্গলের মুখে আমায় ভাসিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও না।"

বলিতে বলিতে হেম দেখিল, তাহার কথাগুলা সবই ব্যর্থ হইতেছে, শান্তি জাগিয়া নাই। তাহার ক্ষীণ হাতখানি হেমের হাতের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। রোগের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হেম তাহার সেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের মূর্চ্ছাকে

নিদ্রা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কাছে বসিয়া তাহার রুক্ষ চুল-গুলা মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শান্তির মুখে এত সৌন্দর্য্য আর কখনও ত সে লক্ষ্য করে নাই! নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখার ম্লান আলোকে তাহার মনের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া সেখানে আজ এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

৪৫

বাড়ীতে ক্রিয়াকলাপ কাজ-কর্ম্ম সমস্তই যথানিয়মে চলিতেছে। তথাপি বাঁশি এক হইলেও ভিন্ন সুরে যেমন তাহা হইতে আনন্দ ও বিষাদ যুগপৎ ধ্বনিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শান্তি না থাকায় লক্ষ্মীপুরে দেবসেবা অতিথি-সেবা প্রভৃতি সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও কি এক অভাব, কি এক শূন্যতা, শ্রীহীন অবসাদে জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এমন সময়ে সিদ্ধেশ্বরীর আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমুদয় ভার শিবানীর ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে নিমেষে জাগাইয়া তুলিল। এত বড় সংসার তাহারই দিকে এখন অসহায় বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া বক্ষলীন ক্ষুদ্র শিশুর মত ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। এখন আর তাহার এমন করিয়া নিজের মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধা বিহঙ্গিনীর মত এখানে সেখানে লুটাইয়া বেড়াইলে চলিবে কেন? সম্মুখে যে সুবিস্তৃত কর্ম্মভূমি কর্ত্তব্যসাধনের জন্য অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলি হেলাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতেছে, তাহার অখণ্ডনীয় আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহার আছে? নিজেকে নিজের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

কার্য্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিবার জন্য, মনে বল ও সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য, তাই সে প্রথমবার নিজের মনের সহিত যুক্তি বিচারের দ্বারা আপোষে সব মিটাইয়া লইতে চাহিল। যুক্তি দিয়া চিত্তকে বুঝাইতে চাহিল, ঈশ্বর যাহাকে যেখানে দিয়াছেন, সেখানকার সকল কার্য্য সকল কর্ত্তব্য প্রফুল্লান্তঃকরণে যদি সমাধা করা যায়, তবে এ জীবন উদ্দেশ্যবিহীন কেন হইবে? যিনি আজ তাহার মধ্যে সম্মিলিত, একীভূত, ইহাতে কি তাঁহাকে পাওয়া হয় না? শিবানী এই প্রথম বার জোর করিয়া মনে কবিল, সে বিধবা। ছি, সত্যকে বৃথা ভাণের দ্বারা চাপিয়া রাখা, মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, না আঁখিঠারা? ঈশ্বরের দেওয়া দণ্ড, সহিষ্ণুতার সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই মনুষ্যত্ব। হাহাকার করিয়া মাথা কুটিয়া কর্ম্মবন্ধন যখন খুলিবার নয়, তখন তাহাতে পাকে পাকে জড়াইয়াই বা কি লাভ আছে! শিবানী মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা সবলে ত্যাগ করিয়া নিজের রুদ্ধ গৃহের কবাট খুলিয়া হঠাৎ একক্ষণে বাহিরের তপ্ত রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও সে কিছু বলিল না। চুপি চুপি স্নানের পর শাদা থান পরিয়া হাতের গহনাও সে খুলিয়া ফেলিল।

শ্যামাকান্ত শিবানীর বিধবা-বেশ দেখিয়া প্রথম তাহাকে চিনিতে পারেন নাই, তারপর চিনিয়াই, "তারা!" বলিয়া ঈষৎ শিহরিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন; বুকের মধ্যে অত্যন্ত অতর্কিতভাবে ভীষণ একটা আঘাত হাতুড়ির ঘায়ের মত সজোরে আঘাত করিল। অল্প পরে দম লইয়া আর্ত্তভাবে তিনি বলিলেন, "বৌমা আমায় আর সবাই মিলে হত্যা করোনা। কেমন করে তোমার এ মূর্ত্তি আমি চোখে দেখব?"

শিবানী এই ভৎর্সনার জন্য বর্ম্মাচ্ছাদিত যোদ্ধার মত প্রস্তুত হইয়াই সমরাঙ্গনে নামিয়াছিল। সে অকুণ্ঠিত সাহসে মুখ তুলিয়া পরিষ্কার-স্বরে কহিল, "আমার আর অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেবেন না। যা করতেই হবে, তার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল।"

শ্যামাকান্ত কাতর স্বরে কহিলেন, "তবু যে আশা ছাড়তে পারিনে মা, এখনও যে তাকে ফিরে পাব মনে করতে বড় সাধ হয়।"

এদিকে কাশী-যাত্রার সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত! সেখানে দেওয়ানজী নিজে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। পুরাতন বাড়ী কয় মাসে মেরামত করিয়া বদলাইয়া বাসোপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। এখানেও সকল আয়োজন ঠিক। বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত, ঘর বাড়ির ব্যবস্থা সবই যথাসম্ভব স্থির হইয়াছে, শুধু তাঁহার শরীরটা একটু সুস্থ হইলেই যাওয়া হয়। শিবানীও লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিতে পারিবে ভাবিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজ-বন্ধনের বাহিরে জনবিরল কুটিরের শান্তিপূর্ণ স্বাধীন জীবন মনে মনে তপঃপূত শুদ্ধ করিয়াই সে গঠিত করিতেছিল। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় ছাড়িলে, আঃ, কি অনাবিল শান্তি, অপরিমেয় সুখ! বনের হরিণী যেন জালবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল অমূল্যকুমারই এ বন্দোবস্তে বড় সুখী হইতে পারিতেছিল না। সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পিতামহকে প্রশ্ন করিতেছিল, "সেখানে গাড়ি আছে? পুতুল আছে? কমলা নেবু আছে? আর কি আছে?"

সেদিন সবেমাত্র কয়দিন পরে রোদ উঠিয়াছে। রোদ উঠার

সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের বেদনা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্যামাকান্ত পাঁজি দেখাইয়া কাশী যাত্রার দিন স্থির করিলেন। আগামী বুধবার, যাত্রার দিন, শুভ। শ্যামাকান্ত মনে মনে বলিলেন, "মাগো, যেন শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি পাই, মা। আর কিছুই শুভ আমার নাই, শুধু এখন তোর পাদপদ্মে একটু স্থান!"

শিবানী সমস্ত দিন ধরিয়া বাসনকোসন গুছাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিল। যাহা যেখানে রাখিবার রাখিতে তুলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া সে পূজার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় রোরুদ্যমানা মোক্ষদা দাসী আসিয়া ডাকিল, "বড় মা, কর্ত্তাবাবু তোমায় শীগগির একবার ডাকচেন"।

কি যেন একটা অজানিত ভয়ে শিবানীর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, জানিস?" ক্রন্দন-জড়িত স্বরে মোক্ষদা কহিল, "ছোটমার বড্ড ব্যারাম গো—বাবুর কাছে তার এয়েচে—বাঁচে কি না বাঁচে!" শিবানীর হাত পায়ের তলা যেন হিম হইয়া আসিল।

শ্যামাকান্ত বধূকে দেখিয়া অসম্বরণীয় হৃদয়াবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আমার মৃত্যু নেই, এই অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কেবল এই সব চোখে দেখবার জন্যই শুধু বেঁচে থাকলাম বইত না। নিজে ছুটে গিয়ে একবার দেখব, সে শক্তিও নেই" মৃদু হইতে মৃদুতর স্বরকে আবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তুমি যাও, মা, কিছু টাকা নিয়ে যাও, যেন বিনা চিকিৎসায় মাকে আমার মেরে ফেলে না। তোমায় আর কি বলে দেব,

—আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখই আছে, অনেক সহ্য করেচি, আরও অনেক সইতে হবে। প্রাক্তনে যা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে? তুমি যাও মা, ভোরের ট্রেনেই যাও। এখন ত আর ট্রেন নেই। কবিরাজ মশাই, বিপিন আর দাসীদের দুএকটাকে সঙ্গে নিও। এই দলিলখানা হেমকে দিও, যদি তার এতেও একটু দয়া হয়! আর একটা কাজ কর, বিপিনকে ডেকে পাঠাও, রজনীকে একটা তার করুক,—সে, বোধ হয় কিছুই জানে না। তারা, মা, ব্রহ্মময়ি, আমায় তোর চরণে একটু স্থান দে মা, আর যে আমি পারিনে।"

শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আজ আবার অনেক দিন পরে তাহার শুষ্কনেত্রে জল পড়িতেছিল।

যখন দারুণ উৎকণ্ঠা ও নিরাশা বহিয়া গাড়োয়ান নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর মধ্যে শিবানী প্রবেশ করিল, তখন চারিদিকের গাছপালার উপর দিয়া সন্ধ্যার ঘনান্ধকার সেই ক্ষুদ্র পল্লীখানিকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। অল্প কুয়াসা ও মেঘ আকাশে তারকা-চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চলন্ত তরল মেঘের আবরণের মধ্য দিয়া বিকারের রোগীর নিষ্প্রভ ঘোলা চক্ষুর ন্যায় ম্লান চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আবার মেঘান্তরের আচ্ছাদনে লুকাইয়া পড়িতেছে। ঝোপঝাপ গাছপালার মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঝিকিমিকি জোনাকির পুচ্ছ শত শত স্তিমিত আলোকরশ্মি জ্বালাইয়াও সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে কেন্দ্রচ্যুত উল্কাখণ্ডের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

প্রবেশ-দ্বারের ঠিক সম্মুখেই একটা ঘরের বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, এবং কে একজন সেই আলোর সম্মুখে বসিয়া একখানা ক্ষুদ্র নোটবুকে পেনসিল দিয়া নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। তাহার নত মুখে ললাটের উপর হইতে অসন্নিবেশিত কুঞ্চিত কেশের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া শিবানী তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। চেহারার ধরণে হেমেন্দ্র বলিয়াই সে তাহাকে অনুমান করিয়া লইল এবং সেই বিশ্বাসেই অগ্রসর হইয়া ভয়বিহ্বল ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

সে ব্যক্তি চমকিয়া মুখ তুলিল। আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি পরিষ্কাররূপে তাহার মুখের উপর পতিত হইয়াছিল। শিবানী দেখিল, সে ব্যক্তি হেমেন্দ্র নহে! কে—? একবারমাত্র মুখখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই শিবানীর আপাদমস্তক বায়ুস্রোত-তাড়িত কাশকুসুমের মত কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই তবে! শিবানী তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সেখানে সংবদ্ধ রাখিতে পারিতেছিল না, অথচ ফিরাইয়া লইবার শক্তিও ছিল না।

কোন্ মহা ঐন্দ্রজালিকের গৃহ এ, যেখানে অসম্ভবও অনায়াসে সম্ভব হইয়া উঠে! যেখানে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ শরীরে দেখা দিয়া রুদ্ধ আশাস্রোতে সবেগে আঘাত করে! এ কোন্ মায়ার রাজ্যে সে আজ সহসা আসিয়া পড়িল! মুহূর্ত্ত মাত্র সে ব্যক্তি, জড়ের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। কিন্তু তার পর এ কি ইন্দ্রজাল! হঠাৎ সে পেনসিল ও খাতাখানা জামার পকেটের মধ্যে ফেলিয়া শিবানীর নিকটে, এত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল যে, তাহার তপ্ত নিশ্বাস শিবানীর গণ্ড স্পর্শ করিল। শিবানীর

বক্ষের দ্রুত কম্পনও বুঝি তাহার কর্ণে অনুভূত হইয়া থাকিবে! একমুহূর্ত্ত কেহ কোন কথাই বলিল না। দুইজনেই নিষ্পন্দ লোচনে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল।

বিরাট পুরুষের সমাধি মূর্ত্তির ন্যায় সমস্ত চরাচর তখন ধ্যানমগ্নবৎ স্তব্ধ হইয়া ছিল! কেবল ঝিল্লির সমতান সেই যোগমগ্ন বিশ্বের অন্তরকেন্দ্রের মধ্যে প্রণবের গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র শান্ত স্তব্ধ কুয়াসা-জর্জ্জর শীতের রাত্রি নিঃশব্দে মন্দির-দ্বারের প্রহরীর মত প্রহরবেত্র হস্তে তর্জ্জনী তুলিয়া জাগিয়াছিল! শিবানীর হাতপায়ের তলা অসাড় হিমবৎ হইয়া আসিতে লাগিল।

নীরদকুমার আর একটু নিকটে আসিয়া শিবানীর একটা হাত ধরিল, মৃদু অথচ অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "শিবানী, ভয় পেয়েছ! আমায় চিনতে পারলে না?"

সহসা একটা দমকা হাওয়ায় আলো নিভিয়া গেল। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া উঠিল।

এদিকে দ্বিতীয় মূর্চ্ছার পর হইতেই রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। ভাল করিয়া আর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই, প্রলাপও আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুচ্ছায়াঘন মুখের পানে আর্ত্তদৃষ্টিতে চাহিয়া হেম শান্তির বিছানা ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রোগী অল্পক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। নীরদ সন্তর্পণে কাছে আসিয়া তাহার কানের কাছে নত হইয়া চুপি চুপি বলিল, "তোমার বৌদি এসেছে, একটা আলো নিয়ে যাও।" বলিয়াই হেমের মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। হেমেন্দ্র দ্বিধা না করিয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল।

অন্ধকারে শিবানী একা দাঁড়াইয়া ছিল। হেম আসিয়া তাহার দুই পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাহার পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া ডাকিল, "বৌদি, তোমায় মনে কষ্ট দিয়েছি বলেই আমার এ শাস্তি! তুমি ক্ষমা কর বৌদি, না হলে আমি জন্মের মত যেতে বসেছি।"

শিবানীর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, অবসন্ন পা দুইখানা তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে; অতি কষ্টে শরীর মনের শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্নেহময়ী সর্ব্বংসহা জননীর ন্যায় লজ্জা ও অনুশোচনাপীড়িত দেবরকে সে ধরিয়া তুলিতে গেল, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "এত কাতর হয়ো না, ঠাকুরপো, শাস্তি আমাদের ভাল হবে বৈ কি। ভগবান কি এমন করবেন!"

হেম তথাপি তাহার পা ছাড়িল না, উন্মাদের মত জোর করিয়া দুই হস্তে পা ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে যে শাস্তি বাঁচবে না বৌদি! বল, তুমি আমার কুব্যবহার ভুলতে পারবে?"

"স্থির হও, ঠাকুরপো, অত কাতর হয়ো না। আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি? নিশ্চয়ই শাস্তি আমাদের ভাল হবে, ভয় কি?"

হেমেন্দ্র নত হইয়া হৃদয়ের সহিত আবার তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। ঈষৎ লঘু চিত্তে সে কহিল, "তোমার আশীর্ব্বাদে আবার আমার আশা হচ্ছে।"

৪৬

রজনীনাথ যখন নীরদের টেলিগ্রাম পাইলেন, তখন মক্কেলদের বিদায় করিয়া নিজের পাঠাগারে সুপ্রকাশকে লইয়া তিনি বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একখানা খোলা বই পড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু সুকু তাঁহাকে সে দিকে মন দিতে দেয় নাই। একটু চিত্ত সংযত করিয়া একটি প্যারা না পড়িয়া উঠিতে উঠিতেই সে অসহিষ্ণু হইয়া পিতার বাহু আকর্ষণ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ঠিক এইখানটাই আপনি শুনলেন না। বিস্কুটের টিন কেটে ত চাকা হ'ল, পাতলা কাঠির ছিলকে দিয়ে পাখা দুটি হবে—কিন্তু এইবার পেট্রোল না হলে ত চলবে না। সোফার আমায় দেয় না—তুমি যদি বাবা তাকে একটু দিতে বলে দাও, তাহলেই দেখবে, আমার এয়ারোপ্লেন হুস্ হুস্ করে আকাশে উঠতে থাকবে। ঐ আবার 'তুমি বই পড়চ—!" সুকুর অভিমানকে আজকাল রজনীনাথ অত্যন্ত ভয় করেন, তাই তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া বলিলেন, "না রে, একটু দেখে নিলুম, আচ্ছা থাক্।"

সুপ্রকাশ খুসী হইয়া কাছ ঘেঁসিয়া আসিল, বিব্রতভাবে কোলে মাথা রাখিয়া দুই হাতে গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা, বাবা, সব্বার চাইতে আগে কোন দেশের লোকেরা উন্নত হয়েছিল?"

এ প্রশ্ন নূতন নহে; রজনীনাথ স্নেহের সহিত হাসিয়া কহিলেন "আমাদের দেশ।" সুকুও হাসিল। এমন সময় বলাই

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেওয়ানের সহিত বিনোদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবশেষে শ্যামাকান্ত যখন সন্ধ্যা-বন্দনার জন্য উঠিলেন, তখন হঠাৎ বিনোদের হুঁস হইল, সে কি মূঢ়ের ন্যায় সুযোগটুকু প্রত্যাখ্যান করিয়া ফেলিয়াছে! মনে পড়িল; এখনও সে মুক্ত, এখনও সে স্বাধীন, কিন্তু লৌহশৃঙ্খল—এই মুহূর্ত্ত হইতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে,—শীঘ্রই তাহার কণ্ঠকে কঠোর বেষ্টনে আঁটিয়া ধরিতে এতটুকু মমতা করিবে না।

বাহিরে আসিয়া সহসা সে মৃদুস্বরে ডাকিল, “বাবা!”

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রথম বার তাহার ডাক শুনিতে পান নাই। দ্বিতীয় বারে চকিত হইয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু বলবে?”

বিনোদ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ!” কিন্তু আর কিছু সে বলিতে পারিল না, সহসা ঘামিয়া উঠিল। পিতাকে সে জানিত, তাহার প্রার্থনা যে তাঁহাকে সহজে টলাইতে পারিবে না, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শ্যামাকান্ত কিছুক্ষণ প্রশ্নের অপেক্ষা করিয়া উত্তর না পাওয়ায় একটু বিরক্তও হইলেন এবং একটা সম্ভাবনা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় একটু ভীত হইলেন, তথাপি মনের ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলবে, বলো?”

বিনোদ এবার বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্কোচে কথা বাধিয়া গেল। অবশেষে জোর করিয়া সে একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “আমি বিলাত যাবো।”

শ্যামাকান্ত এতক্ষণ এই ভয়ই করিতেছিলেন, তথাপি তাহার সাহস দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যও হইলেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার

আসিয়া বলিল, "আরজেণ্ট টেলিগ্রাম এসেছে, একটা।" শুনিয়াই, কে জানে কেন, হঠাৎ রজনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি রসিদটা সই করিতে লাগিলেন, সুকু উঠিয়া তৎক্ষণে খামখানা ছিঁড়িয়া বিং-টি সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, ইহাতে দিদি পুতুলের বালা করিত। ক্ষুদ্র বুকখানা আলোড়িত হইয়া উঠিল। পাছে বাবা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কাতর হন, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা সে খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। রজনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝতে পারছিস?" সুপ্রকাশ অকস্মাৎ সর্পদষ্টের মত চমকিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও বাবা, একি লিখেছে—দিদির অসুখ—সিরিয়স্,—মানেত খুব বেশি?" ঘরের মধ্যকার সমস্ত বায়ু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া রজনীনাথের নিশ্বাস রোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। শাস্তির কঠিন পীড়া! সুকুর হাত হইতে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানা লইয়া রজনীনাথ পড়িলেন। কি পড়িলেন, যেন বুঝিলেন না—নিঃশব্দে কাগজখানার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সুপ্রকাশ সভয়ে ডাকিল, "বাবা!" রজনীনাথ মুখ তুলিলেন। প্রাণহীনের মত বিবর্ণ ও ম্লান সে মুখের দিকে চাহিয়া ভীত সুকু আরও শিহরিয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া সে আবার বলিল, "বাবা?"

"কি?" "যাবেন না, আপনি, দিদির কাছে? দেরি হয়ে যাচ্চে যে"

রজনীনাথ স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া অধীর কণ্ঠে কহিলেন, "যাবো না, সুকু,—যাবো বই কি! সে যে আমায় ডেকেচে!"

সুপ্রকাশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার লইয়া ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ নজর পড়িল, সুকুমার তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। কখন সে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা গভীর অন্যমনস্কতায় তিনি জানিতেও পারেন নাই। তাঁহার আর কোন কথাই মনে ছিল না, কেবল মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের তালে ধ্বনিত হইতেছিল, শান্তি মৃত্যু-শয্যায় তাঁহাকে ডাকিতেছে! রজনীনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্রর গৃহে পৌঁছিয়া আজ তাঁহার ধীর ও সংযত ভাব দেখিয়া কেহ মনে করিতেও পারিল না যে তিনিই এই সঙ্কটাপন্ন রোগীর পিতা। হেমেন্দ্র মনে করিল, "এখনও আমাদের ক্ষমা করেননি? কি কঠিন মন!" নীরদ সাশ্চর্য্যে মনে মনে ভাবিল, "অসাধারণ ধৈর্য্য! ইনিই প্রকৃত জ্ঞানী।" ডাক্তারেরা পরস্পর বলাবলি করিলেন, "মেয়েটি ভাল না হ'লে বেচারা হয় ত পাগল হয়ে যাবে। কি ভয়ানক আত্মদমন-প্রয়াস!"

শিবানী আসিবার কিছুক্ষণ পরে ভোরের সময় শান্তি একবার ভাল করিয়া চোখ চাহিল, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার একখানা হাত ধরিল, ডাকিল, "দিদি—"

শিবানী তাহার মুখের উপর নত হইয়া সস্নেহে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "আমরা যে তোমার কাছে এসেছি দিদি!"

দুর্ব্বল রোগী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠা মশায়?"

"তিনি কাল পরশুর মধ্যে আসবেন, তাঁর পায় ব্যথা হয়েছে, তাই আসতে পারেননি। অমূকেও আনবেন।"

শান্তির মুখে ঘোর নৈরাশ্য প্রকটিত হইল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া সে ক্ষীণস্বরে ডাকিল, "বাবা!"

রজনীনাথ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাছে সরিয়া আসিয়া কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "শান্তি, মা—!"

"বাবা!" রোগীর ক্লিষ্ট মুখে আনন্দের গভীর উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিল। ক্লান্ত মস্তক ঈষৎ ফিরাইয়া সে পূর্ণ চক্ষে চাহিল, "ক্ষমা করেছ কি, বাবা? আমার অপরাধ, ক্ষমা করেছ কি"

রজনীনাথের বক্ষ অবরুদ্ধ বেদনায় ফাটিয়া যাইতেছিল, কষ্টে তিনি কহিলেন, "ক্ষমা অনেক দিনই করা উচিত ছিল, মা। সন্তান ভুল করলেও ত পিতার রাগ করবার কোন অধিকার নাই।"

হেমেন্দ্র সহসা রজনীনাথের পায় মাথা রাখিয়া বলিল, "শান্তি আপনার আসবার খবরও পায়নি। সবই আমার দুর্ব্বুদ্ধি! যোগেশ ও আমি মিলে মিথ্যা কথা বলে আপনাকে সেদিন ফিরিয়ে দিছলুন বাবা! সন্তানকে ক্ষমা করুন।"

শুনিয়া রজনীনাথ রোষ-প্রদীপ্ত নেত্রে জামাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। শান্তি আবার ক্লান্তভাবে নেত্র মুদিল।

সেদিনটাও কাটিয়া গেল। ডাক্তারেরা বলিলেন, "আজ অমাবস্যা, আজই একটা ক্রাইসিস্! আজই যে কতকটা মানুষ চিনতে পারচে, এটা বড় সুলক্ষণ। তবে রোগী বড় দুর্ব্বল,

হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিয়া না যায়—” সমস্ত দিন সশঙ্ক চিত্তে কয়টি প্রাণী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রোগীর ক্রমশ-পরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়া কাটাইল। অন্য কাহারও দিকে চাহিতে যেন কাহারও সাহস হইতেছিল না।

অপরাহ্নের দিকে একবার সে সজাগ হইয়া সুপ্রকাশকে দেখিতে চাহিল। সুকু দিদির বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। পিতার ইঙ্গিতে উদ্যত অশ্রুপ্রবাহ চোখের মধ্যে চাপিয়া গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এমন সময় শান্তি বলিল, “বাবা, মিঃ রায় এসেছিলেন না ?”

রজনীনাথ নিরুত্তরে নীরদের কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েচে না ?” শিবানীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওষুধ দেবার পর একটু দুধ খাওয়াতে হবে বুঝি ?” শিবানী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনান্তরালে চাহিয়া দেখিল,—মিঃ রায় গ্লাস লইয়া সে দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সে কম্পিত বক্ষে অবসন্ন পা দুইখানাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুধ গরম করিয়া আনিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তাহার নবজীবনের আশা-উৎসাহ আলোক ও পুলকে প্রথম অরুণকিরণসংস্পর্শে নির্ম্মল নীহারবিন্দুর মতই ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল। যদিও মাথার উপর নীল নীরদমালা বিপুল উদ্যমে আসন্ন ঝটিকার সংহার মূর্ত্তিতে সাজিয়া আসিয়াছে, বীচিমালাসংক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্র উত্তাল হইয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, তথাপি সেই মৃত্যুর মুখে আজ জীবনের রাগিণী মিলন-সঙ্গীতই গাহিতেছিল।

বহুদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত শিবানীর বিষণ্ণ চিত্ত, সহসা যে যাদুকরের স্মিতহাস্যমণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় আলোকে

নবীন জগতের হরিৎ-শোভাযুক্ত নূতন দৃশ্যের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে জরামৃত্যুক্ষয় ও মিথ্যার আক্রমণকে হঠাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন সে কোনমতেই পারিতেছিল না। তাই এই আসন্ন ঝড়ের মুখেও সে শান্ত সংযত অন্তঃভাবে বিপদকে মরীচিকার মত দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীয়মান অসত্যরূপে ধরিয়া লইয়া চিত্তকে আশাপূর্ণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রাত্রে রোগী যেন একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। রজনীনাথের বিশ্বাসী কলিকাতাস্থ দুইজন ডাক্তার কয়দিনই সেখানে উপস্থিত, আজ আবার আর একজন সাহেব ডাক্তারকেও আনা হইয়াছিল, বিশেষ ভয়ের সময়টা কাটিলে যেন বাঁচা যায়। বসুমতী সেখানে জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে একটু ভাল বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তিনিও বিপিনের সহিত চলিয়া আসিয়াছেন।

পর দিন প্রভাতে যখন শান্তি জাগিয়া উঠিল, তখন জানালার চারিধার দিয়া নীলপর্দ্দার অন্তরাল হইতে প্রভাত সূর্য্যের নবীন রশ্মি সশঙ্কিত রোগীগৃহে, শঙ্কাহীন নির্ম্মল শুভ্রতনু শিশুর অকুণ্ঠিত সরল হাস্যমণ্ডিত নেত্রপাতের মত দ্বিধাশূন্য হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল! রাত্রির অন্ধকারে গত দিবসের কর্ম্মক্লান্তি ও অবসাদের কালিমাকে মিলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ সুন্দর প্রশান্ত প্রভাত নবজাগ্রত জীববৃন্দকে নবীন শক্তি ও কর্ম্ম-উদ্দীপনা দান করিয়া আবার কর্ম্মসংঘাতের মাঝখানে নামাইয়া দিতে আসিয়াছে। এখনও সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতর ক্রন্দন ও ঘাতপ্রতিঘাতের বিরোধ, উদ্বেগের তীব্র চীৎকার জাগ্রত হইয়া উঠে নাই! জগৎ এখনও

সদ্যোজাত শিশুর মত নির্ব্বিরোধ, বিদ্রোহ বিবাদের সূচনার তখনও বিলম্ব ছিল। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভুলভ্রান্তি, সমস্ত পাপতাপ প্রতিদিনই এমন করিয়া বিগতক্লেশ ও সুস্থ শান্ত হইয়াই স্নেহময়ী মায়ের পুণ্য অঞ্চলতলে নবজাত শিশুর মতই দেখা দেয়। যুগ যুগান্তর হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। তবু যেন আজিকার প্রভাত নবীন আনন্দ লইয়া এই গৃহেই আজ প্রথম জাগিয়া উঠিল।

শান্তিকে জাগিতে দেখিয়া ডাক্তার আসিয়া নাড়ি দেখিলেন, মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল, রজনীনাথ গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া ক্লান্তিহীননেত্রে সম্মুখে উপবিষ্ট হেমেন্দ্রর উৎসুক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু করুণার হাসি হাসিল, হেমও ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ম্লানভাবে হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া ফেলিল। তবে তাহার পাপ প্রায়শ্চিত্তবিহীন নয়!

একটু বেলা হইলে সুকু আসিয়া রজনীনাথকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া এই সময় শিবানী একখানা কাগজ হেমের হাতে দিয়া বলিল, "বাবা আসবার সময় এই কাগজখানা তোমায় দিতে দিছলেন। কদিন আর দিতে পারিনি ঠাকুরপো এই নাও।"

"কি এখানা?" বলিয়া হেম সেখানা খুলিয়া একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিল, "ও সব অমূল্যর। আমি নিজে উপার্জ্জন করব! আমার সে তৃষ্ণাই যখন আর নেই, তখন আর কেন বৌদি?"

রজনীনাথ শ্যামাকান্তের দানপত্রখানা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিলেন, হেমেন্দ্র ও শান্তি তাঁহার স্থাবর

অবস্থার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী, এই কথাই তাহাতে লেখা ছিল। রজনীনাথের সাহায্য না পাইয়া জেলা কোর্টের উকীলের দ্বারা বৃদ্ধ একটু কৌশলের সহিত এই দানপত্রখানি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পৌত্রকে এবং অপরার্দ্ধ বিধবা পুত্রবধূ শিবানীকে দান করিলেন, এই মর্ম্মে এক দলিল লেখাপড়া করা হয় এবং শিবানীও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার দেবর ও দেবর পত্নীকে দান-পত্রে লিখিয়া দিয়াছিল। রজনীনাথ দানপত্র পড়িয়া একটু হাসিয়া শিবানীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "বিষয় ত তোমার নয় মা। তুমি দান করচো কেমন করে? তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি তাঁর আদেশমত তোমার স্বামীই দান করবার প্রকৃত অধিকারী।" ইহা বলিয়া নিকটস্থ ক্ষুদ্র টেবিলের উপর শিশিপত্র গুছাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত মিঃ রায়ের দিকে ফিরিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "বিনোদ!" নীরদ ফিরিয়া দাঁড়াইল। রজনীনাথ কহিলেন, "তোমার বাবাকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসতে চল্লুম। তোমার স্ত্রীকে এ অসিদ্ধ দানপত্র ফিরিয়ে দিও—"

সহসা সেই ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও ইহা অপেক্ষা কেহ অধিকতর স্তম্ভিত হইত না! হেমেন্দ্র উঠিয়া গিয়া নিঃশব্দে নীরদকুমারের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া লজ্জাপীড়িত রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "দাদা!"

বিনোদ তাহাকে ধরিয়া তুলিল, সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া প্রশান্ত স্বরে কহিল, "ও-সব কথায় আমাদের কাজ কি হেম? বাবা আসচেন, এসো, আমরা একসঙ্গে দু ভায়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাই; আমরা দুজনেই তাঁর কাছে অপরাধী!"

শান্তির রক্তহীন মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। "দিদি" বলিয়া সে শিবানীর সাগ্রহ বাহুর মধ্যে পরিতৃপ্তচিত্ত শান্ত শিশুটির মত নিজেকে অর্পণ করিয়া স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত তাহার মুখের উপর প্রফুল্ল নেত্রের দৃষ্টি স্থাপন করিল।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বারের নিকট হইতে শ্যামাকান্ত ডাকিয়া বলিলেন, "কৈ আমার মা, আমার মা কৈ গো?"

পরই সহসা ক্রোধে ও নৈরাশ্যে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরেই তিনি বলিলেন, "কেন, দেশের বিস্তের কি কুলুবে না? না, ফিরিঙ্গী হবার সাধ হয়েচে? না, না, সে সব হবে টবে না, বাপু! যাও, যা কচ্চো, তাই করেগে যাও"—

বলিতে বলিতে পুত্রকে আর কোন কথাবার্ত্তা কহিবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। বিনোদ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ঝটিকা যখন আসন্ন, তখন মেঘ আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে? শীঘ্রই বজ্র-বিদ্যুৎ বক্ষে লইয়া সে দেখা দিল।

নবীন জীবনে লোকে নিরাশার অন্ধকার বড়-একটা কল্পনা করিতে পারে না, আশার সূর্য্যালোক তাহার প্রাণমন এমনই আলোকিত করিয়া রাখে! বিনোদ পিতাকে জানাইল, সে বিলাতে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে যাইবে, এবং এখানে ফিরিয়া শিল্পশিক্ষাশ্রম খুলিয়া দেশের যুবকগণের মধ্যে শিল্পশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবে। সে বিবাহ করিতে চাহে না! শ্যামাকান্ত ইহা বালকের খেয়াল, ও পরে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, এবং শীঘ্র শীঘ্র পাকা দেখার আয়োজন করিবার দিকে গৃহস্থদিগকে মনোযোগ প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন! কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত বিনোদও ক্রমে অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল! একদিন সে পিতার মুখের উপর বলিয়া বসিল, "দেশাচার বা অন্ধ কুসংস্কারের জন্য কোন সদুদ্দেশ্য ত্যাগ করা মনুষ্যত্ব নয়! যদি অশাস্ত্রীয় হত, অবশ্য মানতাম! আমি নিশ্চয় বিলাত যাব"!

শ্যামাকান্ত ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তবে আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা,—বেল্লিক! তোর জন্য কি আমি জাত খোয়াব! অমন পুত্র থাকার চেয়ে অপুত্রক হওয়াও ভাল! যা, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে বৃক্ষসঙ্কুল বনস্থলী যেমন নিঃশব্দে জ্বলিয়া উঠে, তেমন করিয়া অভিমানী বালকের সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। সে একবারমাত্র পিতার মুখের পানে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। পরমুহূর্ত্তে দ্রুতপদে নিঃশব্দে তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

প্রথম দিন শ্যামাকান্ত রাগের মাথায় পুত্রের কোন খোঁজ খপর লইলেন না! পরদিন তাঁহার প্রতি ক্রোধটা একটু পড়িয়া আসিলে সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলেন সে পূর্ব্বদিনই কোথা চলিয়া গিয়াছে! কেহ সংবাদ জানে না।

পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিয়া গেল, তবে পিতারই বা এমনি কি প্রয়োজন, যে সেই অকৃতজ্ঞের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইবেন! যাক্, যে যাইতে চাহে, সে যাক্।

রাগ করিয়া কয়দিন তিনি পুত্রের সংবাদ লইলেন না, পূজার্চ্চনা ও বৈষয়িক কার্য্যাদির মধ্যে অধিকতর মনোযোগ দিয়া এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তেমন করিয়া আর কয়দিন কাটে? দেখিতে দেখিতে পিতৃহৃদয় একান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, কি নির্লজ্জ এই কর্ম্মচারীগুলা? তিনিই না হয় পুত্রের উপর রাগ করিয়া আছেন, সেইজন্য না হয় পুত্রের সংবাদ লইতেছেন না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরাও কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল?

তাহাদের তো সে প্রভুপুত্র! তাহাদের তো সে ভবিষ্যৎ প্রভু! একটা দায়িত্বজ্ঞানও কি নাই?

পিতা পুত্রের উপর রাগ করিবে,—কেন করিবে না? কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া কিসের জন্য এমন বেয়াদবি করিতে সাহস করে? দেওয়ান আসিলে কহিলেন, "তোমরা আজকাল ভারী নবাব হয়ে যাচ্চো, কোন কাজটা মন দিয়ে করা হয় না, কেন বলোত? যদি না পারো, কিছুদিনের জন্য না হয় ছুটী নাও।"

দেওয়ান পুরাতন লোক,—কর্ত্তার মেজাজ জানিত, সহসা ভর্ৎসিত হওয়ায় বিরক্ত হইল না, বরং ভর্ৎসনার কারণ বুঝিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং শ্যামাকান্ত নীরব হইলে সঙ্কুচিতভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আমি ত ছোটবাবুর সঙ্গে ইষ্টিশান পর্য্যন্ত গেছলুম, তা তিনি কিছুতে ফিরলেন না। তার পর তাঁর বাসাতেও—"

"ওঃ, তাহলে সে বাসাতেই গেছে!—আচ্ছা যাও, হতভাগা ছেলে তেজ করে বাড়ি থেকে চলে গেলো, বাপের কাছে থাকতে অপমান বোধ হলো, সেখানেও সে কি আমার বাড়ি নয়—"

দেওয়ান ভীতভাবে হঠাৎ বাধা দিল, "তিনি সেখানেও এখন নেই। আমি তাঁকে অনেক বোঝালুম, বাড়ি ফেরাবার ঢের চেষ্টা করলুম, তা কিছুতেই তিনি শুনলেন না, বল্লেন, না কাকামশায়, বাবা আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন, আমিও এ মুখ আর তাঁকে দেখাব না, তোমরা মনে করো তোমাদের বিনোদ মরে গেছে।" জড়িত কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া

একটু ইতস্তত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আরো বল্লেন, 'আমার মা থাকলে কি বাবা এমন করে আমায় দূর হয়ে যেতে বলতে পারতেন, কাকামশায়? যার মা নেই, তার সংসারে কেউ নেই।"

দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে সহসা সেই গম্ভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাকান্তের বিরক্ত কণ্ঠ স্তব্ধ কক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তুমি অমনি ফিরে চলে এলে? কি সুন্দর কর্ত্তব্যজ্ঞান! আশ্চর্য্য—"

"না, আমি সেদিন কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনি, রাত্রেও জেগে বসে রইলুম। পরদিন সকালবেলা ছোটবাবু আমার কাছে এসে বল্লেন, দেখুন কাকামশায় আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, একজন ডাক্তার ডাকালে হয় না? আর দুটো সোডাও আনতে দিন, অমনি! কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, বিলক্ষণ গরম। হরেকে কার্ত্তিকবাবুর ডিস্‌পেন্সারিতে পাঠিয়ে নিজেই হরিশ ডাক্তারকে ডাকতে গেলুম। আধ ঘণ্টাও হয়নি, ফিরে এসে দেখি, তিনি বাড়ি থেকে চলে গেছেন। তখন বুঝলুম, আমাদের কপাল ভেঙ্গেচে। কাল পর্য্যন্ত সেখানে তাঁকে তন্ন তন্ন খুঁজে হায়রান হয়ে আজ আমরা ফিরে আসছি—"

এতক্ষণ শ্যামাকান্ত স্তব্ধভাবে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। দেওয়ানের কথা শেষ হইলে তাকিয়ার উপর তিনি উপুড় হইয়া পড়িলেন। সে চলিয়া গিয়াছে!

চলিয়া গিয়াছে! আর ফিরিবে না? তবে আর তাঁহার কি রহিল? কে রহিল? তবে আর কিসের মান, কিসের সম্ভ্রম, কিসের কীর্ত্তি? সেই যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, তবে আর কিসের জন্য, এ সব? এ বংশ-গৌরব, তবে আর কাহার

জন্য? না, না, সে আসিবে, আবার আসিবে! সে কি তার বাপের কোল ছাড়িয়া বেশী দিন দূরে থাকিতে পারে? নিশ্চয় আসিবে। কোথায় যাইবে? বিলাত, আমেরিকা? হারে অকৃতজ্ঞ ছেলে! এই মন লইয়া তুই দেশের কাজ করিবি? নিজের বাপের কষ্ট বুঝিলি না, বাপের উপর কর্ত্তব্য ভাবিলি না, বিদেশে চলিলি দেশের প্রতি কর্ত্তব্য শিখিতে? যা তোর বিবেচনা হয়, তাই কর্ তবে। কিন্তু রাগ করিয়া গেলি যে! ওরে সত্যই কি আমি তোকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিলাম? ছেলে অবাধ্য হইলে বাপ কি তাকে শাসন করে না? কিন্তু কেমন করিয়াই বা তুই বুঝিবি, কখনও তো কিছু বলি নাই, হঠাৎ বড় নিষ্ঠুর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি যে! অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেওয়ানের পানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী মৌন বিষাদে বিষণ্ণমুখে চাহিয়াছিল। সান্ত্বনা দিবার একটি কথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

"বিপিন! জ্বরটা কি বেশি হয়েছিল? গা-টা কি বড্ড গরম ছিল?" পুত্র-শোকাতুরের সেই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর প্রভুভক্ত ভৃত্যের বুকে আঘাতের মত বাজিল। সজল নেত্র বস্ত্রে মার্জ্জনা করিয়া সে উত্তর দিল, "না খুব বেশি গরম নয়, বোধ হয় সামান্যই জ্বর"!

"হুঁ, আচ্ছা, যাও"।

বিপিন গমনোদ্যত হইয়া আবার ফিরিল, "কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না?"

শ্যামাকান্ত তাঁহার নিদারুণ নৈরাশ্যহত দৃষ্টি তাহার প্রতি স্থাপন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "বিজ্ঞাপন? কেন? তাতেই

কি সে ফিরবে? সে ত বলে গেছে, আর আসবে না, তবে?"

দেওয়ান মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিল, খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবু সন্ধান করা ত উচিত।"

"উচিত ত করনি কেন? আমায় যন্ত্রণা দেবার জন্য? যে যা উচিত জানো করতে পারোনি, এতক্ষণ! কেন, আমার কি লোকজন কেউ নেই, না টাকার কিছু অনটন পড়েছে যে যা কিছু উচিত, সব আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্য জমা করে রাখা হয়? যাও, তুমি এবং আর যার যা ইচ্ছে হবে, উচিত মত কাজ সবাই মিলে করোগে। নিজেদের বুদ্ধিতে সব না কুলিয়ে ওঠে, শ্রীশ বাবুর কাছে যেও, না হয়, কল্‌কাতায় রজনীর কাছেও যেতে পারো। যাও। আমায় তোমরা একটু ছুটি দাও।"

দেখিতে দেখিতে লোকের মুখে মুখে সংবাদটা ক্রমেই শাখায় পল্লবে বেশ গজাইয়া উঠিল। বাড়ীতে মাসী-পিসি-মামী-দিদি প্রভৃতির উচ্চ ক্রন্দনে পাড়ার লোক সেদিন তটস্থ হইয়া পড়িল, এবং চৌধুরীদের জ্ঞাতিরা সেদিন ভিতরে ভিতরে হরির লুটের বন্দোবস্ত করিয়াছিল কি না সে কথা স্পষ্ট জানা না গেলেও সেই ধরণের কি একটা গুজব যেন শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

প্রথমটা শ্যামাকান্ত রজনীনাথের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, বিনোদের বিলাত যাইবার সংকল্পের মূলে রজনীনাথের পরামর্শ অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রের সমস্ত ভার নিশ্চিন্তচিত্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আর তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার অনভিপ্রেত

সমাজ-নিন্দিত কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করা কি রজনীনাথের পক্ষে উচিত হইয়াছিল? শ্যামাকান্ত জানিতেন, বিনোদ রজনীনাথের একটি কথার উপর নিজের মরণ-বাঁচন পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে! তিনি যদি তাহাকে প্রশ্রয় না দিতেন, তবে সে নিশ্চয়ই এমন কাজ করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদের পলায়নের পূর্ব্বদিন-আগত রজনীনাথের একখানা পত্র দেওয়ানের নিকট হইতে পাইয়া তৎপাঠান্তে তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইয়া গেল। রজনীনাথ তাহার নিরুদ্দেশের জন্য অংশতঃ দোষী হইলেও সম্পূর্ণ দোষী নহেন। তিনি বিনোদকে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, পিতৃনির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়াই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

রজনীনাথের প্রতি অনর্থক সন্দেহ করার জন্য অনুতপ্ত শ্যামাকান্ত তাঁহারই উপর পুত্রের অনুসন্ধানের ভার প্রদান করিয়া লিখিলেন, "তুমি তাকে ফিরাইয়া আনো, রজনী, আমি তোমারই হাতে তাকে দেব।" রজনীনাথ যথাসাধ্য বিনোদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; শ্যামাকান্তের পত্র পাইয়া অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছু ফল হইল না। ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সর্ব্বত্রই পুলিশ, বিজ্ঞাপন ও পরিচিত লোকের সাহায্যে সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কোনখানে কোন ছাত্রাবাসেই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটুকু উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দেশের লোক অন্তরালে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কানাকানি করিল! মর্ম্মাহত পিতা বিদ্ধপক্ষ বিহঙ্গের মত ছটফট করিয়া নীরবে শয্যায় লুটাইয়া যন্ত্রণাক্লিষ্ট বুকখানা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

তার পর, দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। প্রথমে দেশের লোক, তার পর তাহার নিজের গৃহেই নিরুদ্দিষ্ট বিনোদের নাম ও স্মৃতি অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্নেহময় জনকের হৃদয়ে সে স্মৃতি কেবল অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত রহিল না, তাহা অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা দিতে লাগিল। কতবার তিনি ভাবিতেন, যে তাঁহার মুখ চাহিল না, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া যে সামান্য একটা ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনায়াসে তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি তাঁহারই বা কিসের জন্য এত মায়া-মমতা? নারীর মত এ অন্ধ অনুরাগ কি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর সাজে?

কিন্তু কই সে আত্মদমনশক্তি? থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক জ্বালাময় চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিতে থাকে যে! সে অকৃতজ্ঞের কথা মনে হইবামাত্র সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হিম হইয়া আসে, হস্তপদ অসাড় হইয়া পড়ে! দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে কেমন করিয়া তিনি আত্মরক্ষা করিবেন?

যেন এ লক্ষ্মীপুরের পরাক্রান্ত জমিদার সে শ্যামাকান্ত চৌধুরী নয়! সে শ্যামাকান্ত, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিষয়-তৃষ্ণা-পরায়ণ শ্যামাকান্ত ত আজ আর নাই! নিষ্ঠুর কাল আজ যে তাহার কঠোর নির্ম্মম করাঘাতে সেই পূর্ব্বের শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে বিচূর্ণ করিয়া তাহার স্থলে এক পুত্রহারা শোকবিহ্বল স্নেহময় পিতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া তিনি ভুলিবেন যে সেই নিরুদ্দিষ্ট অকৃতজ্ঞ তাঁহার ইহ-জীবনের একমাত্র আশা-জ্যোতি, অন্ধ নয়নের ধ্রুবতারা, এবং পরলোকের ভরসা!

বৃষ্টিধৌত গাছ-পালার উপর দিয়া ফুরফুরে হাল্কা বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছিল। রজনীনাথের বৃহৎ উদ্যানে যুঁইকুঁড়ি-গুলি ফুটিয়া উঠিল, ম্লান ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িল। প্রাচীরের ধারে ধারে আম গাছে সবুজ আম, লিচুর ঝাড়ে লাল লিচু, এবং প্রশস্ত উদ্যান ব্যাপিয়া নানাবিধ প্রস্ফুটিত অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের শোভা! মধ্যে মধ্যে কঙ্করময় লোহিত পথ, দুই ধারে ক্ষুদ্রজাতীয় পুষ্পের পাড় ও মধ্যে মধ্যে সুনির্ম্মিত লতাকুঞ্জ এবং স্থানে স্থানে কোথায় লৌহ, কোথায়ও বা সুন্দর মর্ম্মরাসন।

এই মনোহর উদ্যানের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের সুন্দর অট্টালিকা আপন সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে যেন গর্ব্বিত স্ফীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখের থামগুলা লতাজড়িত এবং তাহাদের উপবিস্থিত পরীশিশুবাহন পক্ষীরাজগুলা শিল্পীর নিপুণহস্তে গঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই রজনীনাথের বাড়ীখানি একখানি সুচিত্রিত ছবির মত।

উদ্যানের লৌহ-বেঞ্চে গৃহস্বামী ও তাঁহার একজন মক্কেল বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

অল্প দূরে লৌহ রেইল্ বেষ্টিত শ্যামল তৃণাবৃত স্থানে দুইটি ক্ষুদ্র, চঞ্চলনেত্র হরিণশাবক লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, আর তাহাদেরই মত কৃষ্ণোজ্জ্বল-নয়না একটি বালিকা তাহার চঞ্চলগতি ভাইটির সহিত তাহাদের ক্রীড়া দেখিতেছিল। বালক দিদির হাত হইতে কোমল হরিৎ দূর্ব্বা লইয়া তাহাদের মুখের নিকট ধরিতেছে, এবং তাহাদের সহিত উল্লাসে লাফাইতেছে, ছুটিতেছে, আবার আসিয়া দিদির কাছে

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে। অনেকক্ষণ পরে বালকের আর ভাল লাগিল না। সে দিদির হাত ধরিয়া টানিল।

"দিদি, পায়রাগুলোকে বুঝি খেতে দিতে হবে না? তুমি তরু নিরুকে সব্বার চেয়ে ভালবাসো!" ছোট ভাইটির কোমল গাল দুটি সস্নেহে টিপিয়া দিদি হাসিয়া বলিল, "শুধু সুকু ছাড়া।"

ভাই ভগিনী দুইজনে তখন তাহাদের কুশের ডালা দুইখানি উঠাইয়া লইয়া পায়রার খোপের নিকট গিয়া তাহাদের আহার্য্য বিতরণ করিতে লাগিল।

শস্যকণিকার লোভে দলে দলে ঘুঙ্ঘুর পরা সাদা কালো পাটল বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুন্দর পারাবতগুলি খোপ ছাড়িয়া উড়িয়া আসিয়া চারিদিক হইতে দুটি ভাই বোনকে ঘিরিয়া ফেলিল।

"দিদি, দিদি, নতুন লক্কাটা তোমার কাঁধে গিয়ে বসলো, দেখো! ঐ যা, উড়ে গেল! দিদি, তোমার হাত থেকে গ্রাবাজটা কেমন খায়! আমি ধরতে গেলে ও পালিয়ে যায়, আসে না! বাঃ, বাঃ, বেশ মজা হয়েছে, মুক্কিটা বাবার কাছে গেল।"

বালক সুপ্রকাশ এইরূপে পক্ষীদের প্রীতি-ভোজের আনন্দ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। দিদি মধ্যে মধ্যে হাসি-মাখা কালোচোখের স্নিগ্ধ ছায়া-ঢাকা দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহার উৎসাহোৎফুল্ল মুখের মিষ্ট হাসি দেখিতেছিল, আবার কর্ত্তব্যপরায়ণা জননীর মত গম্ভীরমুখে নিবিষ্টচিত্তে পালিত সন্তান-গুলিকে আহার্য্য প্রদান করিতেছিল।

রজনীনাথ ও তাঁহার অতিথি নানা আলোচনায় গাঢ়

নিমগ্নচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে প্রবীণ অভ্যাগত নবীন গৃহস্বামীকে বলিলেন, "তা হলে এ মাস থেকেই ওটা আরম্ভ করা যাক্—কি বলো?"

"হাঁ, বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি—এবার যেদিন আস্‌বেন সে দলিলখানা সঙ্গে করে আন্‌বেন, একবার দেখে শুনে দেওয়া যাবে।"

রজনীনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধানতম উকিল এবং এই প্রবীণ লোকটি তাঁহার একজন পুরাতন ধনী মক্কেল,—লক্ষ্মীপুরের জমিদার, শ্যামাকান্ত চৌধুরী।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রজনীনাথ সহসা ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদের কোন খবর পেলেন?"

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্কভাবে গোধূলির গোলাপী ও ধূসর বর্ণে মিশ্রিত পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, রজনীনাথের প্রশ্নে অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার অকালবার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত ললাট আরও কুঞ্চিত হইয়া আসিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলেন, "কিছু না।" সঙ্গীর মুখের শোচনীয় ভাব লক্ষ্য করিয়া রজনীনাথ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারও কণ্ঠমধ্য হইতে একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে দুই-একটি মিটমিটে নক্ষত্র নববধূর সরম রাগজড়িত অর্দ্ধ নিমীলিত চাহনির মত নীল ঘোমটার মাঝখান

হইতে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, মর্ম্মর আসনের উপর বসিয়া ভাই-বোনে ঊর্দ্ধে চাহিয়া তারা গণিতেছে। "আমি দুটো দেখ্‌তে পেয়েছি।"

"আমি তো একটা বই দেখতে পাচ্ছিনা?"

"ঐ যে ঠিক ঝাউগাছের মাথায়, ঐ ছো'ট!"

"কই দিদি? আমি দেখতে পাচ্ছি না, ভাই।"

দিদি একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "তা হলে আর কি হবে বল, তোমার আমার চাব চোখ।"

রজনীনাথের কানে হঠাৎ তাহাদের কণ্ঠস্বর ও হাসির তরল শব্দ বাজিয়া উঠিল; তিনি শব্দানুসরণ করিয়া মুখ ফিরাইলেন, ডাকিলেন, "শান্তি"।

"কি বাবা?" বলিয়া শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

রজনীনাথ শান্তির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম করো। সুকু, তুমি কর্‌লে না?" প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে শ্যামাকান্ত বালকবালিকার ললাটে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার ক্লান্ত হৃদয় সেই স্নেহের পুতুল দুইটীকে স্পর্শ করিয়া যেন অনেকটা সবল হইয়া উঠিল। রজনীনাথ তাহা বুঝিলেন।

শ্যামাকান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রজনীনাথকে কহিলেন, "কই এদের ত আর বারে এসে দেখিনি?"

"বোধ হয়, এখানে ছিলনা! শান্তির মায়ের অসুখের জন্য তখন ওদের দার্জ্জিলিং পাঠিয়েছিলুম। শান্তি যখন খুব ছোট, তখন আপনি

ওকে দেখেছিলেন, মনে নেই, আপনার? সেই যখন জয়নারাণের কেস্‌টার জন্য আস্‌তেন?"

শ্যামাকান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মনে পড়্‌চে—বই কি। সেবার তুমি বলেছিলে, আপনি শান্তির বদলে ছেলেটী আমায় দিন, তা হলে ওকে ভাল করে পড়িয়ে শুনিয়ে বিলেত পাঠাই। সে তাই শুনেই ত বেশি করে জেদ ধর্‌লে।" শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রজনানাথ ক্ষোভে নিরুত্তর রহিলেন; পুত্রহারা পিতার নিকট নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পরক্ষণেই শ্যামাকান্ত সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। নিজের গভীর দুঃখের ঘন ছায়া অপরের সুখের আলো নষ্ট করিতেছে, দেখিয়া ঈষৎ যেন লজ্জিত হইলেন। শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের সহিত অপরিচিত বৃদ্ধকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাঁহার প্রচুর শুভ্র কেশ, কুঞ্চিত ললাট, বিশাল দেহ, সুগৌর বর্ণ, শান্তির মনে তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ত্ব-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত করে নাই.; কিন্তু সুপ্রকাশ কিছু গোলে পড়িয়াছিল, কারণ ব্যাক্‌লার জ্যেঠামহাশয়ের যে মস্ত সাদা দাড়ি আছে, ইনি যদি জ্যেঠামহাশয়, তাহলে এঁর দাড়ি কোথা গেল?

শ্যামাকান্ত সস্নেহে শান্তির হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পুরো নাম কি মা—শান্তিসুধা?"

শান্তি তাহার কাল চোখের তারা ভূমিলগ্ন করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "না, শান্তিলতা"।

"সত্যই তুমি শান্তিলতা। তোমার নামটি কি বাবা?" সুপ্রকাশ পিতার জানুর উপর কনুইয়ের ভর রাখিয়া তাঁহার কোলের উপর শুইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার চঞ্চল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি বরাবরই অপরিচিতের প্রতি সংবদ্ধ ছিল। পিতার জানুর উপর হইতে উঠিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল; গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "শ্রীসুপ্রকাশচন্দ্র মৈত্র!"

"সুপ্রকাশ, বেশ নাম। আমার কাছে এসো। শান্তিলতা, তুমি পড়্‌তে জানো?"

শান্তি নীরবে পিতার দিকে চাহিল। রজনীনাথ তাহার মৌন আবেদন মঞ্জুর করিয়া বলিলেন, "ও মহাকালী পাঠশালায় পড়ে, তা ছাড়া বাড়িতেও মাষ্টারমশায় কিছু ইংরেজি পড়ান। শান্তি সেদিন যে স্তবটা শিখেছো, সেটা তোমার জ্যেঠামশায়কে শোনাও ত!"

শান্তি সঙ্কুচিতভাবে সুপ্রকাশের দিকে চাহিল, তারপর আবার পিতার দিকে ফিরিয়া ধীরস্বরে বলিল, "সুকুও জানে বাবা, ও বলবে?"

শ্যামাকান্ত বলিলেন, "দুজনেই বল।"

সুপ্রকাশ সমধিক গম্ভীর হইয়া দিদির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; শান্তির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া শ্লোক আবৃত্তি করিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে বহুক্ষণ মুগ্ধ শ্রোতা ভাববিভোর হইয়া রহিলেন, তারপর তাঁহার সজল নেত্রদ্বয় রজনীনাথের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "পরের সুখে হিংসা করা উচিত নয়, আমি হিংসা করি না, কিন্তু বাস্তবিক তুমিই সুখী; আমার যদি এমন একটি মেয়েও থাকত।" শোকের অগ্নি যাহার বুকের মধ্যে দিনরাত্রি

জ্বলিতেছে, সান্ত্বনা সে অনলে ইন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠে। সমস্তটাই যাহার অন্ধকার, তাহাকে এতটুকু আলোক দান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্যামাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই একজন হতেই আমি সব পেতে পারতাম! ওঃ, অকৃতজ্ঞ আমার দিকে একবার চাইলে না! বৃদ্ধ বয়সে আমায় একা ফেলে চলে গেলো! যাক্, আমার যতদিন কর্ম্মভোগ আছে, যক্ষের ধন আগ্‌লাই, তার পর যে দিন ডাক আস্‌বে, চলে যাব।" গভীর হইতে গভীরতর বেদনায় তাঁহার ক্ষীণ স্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিল। নীরবে বহুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তারপর শুষ্ক ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাসি আনিয়া নূতন বন্ধুকে কহিলেন, "শান্তিলতা, তুমি গল্প বল্‌তে পার না? রাজার গল্প জানো? না, শিয়ালের গল্প জানো?"

গল্পের কথায় সুপ্রকাশের উৎসাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "দিদি রাজা—আর 'দো'-'সো' দুই রাণীর—আর শেয়ালের গল্প সবই জানে, জ্যেঠামশায়! আর আমিও ঢেকি চিংড়ির পিঠে খাওয়ার গল্প শিখেছি।"

উভয়েই হাসিলেন। শ্যামাকান্ত বালকের সুগোল বাহুদুইটী ধারণ করিয়া তাহাকে কোলের উপর টানিয়া বসাইলেন। "তুমি আর কি জানো, সুকু?"

"আমি আর কিছু জানি না, এখনও ছেলে মানুষ আছি কিনা, তাই বেশি শিখিনি! তুমি কিসের গল্প জান, জ্যেঠামশায়, আমায় বলো না?"

শ্যামাকান্ত একটু বিপন্ন হইলেন। পুরাকালে শ্রুত কাহিনী-

গুলির এক-আধটা এখনও এই দীর্ণ, বিষয়-বাসনা-জর্জ্জরিত বক্ষের কোন এক প্রান্তে পড়িয়া আছে কি না, এ পর্য্যন্ত ত সে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়া উঠে নাই, সেই জন্য উত্তরটা দিতে একটু বিলম্ব হইল। তিনি বলিলেন, "আমি তো গল্প জানিনা বাবা, তোমরা আমায় বরং শিখিয়ে দিও!" এই মূঢ় বৃদ্ধটির প্রতি শান্তির অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইল। প্রথম কোন্ গল্পটি দিয়া আরম্ভ করিলে এই কৃপার্হ অনভিজ্ঞটির ভালো লাগিতে পারে, সে তাহাই ভাবিতেছিল!

সুকু যদিও সর্ব্বপ্রথম শৃগালের চাতুর্য্যের কাহিনীটি শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সকলের ত এক জিনিষ ভাল লাগে না। মুখ তুলিয়া উজ্জ্বল কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার মুখে স্থাপন করিয়া শান্তি প্রশ্ন করিল, "আপনি ফিঙ্গে পাখীর গল্প শুনবেন?"

শ্যামাকান্ত প্রলুব্ধভাবে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ মা, শুনবো"।

জ্যেঠামহাশয় গল্প বলিতে অক্ষম শুনিয়া সুপ্রকাশ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল।

যে কয়দিন মোকদ্দমার জন্য শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে কলিকাতায় থাকিতে হইল, সে কয়দিন তাঁহার ভাঁটা-পড়া জীবন-নদীতে যেন একটা বর্ষার বন্যা, একটা উচ্ছ্বাসের জোয়ার আসিয়াছিল।

বৈকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়াই প্রলুব্ধচিত্তে দ্বারের দিকে তিনি চাহিয়া থাকিতেন। কতক্ষণে দুইগাছি প্লেন বালা-পরা ক্ষুদ্র হস্ত সাবধানে একখানি প্রস্তর রেকাব বহন করিয়া আনিবে! মনে পড়িত, সেই ছেলেবেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া এমনই আগ্রহে খাবারের অপেক্ষা করিতেন! সে-ও এক স্নেহময়ী রমণী ক্ষুধিত বালকের নিমিত্ত আহার্য্য আনিয়া এমনই মেহে-

কাছে বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন, এমনই স্নেহে নিজের আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেন, এমনই আগ্রহে দিবসের পরিশ্রমের সংবাদ লইতেন। তার পর বালক শ্যামাকান্ত বড় হইলেন! নূতন লোক আসিল, নূতন জীবনে নূতন স্রোত বহিল। প্রভাত মধ্যাহ্নে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মত অন্তরে বাহিরে কি বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

কিন্তু আবার এই শ্যাম সন্ধ্যায়, জীবনের এই অপরাহ্নে এ কি মায়ামন্ত্রে অতীত তাহার স্বপ্ন লইয়া ধীরে ধীরে মুদ্রিতপ্রায় হৃদয় প্রান্তে সোণালী আলোক জ্বালাইয়া তুলিতেছে। সারা মধ্যাহ্নের ধূলিরৌদ্রমাথা, আশা-নিরাশার অবিরত সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত শ্রান্ত হৃদয়ে এ কি নূতন মোহ! নূতন সাধ! অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য যেমন আর একবার তাহার দাহকারী শক্তি সম্বরণ করিয়া প্রভাত কিরণেরই মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল আলোক প্রদান করিয়া যায়, তাঁহার ভাগ্যও কি সেইরূপ আর একবার এই মরণ-নদীর কূলে তাঁহাকে আনিয়া শৈশবের সেই স্বপ্ন দেখাইতেছে! নিভিবার পূর্ব্ব-ক্ষণে দীপ-শিখার এ কি ক্ষণিক হাসি, বিদ্যুতের চপল খেলা!

বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত এই ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যে তাঁহার বহুদিনগত প্রৌঢ়া জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। স্নেহপূর্ণ কালো চোখে, সূক্ষ্ম গোলাপী অধরে, কোমল বাহুলতায় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ অনুভব করিতেন। মনে মনে তাঁহার এই ক্ষুদ্র বালিকা জননীটিকে একটু শ্রদ্ধা করিতেন, প্রকাশ্যে তাহাকে একটু ভয়ও করিতেন। যখন সে গম্ভীর হইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে বসিত এবং ঈষৎ ভর্ৎসনার সহিত অনুযোগ করিত

'জ্যেঠামশায়, তুমি কিছু খাচ্চ না'—তখন শ্যামাকান্তকে তাঁহার ক্ষুদ্র মায়ের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আবার মাছের ঝোল বা অম্বলের বাটি টানিয়া দুটি ভাত ভাঙ্গিতেই হইত, অন্ততঃ দুধের বাটিতে ভাত না তুলিলে রক্ষা থাকিত না। বৈকালে উদ্যানে সেই লৌহ বেঞ্চে আসিয়া বসিতেন, রজনীনাথ সেই রূপ বৈষয়িক কাজকর্ম্মের কথা তুলিতে চেষ্টা পাইলে, শ্যামাকান্ত শশব্যস্ত হইয়া, তাহাতে বাধা দিতেন। "রক্ষা করো, এখন! এখন আর ও সব কথা নয়! এখন আমি মার কাকাতুয়ার বুলী শুন্‌বো হরিণের খেলা আর পাখীদের নাচ দেখবো—কেমন, মা?"

শান্তি তাহার বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয় সাগ্রহে বলিয়া উঠিত, "হাঁ তাই চলুন।"

পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রতি ব্যক্তি পলে পলে নিজেরও অজ্ঞাতে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যখন সময়-সিন্ধুর ঘাত-প্রতিঘাতে মৃদু তালে সম্পন্ন না হইয়া প্রতিঘাতের নির্ম্মম আঘাতের দ্বারা এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া যায়, তখনই শুধু লোকে সহজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্যামাকান্ত চৌধুরীর উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া যেন সম্পূর্ণ একটি নূতন মানুষে পরিণত করিয়াছিল! আজ আর সে বিষয়-তৃষ্ণা নাই, সে ঈশ্বর-প্রীতিও নাই। ক্লান্ত-চিত্ত সংসার-সুখানুসন্ধিৎসু করুণার্হ বৃদ্ধ তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ের বিলুপ্ত তৃষ্ণা লইয়া হাহাকার করিতেছেন। রজনীনাথের কন্যা আজ তাঁহার সেই স্নেহ-বিক্ষুব্ধ চিত্তের সমস্ত সুষুপ্ত আগ্রহকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা যখন রজনীনাথ তাঁহার মক্কেল-বেষ্টিত হইয়া আইন-চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন এই তিনটি প্রাণীতে মিলিয়া তাহাদের সবটুকু অভিজ্ঞতা খরচ করিয়া সন্ধ্যাকে মধুরতর করিয়া তুলিত। বাঘের গল্পে, শিয়ালের গল্পে, রাখালের গল্পে তাহাদের আসরটি গম-গম করিতে থাকিত; প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন উৎসারিত কলহাস্য, পোষা পাখীর বুলির মত মিষ্ট কথাগুলি সংসার তাপ-জর্জ্জরিত বৃদ্ধের মসীমলিন চিত্ত হইতে সমস্ত কালীর রেখা যেন মুছাইয়া দিত। তাহাদের সহিত তিনি যে হাসি হাসিতেন, তাহা সত্যই তাঁহার সেই শুষ্ক হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিত; তাহার মধ্যে কোথাও একটু বিষাদের সুর ঝঙ্কার দিত না! বাস্তবিক বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত তাঁহার মোকদ্দমার দিন কয়টা বড় আনন্দেই যাপন করিতেছিলেন।

মেঘমুক্ত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পাটিপাতা বিছানায় বসিয়া তিনটি বন্ধুতে গল্প চলিতেছিল। তখন তাহাদের রাখালের গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাখাল তখন রাক্ষসী বধূর কাপড় গহনায় সজ্জিতা হইয়া ঘোমটা টানিয়া বধূ-বেশে নিমন্ত্রিতদিগকে পরিবেশন করিতেছিল। বহুবার শ্রুত হইলেও গল্পটি সুপ্রকাশ রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল। গল্প শেষ হইলে আনন্দে করতালি দিয়া সে হাসিয়া উঠিল, "কেমন মজা হলো; বুড়ি খুব জব্দ হয়ে গেছে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "জান, জ্যেঠামশায়! সুকু ভাবে গল্পগুলো যেন সত্যি। তাই রাখালের মত পিঠে-গাছ করবার জন্য ও মাটিতে একটা পিটে পুঁতে তাতে রোজ জল দিত।"

শ্যামাকান্ত হাসিলেন। সুপ্রকাশ ঈষৎ অপ্রতিভ হইল, কিন্তু

হাস্যাস্পদ হওয়ায় একটু রাগিয়াও গেল, বড় বড় চোখ বিস্তৃত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ তুমি বুঝি সত্যি ভাব না? হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে মরে গেল, তুমি কাঁদোনি? মা বল্লেন, গল্প শুনে কাঁদ্‌তে নেই, তবু তুমি বুঝি চুপ করে ছিলে?"

শান্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আহা রুহিদাস যে মরে গেছলো, মানুষ মরে গেলে কান্না পাবেনা, জ্যেঠামশায়? তখন ত জানিনা যে, সে আবার বাঁচবে।"

শ্যামাকান্ত বালিসের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় শান্তির মুখের দিকে চাহিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "মা, পরের জন্য কাঁদতে শেখো, সংসারে পরের কথা ভাবতে সবাই শেখে না।"

তিনি একটি সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "সুকু—জানো জ্যেঠামশায়, ছোট বেলায় চাঁদ ধরবার জন্য কাঁদ্‌তো; চাঁদকে আয় আয় বলে হাত নেড়ে ডাক্‌তো; আর চাঁদ যেই আসতো না, অমনি ও কেঁদে রেগে ভুঁয়ে শুয়ে পড়তো। ছোট বেলায় সুকু বড্ড বোকা ছিল; মাটির হাতীর মুণ্ডু ভেঙ্গে খেয়েছিল, তাই বাবা ওকে মাটির পুতুল দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কানাই কম্বল মুড়ি দিয়ে জুজুবুড়ি সেজে ওকে ভয় দেখাতো, আর ও ভয়ে চুপ করে দুধ খেয়ে নিতো, একটুও কাঁদ্‌তো না; আমি কিন্তু একটুও ভয় পেতাম না। হ্যাঁ জ্যেঠামশায়, জুজুবুড়ি বুঝি আবার থাকে?"

সুপ্রকাশ অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আছে, আছে, জুজুবুড়ি আছে। কল্‌কাতায় নেই—কিন্তু মোক্ষদার দেশে পুকুরে জুজুবুড়ি আছে—"

শান্তি তৎক্ষণাৎ তাহার নির্ব্বোধ ভাইটির ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "আঃ, সেতো জুজুবুড়ি নয়, সেতো জটে বুড়ি। হ্যাঁ জ্যেঠা-মশায়, তুমি জটে বুড়ি দেখেছো? তাদের পায় কি শেকল বাঁধা থাকে? তারা ছেলেদের ধরে সেই শেকলে বেঁধে পুকুরের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়?"

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "না মা, আমি কেবল আকাশবুড়ি দেখেছি; আর আমাদের বাড়ি একজন বুড়ি ঝি আছে, তাকে দেখেছি, তা ছাড়া অন্য কোন বুড়ির সঙ্গে আমার জানা শোনা নাই। আর এই একটি ছোট বুড়িকে এখন দেখছি।"

"আকাশবুড়ি,—যে চাঁদের মধ্যে বসে সূতো কাটে? আমিও দেখেছি, আবার এক একদিন তুলো পিঁজে আকাশময় ছড়িয়ে দেয়। আচ্ছা, ও যে রোজই সূতো তৈরি করে, তা সে সূতোগুলো কি হয়?"

শ্যামাকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কাপড় হয়।"

"কাপড় কারা পরে? দেবতারা বুঝি? আচ্ছা নক্ষত্রগুলো কি চাঁদের ছেলে মেয়ে? তবে সূয্যির কেন নক্ষত্র থাকে না? বাবা বলেন, নক্ষত্রগুলো নাকি এক একটা পৃথিবী, হ্যাঁ জ্যেঠা-মশায়? তা হলে গরুড় চাঁদ থেকে কি করে সুধা চুরি করলে, সেই জন্যেই ত ইন্দ্রর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। আচ্ছা, জ্যেঠামশায়, অশ্বথামা, হনুমান আর বিভীষণ এখন কোথায় আছে, বলনা?"

শ্যামাকান্ত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার প্রশ্ন উঠিল, "হ্যাঁ জ্যেঠা-মশায়, মহাভারতে সাত সমুদ্দুরের কথা আছে, সাত সমুদ্দর

কোথায়? আচ্ছা, ক্ষীর সাগরটা কি সত্যিকারের দুধের ক্ষীর? সেজলে তা হলে জাহাজ চলে কি করে? সেখানকার লোকেরা বুঝি ভাত রাঁধে না, খালি ক্ষীর খায়?"

সুপ্রকাশ মুখ গম্ভীর করিয়া মত প্রকাশ করিল, "আর হয়ত পায়েস খায়, ক্ষীর দিয়ে ভাত রাঁধলেই তো পায়েস হয়ে যাবে! আমি বড় হলে সেই দেশে চাকরী কর্ত্তে যাবো; দিদি, তুমিও ভাই সঙ্গে যাবে, কেমন?"

এমন সময় সহাস্য মুখে রজনীনাথ আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্চে?"

শান্তি ও সুপ্রকাশ সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ বাবা, ক্ষীর সুমুদ্দুর কোন্ দেশে? আমরা দেখবো, বাবা!"

রজনীনাথ হাসিয়া বলিলেন "সে দেশে তোর শ্বশুর থাকে, না রে লতি?"

রজনীনাথ বসিলেন। সুপ্রকাশ পিতার নিকট উঠিয়া আসিল। শান্তি শ্বশুরের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইল। শ্যামাকান্ত চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া রজনীনাথ তাঁহার দিকে চাহিলেন, অল্প আলোকে তাঁহার মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের আজ কিসের গল্প হচ্ছিল? বাঘের, না রাজার?"

শ্যামাকান্ত ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলেন, "আমাদের দর্শন বিজ্ঞান কত কি আলোচনা হয়, তোমার ত আইন ভিন্ন কিছুই জোটেনা। মোদ্দাৎ তোমার কাজটা যত সহজ মনে হত, দেখচি ততটা নয়। বাহির থেকে দেখতে বেশ, কিন্তু খাটতে হয়।"

"সহজ! কি বলেন, অতি কঠিন কাজ, এখন ত এক রকম অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে! ল-ট গুলোও অনেকটা দুরন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, মক্কেলগুলোকেও চিনে ফেলা গেছে, এক রকম জমে এসেছে। প্রথম প্রথম কোর্টের ব্যাপার দেখে, বড় বড় বক্তৃতা শুনে, মহা মহা বাগ্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিম টিম করে দুটো কথা বলতে গিয়ে এক গা ঘেমে উঠতে হত, সে এক দুর্দ্দশার কালই গেছে!"

"প্রথমটা একটু ধৈর্য্য না রাখলে, শেষে সুবিধা হবে, কেন? সেটা সব কাজেই—"

"হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই। আবার একটু উন্নতি হতে আরম্ভ হলে কেমন একটা উৎসাহ জন্মাতে থাকে, ক্রমেই সঙ্কোচ কাটতে আরম্ভ হয়, ঝোঁক পড়ে আসে একটা।"

শান্তি চলিয়া গেলে শ্যামাকান্ত একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন, "রজনী—"

"আজ্ঞা" বলিয়া রজনীনাথ উৎসুক হইয়া রহিলেন। শ্যামাকান্ত কহিলেন, "একটি ভিক্ষা আছে।"

রজনীনাথ চকিতভাবে বাধা দিলেন, জোড় হাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আদেশ করুন, অপরাধী করবেন না! রজনীনাথ তার অন্নদাতার আদেশ যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হবে না।"

"ভাই, অনেক করেছো, আর একটি উপকার কর। শান্তির এখন বিয়ে দিওনা।"

রজনীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শ্যামাকান্ত আবার মৃদু স্বরে কহিলেন, "সে আমার কাছে ফিরে আসবে, এ আশা এখনও আমার

যায় নি। যদি আসে, যদি তাকে ফিরে পাই, তা'হলে তখন তোমার শান্তিকে আমায় দেবে ত ?”

রজনীনাথ স্বভাবতই কোমল-প্রকৃতির লোক! আহতকে এই প্রার্থনার অসঙ্গতি দেখাইয়া পুনরাহত করিতে তাঁহার ক্লেশ ও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “যদি ঈশ্বর সে দিন দেন, তা হলে শান্তি আপনার বৌ হবে,—সে ত ওর ভাগ্যের কথা; এখনও আমি ওর বিয়ের জন্য কিছুই ভাবিনি; শান্তি এখনও তেমন বড় হয়নি ত!”

শ্যামাকান্ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, কিং মুহূর্ত্তেই একটা গভীর হতাশায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। হায়! তাঁহার হারাণ রতন কি আর তিনি খুঁজিয়া পাইবেন ? যদিই বা বনবাসী রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরিয়া আসে, দুর্ভাগ্য, দশরথ তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে ?

৬

যেদিন কলিকাতায় উকিল বাড়ি হইতে শ্যামাকান্ত লক্ষ্মীপুরে ফিরিয়া আসিলেন,সেদিন আবার নূতন করিয়া তিনি যেন পুত্রশোক অনুভব করিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সহিত বৈষয়িক কার্য্যালোচনার পর যখন তিনি তাঁহার জাজিম পাতা বিছানা ছাড়িয়া বাহিরের বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কলিকাতা বাজারের কুমড়ার ফালির মত ক্ষীণ অর্দ্ধচন্দ্র দেখা দিয়াছে। একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ হইতে অজস্র গন্ধ উত্থিত হইয়া চারিধার সুরভিময় করিয়া তুলিয়াছে।

ফুটন্ত ফুলের মত আকাশ-ভরা নক্ষত্রগুলা ঝিকঝিক করিয়া জ্বলিতেছিল।

শ্যামাকান্ত ধীরে ধীরে সোপানের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুষ্পগন্ধ-ভরা সন্ধ্যার বাতাস তাঁহার চিন্তারেখাঙ্কিত ঘর্ম্মাক্ত ললাট স্নিগ্ধ করিয়া দিল, সোপান-পার্শ্বস্থ শেফালি বৃক্ষ হইতে টুপটাপ করিয়া কয়েকটা ফুল বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িল, ক্ষীণ চন্দ্র আর-একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্যামাকান্তের মনে হইল, যেন সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ শান্তির হস্তের, সেই মিষ্ট গন্ধ শান্তির অঙ্গের! তাই সেই মৃদু স্নিগ্ধ স্পর্শ তাঁহার সমস্ত শরীরকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সে আনন্দ মনে মনে বহুক্ষণ অনুভব করিবার লোভে তিনি সেইখানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বাটীর দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অদূরস্থিত নদী আপনার সেই একঘেয়ে কলধ্বনিতে বহিয়া যাইতে লাগিল, কল্পনা-বিহ্বল বৃদ্ধের কর্ণে সেই চিরপরিচিত শব্দ যেন আজ অন্যরূপ শুনাইতেছিল! জাগ্রত-স্বপ্নবিভোরচিত্তে যেন দুইটি প্রীতিকোমল বাহুস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে করিতে তাহার মধুর কণ্ঠের অস্ফুট কলধ্বনিই তিনি শুনিতেছিলেন। সেই আগড়ম-বাগড়ম ছাই-পাঁশ, যাহা তাঁহার মুগ্ধচিত্তে বেদবেদান্ত শ্রুতিস্মৃতির অপেক্ষাও মূল্যবান বলিয়া মনে হইত, সেই সকল শুনিতে শুনিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ কল্পনা-স্বর্গে স্তব্ধ স্থির চিত্তে বসিয়া রহিলেন। একবার হস্তদ্বারা বুকটা চাপিয়া ধরিলেন, যেমন সেই বুকের উপর শান্তির ক্ষুদ্র মুখখানা পূর্ব্বের মত চাপিয়া

ধরিতে গেলেন, অমনই তাঁহার সব স্বপ্ন টুটিয়া গেল, কল্পনার ইন্দ্রজাল ফুরাইল।

শ্যামাকান্ত চমকিয়া চারিদিকে চাহিলেন, কই, কে কোথায়? কেঁহ নাই, কেহ নাই! বাতাসে মাথা দুলাইয়া গাছগুলা যেন বিদ্রূপচ্ছলে হাসিয়া উঠিল, প্রতারক বায়ু যেন তীব্র ব্যঙ্গস্বরে হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'কেহ নাই! কেহ নাই!' ব্যাকুল হইয়া তিনি আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিরণপ্রদীপ্ত পূর্ণচন্দ্র যেন সে কথার পোষকতা করিয়া বলিল, "কেহ নাই, কেহ নাই!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাকান্ত উভয় জানুর মধ্যে অবসন্ন মস্তক রক্ষা করিলেন। সত্য, এত বড় পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার কেহ নাই! এত বড় জগতের মধ্যে তিনি একেবারে একা, অসহায়!

কি লজ্জা! এই সুবিস্তৃত অসীম নীলাকাশ, এই সুবর্ণোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র, এই অগণ্য নক্ষত্র, এই সমুন্নত-শীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী, এই ফুলে ভরা গন্ধামোদিত তরুলতা, এই ইতস্তত-সঞ্চারী গর্বিত পবন, সকলেই তাঁহার দিকে দয়ার্দ্র নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে, সকলেই যেন তাঁহার নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় সঙ্গদান করিতে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতে চাহিতেছে, সকলেই যেন তাঁহার অন্তরের দৈন্য বুঝিয়া ব্যথিত ভাবে সান্ত্বনা বর্ষণ করিতেছে! ওরে নিষ্ঠুর বিনোদ! দেখিয়া যা! তুই তোর বাপের কি শোচনীয় অবস্থা করিয়া গিয়াছিস্, দেখিয়া যা! শুধু তোর জন্য সে আজ জড় প্রকৃতির নিকটও কতখানি দয়ার্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিয়া যা! শুধু তোরই জন্য রে, শুধু তোরই জন্য আজ তার বুকের মধ্যে কি হাহাকার!

সে রাত্রে শ্যামাকান্ত একবারও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; যেমন একটু ঘুম আসে অমনই কোথা হইতে কানের মধ্যে সঙ্গীতের সুরে বাজিয়া উঠে, "জ্যেঠামশায়!" অনেকবার তিনি চমকিয়া, "কেন মা?" বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন, অনেকবার ব্যাকুল নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন, অবশেষে বিছানার মধ্যে থাকা অসহ্য হওয়ায়, উঠিয়া জানালার নিকট আসিয়া কৌচখানার উপর বসিয়া পড়িলেন। জানালার নীচে পুষ্পোদ্যান, তার পর জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল নদীর জল! জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুমন্ত নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া ছোট ডিঙ্গি বাহিয়া ধীবরেরা নিঃশব্দে মাছ ধরিতে চলিয়াছে। তীরে দুই-একখানা বালী-চুণ-বোঝাই-করা মহাজনী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একখানা হইতে এক বিনিদ্র মাঝি শুইয়া শুইয়াই চট্টগ্রামি সুরে গান ধরিয়া দিয়াছে,—ইহা ভিন্ন অন্য কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ ছিল না।

অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রায় অতি শৈশবে চলিয়া গিয়াছে, ইদানীং বহু বৎসর তাহাদের কথা কখনও তিনি আর মনে করিতেন না, সবগুলির মুখও বোধ হয় ভালরূপ মনে নাই! আজ আবার তাহাদিগকে মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যদি আজ একজনও বাঁচিয়া থাকিত! তাহা হইলে, বোধ হয়, তিনি এই স্তব্ধ মধ্য রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া পরের মেয়ের জন্য ব্যাকুল হইতেন না! তাহা হইলে এই শূন্য বুকের মধ্যে একটা ত অবলম্বন থাকিত! মেয়েটী, —যে তিন মাসের হইয়া গিয়াছিল, সেই বিনোদের মত চোখদুটী, শান্তির মত সুন্দর বর্ণ,—সে থাকিলে বোধ হয় ও মুখখানা তাঁহার

বুকের মধ্যে এত জোর করিয়া বসিতে পারিত না! তাহা হইলে হয়ত তিনি তার সেই ছোট-ছোট হাত দুইখানি তেমন করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্বস্তি বোধ করিতেন না! না, না, তাঁহা হইলে পরের মেয়ে শান্তি তাঁহার বুকের মধ্যে এ নূতন যন্ত্রণার আগুন জ্বালিতে পারিত না!

শ্যামাকান্ত জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন। "যখন তাকে ছেড়ে এতদিন বেঁচে আছি, তখন আর কেন? আর কিসের মায়া!"

শ্যামাকান্ত শয্যার উপর পড়িয়া প্রাণপণে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। বুঝি, চাহিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে! কিন্তু এ কি! আবার যে সেই স্বর, সেই কণ্ঠ কাণে বাজিয়া উঠে, "জ্যেঠামশায়!"

শ্যামাকান্তের মুদ্রিত চক্ষের সম্মুখে সেই মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। মায়াবিনী যেন দুই কোমল বাহুদ্বারা, তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখটি আনিয়া বীণাস্বরে ডাকিল, "জ্যেঠামশায়!"

আর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইল না। ত্বরিতবেগে তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হরি, এ কি মায়ায় আমায় বদ্ধ করলে, দয়াময়? মাগো, জগদম্বে, আমায় নিয়ে তুই কি খেলা খেলছিস্ এ, মা!"

তখন প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল না। পাণ্ডু চাঁদ অস্ত যাইতেছিল, নদীর ছায়ানিবিড় বক্ষে একখানা খেয়া নৌকা আরোহী লইয়া পারে যাইতেছিল, এবং জোয়ারের মুখে মহাজনী নৌকা কয়খানাও ভাসিয়া চলিয়াছিল।

শ্যামসুন্দরের পুরোহিত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রাতঃস্নান

সমাধা করিয়া নামাবলী অঙ্গে সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মৃদুস্বরে গাহিতেছিলেন,—

"সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে, করি আমি।"

মুগ্ধ ভক্ত শ্যামাকান্ত স্থির কর্ণে দৈববাণীর মত সেই প্রভাত-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা, মা, আমি কে? আমি কি করতে পারি? আমার সাধ্য কি, তারা! তোর খেলা তুইই খেলাচ্চিস, আমি তাই খেলে যাচ্চি।"

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আশে পাশে লুকাইয়া ফিরিতেছিল। মন্দিরের পাষাণ-চত্বর ও প্রশস্ত দালান আলোকাকীর্ণ। দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকে আলোকিত, পুষ্পমাল্যে সুরভিত, ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত নহবতের ইমনকল্যাণ রাগিণীতে পরিপূর্ণ দেবভূমি স্বর্গভূমির মত প্রতীয়মান হইতেছে। দালানের প্রত্যেক খিলানে খিলানে, প্রতি প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে গাত্রে, মন্দিরের দ্বারে দ্বারে বিবিধ বর্ণের পুষ্পমাল্য অল্প অল্প বাতাসে দুলিতেছে। ফুলের গন্ধের সহিত ধুনা-গুগ্‌গুল-মিশ্রিত একটা স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধ উঠিয়া চারিদিকে জন-সমূহের মনে প্রাণে যেন কি এক ভক্তির অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চারিত করিতেছে।

শত শত দর্শনার্থী মন্দিরের মুক্তদ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রতিদিন যাহারা দর্শন করিতে আইসে, তাহারাও নূতন দর্শনার্থীগণের মত আগ্রহান্বিত! কেহই দেবদর্শনে বিলম্ব

করিতে প্রস্তুত নহে। সেজন্য মন্দিরদ্বারে জনতার মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি, সোর-গোল পড়িয়া গেল। দ্বারের একপার্শ্বে একজন প্রৌঢ়ার হাত ধরিয়া একটি রমণী দাঁড়াইয়াছিল। জনতা বাড়িতেছে দেখিয়া তাহারা দ্বারসান্নিধ্য ছাড়িয়া একটু সরিয়া গেল। প্রৌঢ়া দক্ষিণহস্তে সঙ্গিনীর বামহস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ে জনতারণ্য ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড দালানের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, ভিড় কমিলে দেবদর্শন করিবে। আরতি আরম্ভ হইল। রাধাকৃষ্ণের মহিমাময় যুগল মূর্ত্তি ভক্তের আরাধনায় যেন সজীব হইয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি চাহিয়া সুমধুর হাসিতেছিলেন! লোকের ভিড় কমিয়া আসিলে রমণীদ্বয় আবার মন্দিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া গললগ্নবস্ত্রে চৌকাটের উপর মাথা ঠেকাইয়া সুদীর্ঘ প্রণাম করিল। কিন্তু তাহার অল্পবয়স্কা সঙ্গিনী সহসা প্রণাম না করিয়া, বহুক্ষণ পলকহীন নেত্রে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবপ্রতিমার দিকে চাহিয়া দেবপ্রতিমারই মত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। আরতি-প্রদীপ নির্ব্বাপিত! শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলবাদ্য থামিয়াছে। দেবসেবকগণ ব্যস্তভাবে মন্দির পরিষ্কার পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যম করিতেছিল। অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমাল্যবিভূষণের মধ্য হইতে দেবতা সহাস্য করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, আর তাঁহার দ্বারে মলিনবসনা গম্ভীরবদনা এক রমণী স্থির নেত্র তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। চারিদিকের জয় জয় ধ্বনি ও বন্দনা গানের মধ্যে তাহার ভাষাহীন নীরব প্রার্থনা কোথায় যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর একবারও কম্পিত হয় নাই। তাহার নীরব

কামনা নীরবেই কি সর্ব্বান্তর্যামীর পদতলে পৌঁছাইবে না! এ জগতে এই বয়সেই তাহার সকল সাধ ফুরাইবে? কে জানে!

একে একে মন্দির দালানের আলোক নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। দর্শনার্থীগণ চলিয়া যাইতে লাগিল, দেখিয়া প্রৌঢ়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমণী তবু নড়িল না, তেমনই অঞ্জলিবদ্ধ করে স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল। সঙ্গিনী বলিল, "রাত হলো শিবু, পেরণাম করে নাও মা।"

ধ্যানমগ্না শিবানীর যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল! একবার পূর্ণদৃষ্টিতে যুগলমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে গলায় অঞ্চল দিয়া দেবোদ্দেশে প্রণতা হইল। পূজারি ঠাকুর দুইখানি চন্দনচর্চ্চিত তুলসী-পত্র ও দুইখণ্ড বরফির প্রসাদ তাহাদের হস্তে দিয়া প্রণামী কুড়াইয়া লইলেন। মর্ম্মরমণ্ডিত বহির্চত্বরে তখনও বড় ধুম! সেখানে তখনও আলোক অনির্ব্বাপিত, পুষ্প অম্লান ও কোলাহল অপ্রতিহত। বড় বড় ওস্তাদগণ বাঁয়াতবলায় চাঁটি দিয়া মিঠে কড়া আওয়াজ বাহির করিয়াছেন, বেহালা তানপুরায় সুমধুর ঝঙ্কার ফুটিয়াছে এবং সুশিক্ষিত কোমল কণ্ঠ হইতে "নন্দকি নন্দন যশোদা-কুয়ঁার, বংশীবটতটচারী" গান উঠিয়াছে। রমণীদ্বয় পাশ কাটাইয়া বাহিরে আসিল।

পথে কেহ কোন কথা কহিল না। বৃন্দাবনের রাজপথ তখনও জনাকীর্ণ। উভয় পার্শ্বস্থ ঠাকুরবাড়ির মধ্যে কয়েকটিতে আরতির বাদ্য তখনও থামে নাই। কোথাও সংকীর্ত্তনের করতালধ্বনির সহিত বহুকণ্ঠমিলিত গান, দূর হইতে বায়ুস্রোতের মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও পানোল্লসিত মাতালের চাৎকার পথিকদিগকে সহসা চকিত করিয়া তুলিতেছে।

পোষ্যপুত্র

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

প্রণীত

মূল্য এক টাকা চারি আনা

বড় রাস্তা ছাড়াইয়া একটি গলির মধ্যে মাতঙ্গিনী ও শিবানীর কাছাকাছি বাসা। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে গলির খানিকদূর পর্য্যন্ত একধারের বাড়িগুলির ছায়া পড়িয়াছিল। রুদ্ধদ্বার কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন বাড়িগুলা অপরিস্ফুট ক্ষীণ আলোকে যেন পর্ব্বত-শ্রেণীর মত দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও যেন মনুষ্য-বাসের চিহ্ন নাই! সব নিস্তব্ধ! মাতঙ্গিনী শিবানীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া আপনার ঘরে গেল।

নীচের ঘরে মার কাছে খোকা ঘুমাইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী নিকটে বসিয়া গরমের জন্য পাখার বাতাস দিতেছিলেন। শিবানী গৃহে ফিরিয়া সন্তর্পণে শিশুকে কোলে তুলিয়া উপরে লইয়া গেল। তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া পুনরায় নীচে আসিল, সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "দুটো মুড়ি নিয়ে খা না, গাছের বেশ ঝাল লঙ্কা আছে।"

শিবানী মায়ের মসারিটা বাতাস দিয়া ফেলিতে ফেলিতে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, "না, মা।"

"ঐ ত তোর রোগ, ঐ জন্যই তো রাগ ধরে! দুটো মুড়ি তেল নুন মেখে নে, আলাসনি বাপু, কথা শোন্।"

শিবানী কথা কহিল না, কেবল ঘাড় নাড়িল, "না"।

সিদ্ধেশ্বরী কন্যার অবাধ্যতায় রাগিয়া গেলেন, কিন্তু এখন রাগ হইলেও সময়-বিশেষে তিনি একটু আত্মসংযম করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, বলিলেন, "নিত্যি নিত্যি রাত-উপোসি থাকিস নি; কচি ছেলের মা, এতে ছেলের অকল্যাণ হয়। লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন্।"

শিবানী এরূপ বিষয়ে সাধারণতঃ মাতার আজ্ঞা পালন করে

না। কিন্তু আজ সে তাঁহার অনুরোধ অবজ্ঞা করিল না। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অগত্যা ক্ষুদ্র কুশের ডালায় আহার্য্য লইয়া বলিল, "উপরে যাই, খোকা যদি উঠে কাঁদে!"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "তা যা, কিন্তু মুড়ি কটা খেয়ে ফেলিস, ফেলে রাখিস্‌নে।"

ক্ষুদ্র কক্ষের একপার্শ্বে ক্ষুদ্র শিশু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। একপার্শ্বে মৃণ্ময় প্রদীপ তৈল ও সলিতা অভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ। শিবানী ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে শিশুর নিকটে গেল! তাহার সুপ্ত স্থির মুখের দিকে কিছুক্ষণ উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিল!

নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপের ক্ষীণ প্রাণটুকু বারকয়েক শেষ ঔজ্জ্বল্য দেখাইয়া ধীরে ধীরে অনন্তকালের মত অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। শিবানী দাঁড়াইয়া শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দীপের অকাল-মৃত্যু দর্শন করিল, বাধা দিল না, রক্ষা করিল না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার শেষ অগ্নিকণিকাটি অদৃশ্য হইয়া গেল, ততক্ষণ সে আপনার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল পলকহীন দৃষ্টি তাহার প্রতি স্থাপিত করিয়া রাখিল। ক্ষুদ্র জানালা খোলাই ছিল। তাহার মধ্য দিয়া ক্ষীণজ্যোৎস্না ও মৃদু বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। জানালার নিকট আসিতেই নদীতীরস্থ অশোক গাছের পুষ্প-খচিত একটা শাখা নাড়া দিয়া সুরভি ছড়াইয়া বাতাস ছুটিয়া আসিল। বাতাসে আন্দোলিত শাখা হইতে কয়েকটা শুষ্ক পত্র সর সর করিয়া খসিয়া পড়িল। যমুনার স্থির জলে নক্ষত্রের ছায়াগুলা একটু কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

মুড়ির ডালাখানা ঘরের মেঝের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া অঞ্চলে

স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া শিবানী জানালার নিকট বসিল। এমন সে প্রতিদিন বসিত। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে অন্ধকার, নদী-বক্ষে অন্ধকার, ওপারে অন্ধকার আরও নিবিড়তর। ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী সেই সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারের মত সুদূরবিস্তৃত! দুই একটা তালগাছ সেই বৃক্ষপ্রাকারের মধ্য হইতে তাহাদের অন্ধকারময় সুদীর্ঘ মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহাদের দিকে চাহিলে মনে হয়, তাহারা বুঝি কোন্ প্রেতলোকের প্রাণী, বুঝি ঐ অন্ধকার রাজ্যের অন্ধতমসাবৃত দুর্গের অজেয় প্রহরী!

প্রখর গ্রীষ্মতাপে ইংরাজ রাজ্যের খালের কৃপায় চঞ্চল-গতি শালিনী নির্ম্মলসলিলা যমুনা শুখাইয়া গিয়াছে। তাহার যৌবন মাধুরী, ললিত-দেহলতা যেন বার্দ্ধক্যের অবসাদময় জরায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন আর সে স্বচ্ছ-শীতলা কূলে-কূলে-ভরা উথলিত-হাস্যময়ী কৌতুকময়ী নবীনা মূর্ত্তি নাই। যৌবনের সে লীলা-চঞ্চল গতি, অবিরাম কল কল হাস্যস্রোত, সে অকারণে হাসিয়া হাসিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া বৃন্দাবনের তটে লুটাপুটি খাওয়া,—সে সব এখন গিয়াছে। এখন জীর্ণাঙ্গী সশঙ্কিতা চিন্তামগ্না প্রবীণা উভয় বালুকাতীরের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে দূরের জলরেখা স্থানে স্থানে নক্ষত্র-ছায়ালোকপাতে ঈষন্মাত্র উজ্জ্বল, মৃদুমন্দ পবনে ঈষন্মাত্র স্পন্দিত, নতুবা নদীর বালুতীর হইতে পরপারে লতাগুল্ম-সমাকীর্ণ ঘন শাখাপল্লব-সমাবৃত বনাকীর্ণ তটপ্রান্ত অবধি যেন একখানা কৃষ্ণবর্ণ কাপড় বিছানো আছে বলিয়া মনে হইত। শিবানী সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণ জ্যোৎস্না তখন ডুবিয়া গিয়াছে। যে মেঘখানা এতক্ষণ ঈশানের এক কোণে পড়িয়াছিল, সে এবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া প্রায় অর্দ্ধ আকাশ জুড়িয়া বসিল। জরীর কাজ করা আঙ্গিয়া ও নীলাম্বরী সাড়ি পরিলে কৃষ্ণাঙ্গিনীকে যেমন মানায়, প্রকৃতি ঠাকুরাণীকেও তেমন দেখাইতেছিল। গ্রীষ্মের মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসটুকু এতক্ষণ রহিয়া রহিয়া থামিয়া থামিয়া, যেন মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত অত্যন্ত ধীরে ধীরে, মধ্যে মধ্যে বহিতেছিল। এখন সহসা সেটুকুও থামিয়া যাওয়ায় দারুণ গুমট হইয়া উঠিল।

শিবানী বসিয়া রহিল। এই যে চারিদিকে বিরাট বিশ্বব্যাপী গাঢ় অন্ধকার, ইহার কি কোথাও সীমা পাওয়া যায় না? এই যে আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, দ্যুলোকে, ভূলোকে, ভাষাহীন, শব্দহীন, অনন্ত নীরবতা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহার কি শেষ নাই?

অন্ধকার! তাহার প্রাণের মধ্যে ইহার অপেক্ষা কি অল্প অন্ধকার? ঐ ত ও পারের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দুইএকটা জোনাকি থাকিয়া থাকিয়া সুন্দরী রমণীর কৃষ্ণকেশের মধ্যে হীরার ফুলের মত ঝকঝক করিয়া উঠিতেছে। ঐ ত আকাশের একটি প্রান্তে এখনও দুইএকটি নক্ষত্র চলন্ত মেঘের অন্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে চিকমিক করিতেছে! কিন্তু ঐটুকু ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত, ঐটুকু ক্ষুদ্র জোনাকির মত সামান্য আলোক-রশ্মিও যে তাহার এ আশাহীন সান্ত্বনাহীন অন্ধকার হৃদয়-প্রান্তে স্থান পায় না। তাই সে নিজের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া বাহিরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের পানে চাহিয়া থাকিতে ভালবাসে! এ ক্ষণিক অন্ধকার তাহার অসীম অনন্ত

অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যায়। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিয়া তাহাদের যথা-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিয়া যায়, কিন্তু তাহার অন্তরে যে কালরাত্রি আসিয়াছে, তাহা আর বুঝি পোহাইল না! কবে পোহাইবে? এ জীবনে কখন কি পোহাইবে না? শূন্য গৃহে গভীর নীরবতার মধ্যে শিবানীর কণ্ঠ আর্ত্তভাবে জাগিয়া উঠিল,—ক্ষুদ্র ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণে সে স্বর ছুটিয়া আসিল, প্রতিধ্বনিত হইল, "যাই"! এই বিপুল অন্ধকার এই দুর্দ্দান্ত দানবের পিশাচ নৃত্য, এই প্রকৃতির ভীষণ সংহার-মূর্ত্তির মাঝখানে অসহায়া পরিত্যক্তা বালিকার পথ কৈ? কোন্ পথ ধরিয়া সে যাইবে? কোথায় তাহার স্থান, যেখানে এই এমন রাত্রি ভিন্ন যাওয়া যায় না? সে সরিয়া আসিল। জানালার নিকট আর গেল না, ঘরের মেঝেয় দুই হাত ভূমে রাখিয়া সে বসিয়া রহিল।

তাহার নিবিড়-কৃষ্ণ চোখের পাতার মধ্য হইতে, ঘন কালো চোখের তারা দুইটার মধ্য হইতে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল! বুকখানা ঐ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত যমুনা-বক্ষেরই মত নীরবে ফুলিতেছিল। বাহিরে অন্ধকারের সীমা ছিল না! যেন সমুদয় একাকার করিয়া, চন্দ্র সূর্য্য ডুবাইয়া দিয়া, অভেদ্য অচ্ছেদ্য ভীম অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডটাকে আপনার বিরাট গহ্বরের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছে। এই মহাসমাধির মধ্যে সে যেন একা জাগিয়া আছে, একা বাঁচিয়া আছে, আর এ জগতের কোথাও কোন প্রাণীটি নাই! সে যেন কাহার একটি ব্যগ্র আহ্বান শুনিবার আশায় শুধু এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে তাহার উৎসুক চিত্ত-ভার বহিয়া মরণ-নদীর উপকূলে প্রতীক্ষা করিতেছে! আহ্বান

আসিলেই সে যেন সেই অনির্দ্দিষ্ট পথে এই ভীমা রজনীর বক্ষ ভেদ করিয়া যাত্রা করিবে! সে মহা-যাত্রারও যে কোথায় শেষ, কে বলিতে পারে?

সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল! হস্ত দ্বারা চক্ষের উপর হইতে বিদ্যুতালোক নিবারণ করিয়া সে একটু মুখ ফিরাইল। পরপারে স্তব্ধ বিটপীর মধ্যে তালবৃক্ষশ্রেণী এতক্ষণ নিশ্চল নীরব ছিল, এক্ষণে যেমন কোথা হইতে দুরন্ত শিশুর মত উন্মত্ত পবন চট্‌পট্‌ শব্দে লতাগুল্ম ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনই তাহারাও যেন ঘোর অট্টরোলের সহিত তাহাদের ঝাঁকড়া-চুলে-ভরা প্রকাণ্ড মাথা নাড়িয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সেই বিরাট উৎসবে জল স্থল দ্যুলোক-ভূলোক এককালে শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর অকাল-জাগরিতা প্রকৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া আকাশ পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিয়া উন্মত্ত পবনের বিকট তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। যমুনার স্থির স্পন্দন-রহিত মূর্চ্ছিত তরঙ্গ সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাশ্রিত নীড়স্থ নিশ্চিন্ত পাখীর দল আকস্মিক বিপৎপাতে ভীত বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ঘরে হু-হু শব্দে বাতাস প্রবেশ করিতে লাগিল। বালি উড়িয়া আসিয়া শিবানীর মাথা মুখ চোখ ভরাইয়া দিল, তথাপি শিবানীর যেন উঠিবার শক্তি ছিল না। এই রাত্রি, এই অন্ধকার-ঘন দুর্য্যোগ রাত্রি, এখন ত জগতের কোথাও কোন একটি প্রাণী জাগিয়া নাই, এখনও কি সে তাহাদের ঐ জীর্ণ ক্ষুদ্র দ্বারটীতে একটি পরিচিত ব্যগ্র করের আঘাতের সহিত পরিচিত

ব্যগ্র কণ্ঠের আহ্বান শুনিতে পাইবে না! আজ ত কোথাও কোন ফাঁক নাই! কাণায় কাণায় সব পূর্ণ, সব প্রচুর, সব নিবিড়, শিবানীর হৃদয়ও আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, আজ কোথাও কোন বাধা নাই, এই অন্ধকারে, এই সীমা-হীন সন্ধি হীন অনন্ত অন্ধকারে আজ ত কেহ কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবে না! বায়ুর এই ক্রোধ-হুঙ্কারের মধ্যে ত কেহ কাহারও গভীর দীর্ঘশ্বাসটি শুনিতে পাইবে না! অদম্য অশ্রুজল গোপনই রহিবে,—তবে কেন আজ এই ঘোর অমার মধ্যে, তাহার সেই জ্যোৎস্না যামিনীর দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে না?

বাতাস ক্রমে তাহার উন্মত্ততা বাড়াইয়া তুলিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বন্য জন্তুর মত গভীর চীৎকার করিয়া এ পারে ও পারে জলের উপর দিয়া, বৃক্ষ-লতার মধ্য দিয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। যমুনা সেই উন্মত্ত চরণস্পর্শে ক্রুদ্ধ রোষে ফুলিতে লাগিল। অন্ধকার প্রকৃতির দীনতা দেখাইয়া আকাশের বুক চিরিয়া নূতন ইস্পাতের ছুরির মত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! কড়্‌ কড়্ শব্দে আবার জল স্থল কম্পিত করিয়া মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। ঐ না কে ডাকিতেছে, "শিবানী, দ্বার খোল"! ঐ না কাহার ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শুনা যায়! শিবানী চমকিয়া উঠিয়া পড়িল! ব্যগ্রকণ্ঠে আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "যাই"! বলিয়াই সে আপনার কণ্ঠস্বরে আপনি যেন শিহরিয়া উঠিল। কৈ, কোথায় আহ্বান! কেহ ত নাই!

শিবানী স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। যে দিন সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে নীরদকুমার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইতে চলিল। সে রাত্রের

বিদায়ের পর এ পর্য্যন্ত আর তাহার কোন সংবাদই নাই। সংবাদ পাইবার উপায়ও নাই। তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্মভূমি কোথায়, বা তাহার কেহ আছে কি না, সে সংবাদ সে কিছুই জানে না। সেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া সে কেবল ভাবিতেছিল, "চলে গেলে, কেমন করে মনে করলে সত্যই আমি তোমায় ঘৃণা করি? যখন এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে, তখন রাক্ষসীর বুকে কেন একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেলে না? সকলে তোমার কুৎসা করে, সেই প্রাণের জ্বালায় যে আমি রাগ করে ও কথা বলেছিলাম, কেন, তুমি তা বুঝলে না? ওগো, তুমি ফিরে এসো, একবার মাত্র এসে শুনে যাও, আমি তোমায় ঘৃণা করি না। একবার এসে দেখে যাও, আমার কি দশা করে গেছ!"

সহসা বিপুলনাদে বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। নিবিড় কৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশখানাকে দুই অংশে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় বাড়িল। শিবানী সহসা সুগভীর চিন্তা হইতে ধ্যান-ভঙ্গে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ভয়ানক দুর্য্যোগ চলিল। বৃষ্টি কিম্বা ঝড় একেবারে থামিল না। সমস্ত রাত্রি শিবানী তাহার উৎকণ্ঠিত কর্ণ স্থির করিয়া সেই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে একা জাগিয়া বসিয়া রহিল। ঝড়ের বেগে জীর্ণ দ্বার নড়িতে থাকে, অমনই সে চমকিয়া উঠে! বাতাস থাকিয়া-থাকিয়া আর্ত্ত স্বরে কাঁপিয়া উঠে, অমনই সে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়! এমন করিয়াই তাহার এ দীর্ঘ দিবসের প্রতীক্ষাপূর্ণ দিনগুলি কাটিতেছিল, এমন করিয়াই

রাত্রি শেষ হইল। শেষরাত্রে বৃষ্টির শব্দ কমিয়া আসিলে যমুনার বিলাপ-গান ও বাতাসের বিজয়-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অবসন্ন শরীরে সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্লান্তচোখ তাহার অজ্ঞাতসারে কোন সময়ে যে মুদিয়া আসিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পরদিন প্রভাতে শিশুর ক্রন্দনে শিবানীর যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা হইয়াছে, ঝড়-ঝাপটা কাটিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চৈত্রের সূর্য্য পবনান্দোলিত তালগাছগুলার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে অশোক গাছের ফুলে-ভরা ডালগুলা ঝড়ের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যেন সদ্য বিধবার অলঙ্কারহীন হস্তের মত দেখাইতেছে। বৃষ্টির জল তখনও অশ্রুবিন্দুর মত বাতাসের দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ ঝর করিয়া পাতা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। শিবানী উঠিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার বাতব্যথিত পদদ্বয়ে ধুতুরার প্রলেপ লাগাইয়া দাওয়ায় বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন। নিকটে দৌহিত্র বসিয়া একটা কাঠের লাল ঝুমঝুমি দুই হস্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া অপূর্ব্ব ভোজ্যজ্ঞানে ব্যগ্রচিত্তে সেটিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা দেখিতেছিল। না পারিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অনায়ত্ত দ্রব্যটা মাটিতে ঠুকিতেছিল,আবার কিছুক্ষণ পরে দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত সেই লালাসিক্ত কাষ্ঠখণ্ড ভোজনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া তাহাকে আদর করিতেছিলেন, সে-ও অমনই ভোজনব্যাপার স্থগিত রাখিয়া খিল খিল করিয়া

হাসিয়া কত কি অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। শিবানী রান্নাঘরে উনান জ্বালিয়া পুত্রের জন্য দুধ গরম করিতেছিল। দুধের বাটি ও ঝিনুকখানা হাতে করিয়া দুই-পা অগ্রসর হইতেই বাহির হইতে একটা অপূর্ব্বশ্রুত শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "চিঠ্‌ঠি হ্যয়, মায়ি!"

শিবানীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। হাত হইতে গরম দুধের বাটিটা পায়ের উপর পড়িয়া গেল। সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সে একপ্রকার ছুটিয়াই বাহিরে আসিল। সিদ্ধেশ্বরী শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়ে গেলি? হাত পা একটু স্থির করে ত কাজ কর্ম্ম করতে জানিসনে, ফেল্লি কি? দুধটা নাকি? এখন ছেলেটাই বা খায় কি?" সে কথা শিবানীর কানেও পৌঁছিল না! 'চিঠি' শব্দটাই তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার এত বয়সে সে কখন কাহারও নিকট হইতে চিঠি পায় নাই, কেই-বা তাহার আছে! এ চিঠি কি তবে—?

রুদ্ধনিশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি?"

পিয়ন বলিল, "মায়িজি, শিবানী দাসী! শিবানী দাসীর নামে রেজিষ্টারী চিঠি আছে।"

শিবানীর সর্ব্বশরীরে রক্তটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে কম্পিত হস্তে চিঠিখানি লইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমিই শিবানী।"

"মায়ি, এ রেজিষ্টারী চিঠি, এইখানে নাম সহি করে দিতে হোবে।"

শিবানী বামহস্তে চিঠিখানা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে পিয়নের

প্রদত্ত পেন্সিলটা ধরিয়া লিখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কম্পিত হস্তে প্রথম বার-কয়েক লেখা বাধিয়া গেল। তারপর কোন মতে স্বাক্ষর শেষ করিয়া যখন সে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল, তখন তাহার হাত দুইটা এত কাঁপিতেছিল, এবং বুকের মধ্যে চঞ্চল হৃদয়টি এমন জোরে জোরে আঘাত করিতেছিল, যে সে পড়িবার পূর্ব্বে খোলা চিঠিখানা কোলের উপর ফেলিয়া স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর উত্তেজনাটা একটু কমিয়া আসিলে, খামের মধ্য হইতে চিঠি বাহির করিল। লেফাফার মধ্যে একটুকরা চিঠি ও কয়খানা নোট ছিল,—দেখিয়া শিবানীর পাংশু মুখ মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল, চিঠিতে লেখা ছিল,—

"শিবানি! বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিপি মানুষের সাধ্য কি যে খণ্ডন করে? সেদিন আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম, আজ হইতে মনে করিও তুমি বিধবা, আজ বুঝি সেই অভিশাপ ফলিতে চলিল। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া এ পত্র লিখাইতেছি। ভীষণ কলেরা রোগে পড়িয়া আছি। বুঝিতেছি, বাঁচিবার আর আশা নাই। আমার মৃত্যুর পর যখন এ পত্র পাইবে, তখন ঘৃণা করিয়া এ পত্র পড়িবে কিনা জানি না; কিন্তু তখন আমি কাহারও নিকট হয় ত ঘৃণ্য জীবন বহন করিব না, এই শান্তি। টাকা কয়টা তোমার মাকে দিও, তাঁহার নিকট বড় ঋণী আছি, কিছু শোধ করিয়া যাই। ইতি শ্রীনীরদকুমার চৌধুরী।"

শিবানীর শিথিল অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ অনেক ডাকাডাকিতেও কন্যার সাড়াশব্দ

না পাইয়া বাতগ্রস্ত পা টানিয়া টানিয়া বিকৃতমুখে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে বিরক্ত চিত্তে তাহার খোঁজ লইতে আসিলেন।

প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে পুষ্পহীন করবী গাছের কাছে প্রাচীরে ঠেস দিয়া শিবানী বসিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার রাগ বাড়িয়া গেল, বলিলেন, "ওখানে বসে কি ধ্যান কচ্ছিস? এত যে ডাকছি, তা কি কানেও যায় না? ধন্যি মেয়ে যা হোক"—বলিতে বলিতে কন্যার নিকট গিয়া চমকিয়া থামিয়া গেলেন, "চিঠি নাকি? কে লিখেছে, নীরদ বুঝি? ওমা, কথা কোস্‌নে কেন গো? ওমা, কি, হলো গো! ওমা কোথা যাই! ওরে নীরদ বাবারে! ওরে আমার মাণিক রে, ওরে আমি পোড়া কপালি, তোকে কেন বকেছিলুম রে, ওরে একবার আয় রে," ইত্যাদি শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ পাড়া ঝাঁটাইয়া সকলে তাঁহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ব্যাপার জানিবার প্রয়োজন না দেখিয়া তাঁহার কান্নার বিনানি শুনিয়া নীরদকুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিল। অনেকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল, অনেকেই অকৃত্রিম চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, "আহা কি কপাল গো, জামাই ত নয়, যেন সাক্ষাৎ ময়ুর-ছাড়া কার্ত্তিক, স্বভাবটিই বা কি মিষ্টি ছিল! এমন জামাই যে তপস্যায় পায় না গা! আহা বাছা রাগ করে কোথায় গেল, কেই বা যত্ন আর্ত্তি করলে, বিঘোরে প্রাণটা নষ্ট করলে গা! আহাহা!" আবার কেহ বা বলিলেন, "তা আর কেঁদে কি কর্ব্বে বলো শিবুর মা? সে ত তোমার গিয়েইছিল,

পিত্যেশ তো কিছু ছিল না, তবে মেয়েটার মাছ-ভাতটা যা বন্ধ হল; তা এমন কাণ্ড কোথায় হল?" কিছুক্ষণ এমন ক্রন্দনাদির পর কোথা হইতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠিল, "খপরটা দিলে কে? কোথা হতে খপর পেলে?" তখন উচ্চচীৎকার-পরায়ণা সিদ্ধেশ্বরীর হুঁষ হইল, "ওমা তাই ত, তা ত জানি না, চিঠিখানা দেখে আর শিবির রকমে মনটা কেমন হয়ে গেল।"

শুনিয়া সকলেরই দৃষ্টি ভূমি-পতিত পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল একজন পাঠক্ষমা যুবতী সেখানা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল, এবং বলা বাহুল্য যে ইহার পর সিদ্ধেশ্বরীর রোদন প্রায় গগনভেদ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু হুঁসিয়ার মানুষ নোট কয়খানা অঞ্চলে বাঁধিতে ভুলিলেন না। এমন সময় মাতঙ্গিনী আসিয়া তাড়াতাড়ি শিবানীর নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাহার স্পন্দনহীন দেহ স্পর্শ করিয়াই তিনি সিদ্ধেশ্বরীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখী, পরের ছেলের জন্য চেঁচিয়ে মচ্চো, তোমার নিজের মেয়ে যে এ দিকে যায়, মেয়ে বাঁচাতে চাও ত, চুপ কর।"

পরের ছেলের যে কতখানি দরদ তাহা সিদ্ধেশ্বরী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন! তিনি সখীকে দেখিয়া, "ওগো দিদি, নীরদ যে আমার রাগ করে চলে গেছল গো! ওগো বাছা আমার সেই রাগ নিয়েই চলে গেল দিদি", বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পাড়া-পড়সীতে দিনের বেলায় এমন বিপদের দিনে যথেষ্ট আত্মীয়তা দেখাইয়া আপ্যায়িত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা রাত্রের প্রয়োজনে কেহই অগ্রসর হইতে চাহেন না। একা

মাতঙ্গিনী দুইটি শোকার্ত্তা রমণীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর আবার একটি কচি ছেলে আছে। বোসেদের বাড়ির মেজ বধূ শিবানীর সই ছেলেটিকে সমস্ত দিন কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইয়াছে, ভুলাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এখন শাশুড়ির আজ্ঞায় তাহাকে গৃহে ফিরিতে হইবে, ঘুমন্ত শিশুকে মাতঙ্গিনীর নিকট দিয়া সে অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

শিবানী যখন রাত্রে চোখ মেলিল, তখন তাহাদের প্রাঙ্গণস্থ আম্র বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণ চন্দ্র ম্লানমুখে নীলিমার মাঝখানে মিলাইয়া যাইতেছিল।

ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিলেন। চীৎকার করিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া নয়, নাতির ঘুম ভাঙ্গিবে এই ভয়ে তাঁহাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মাতঙ্গিনী ভূমিলুণ্ঠিতা শিবানীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার গায় মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ডাকিতেছিলেন, "শিবু, শিবু, মা, কথা কওনা মা"— শিবানী একবারমাত্র চাহিয়া দেখিল! তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। যন্ত্রণার একটা রুদ্ধ চাপে তাহার প্রাণটা কণ্ঠের কাছ অবধি ঠেলিয়া আসিতেছিল। সে একবার হৃদয়ভার লঘু করিতে চাহিল, কিন্তু কান্না বাহির হইল না। অশ্রুপ্রবাহ দুই চোখের প্রান্তে আসিয়া বাধিয়া গেল। মাতঙ্গিনী তাহার কপালে চোখে জলসিক্ত শীতল হস্ত বুলাইয়া কানের কাছে নত হইয়া ডাকিলেন, "শিবানী, মা"! শিবানী সজোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া ক্লান্তভাবে বলিয়া উঠিল,

"মাগো—" সেই নিশ্বাসের সহিত তাহার বুকের উপরকার পাষাণখানা যেন কতক নড়িয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী খোকার ঝিনুকে করিয়া একটু জল লইয়া তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে প্রদান করিলেন। শিবানী চোখ চাহিল। তখন রাত্রি গভীর এবং ক্রমে চাঁদ ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। অদূরে নদীর চরে শৃগাল ও রাস্তায় কুকুরগুলা ডাকিয়া উঠিল, এবং স্তব্ধরাত্রি কেবলমাত্র একঘেয়ে ঝিল্লির রবে জাগ্রত রহিল। ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর নিদ্রাতুর ক্লান্ত কণ্ঠ মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া এই মাত্র থামিয়া গিয়াছে। শিবানী ডাকিল, "মাসিমা"।

মাতঙ্গিনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "কি মা"? "মাসিমা, আমি বিধবা? তিনি যা বলে গিয়েছিলেন, সেই শাপই ফল্‌লো! এত ব্যাকুল প্রার্থনা, মদনমোহন কেমন করে অগ্রাহ্য করলেন, মাসিমা?"

মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন, "কলিকাল যে মা!" তারপর তিনি ক্ষীণজ্যোৎস্নায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিলেন, পরে সভয়ে ডাকিলেন, "শিবু!"

ধীরভাবে শিবানী উত্তর দিল, "কি মাসিমা?"

মাতঙ্গিনী দেখিতে শুনিতে চালচলনে সকল দিকেই নিতান্ত সাধারণ প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার নিরপত্য শূন্য বুকটার যে বৃত্তি দিয়া তিনি এই ধীর-স্বভাবা ধ্যানপরায়ণা বালিকাকে অনুভব করিতেন, তাহার দ্বারাই তিনি এই অদ্ভুত ধৈর্য্যের মর্ম্ম বুঝিলেন। এতটুকু আশা থাকিতে মানুষ এমন পাষাণে পরিণত হইয়া যাইতে পারে না। তাই একটু ভীত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া

কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একবার প্রাণ খুলে কাঁদনা মা, নীরদ যে আমাদের জন্মের মত ছেড়ে গেছেন, তাঁর মুখখানা মনে করে একবার কাঁদনা মা!" শিবানী মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর কাঁদবো কেন,মাসিমা? যতদিন আমার মনে একবিন্দুও আশা ছিল, কারুকে কি বলতে হয়েছে? মানুষ যত কাঁদতে পারে, তা আমি কেঁদেছি, শুধু প্রার্থনা করেছি, যেন এই শাপ পূর্ণ না হয়! আর কেন? আর কার জন্য কাঁদবো মাসিমা? খোকা আমার মায়ের থাক্; আমি আর কারুকে চাই না, মাসিমা, আমার সব ফুরিয়েছে।" বলিতে বলিতে শিবানীর যে অশ্রু এতক্ষণ রুদ্ধ ছিল, সহসা তাহা বন্যার প্রবাহের মত শত-ধারে উথলিয়া পড়িল। মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, তাহার যন্ত্রণা এতক্ষণে সীমার মধ্যে পৌঁছিয়াছে। তাহাতে বাধা না দিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। সেখানে আলোকের কিছুমাত্র রেখা পড়িলে দেখা যাইত, তাঁহারও চক্ষুও শুষ্ক ছিল না!

কিন্তু শিবানী জানিত না, সে যখন মনে করিতেছিল, তাহার সব ফুরাইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অলক্ষ্যে আবার তাহার জন্য নূতন চিন্তা, নূতন কার্য্য সঞ্চয় হইতেছিল। সে জানে না যে, এখানে কিছু ফুরাইবার নয়, কিছুই ফুরায় না!

পরদিন অতি প্রত্যূষে যখন আলোক-আঁধারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইতেছিল, তখন মাতঙ্গিনী শিবানীর হস্ত ধরিয়া সেই বিস্তৃত বালুকাতীরের মধ্য দিয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও ও পারের গাছ-পালার মধ্যে অন্ধকার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া আছে। কেবল পূর্ব্বদিকের খানিকটা ঈষৎ গোলাপী

আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন সেই আধমুক্ত স্বর্গদ্বারপথে বালিকা উষার গোলাপী শাড়ির চঞ্চল অঞ্চলখানি পৃথিবীর পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তরুণ মূর্ত্তিটি তখনও দেখা যায় নাই।

নদীর চরে চারিদিকে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা জুলী-পথ। অল্প অল্প ভোরের বাতাসে শির কাঁপাইয়া শস্যবৃক্ষগুলি কি যেন বলাবলি করিতেছিল,—বুঝি তাহাদেরই কথা! তাহাদের পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া সদ্যোজাগ্রত কয়েকটা উভচর-প্রাণী ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহাদের অসতর্ক পাদক্ষেপে ঝড়ে-উড়িয়া-আসা পত্রগুলা হঠাৎ চমকিয়া সর সর করিয়া উঠিল। সকাল বেলাকার সেই ডালভাঙ্গা অশোক গাছটার মধ্য হইতে একটা নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিয়া উঠিল, "কু-উ!"

নদীতীরে দাঁড়াইয়া শিবানী বলিল, "মাসিমা, এ নোয়াগাছটা কি খুলে না ফেল্লেই চলে না?" মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন। প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী তাঁহার সে দৃষ্টি দেখিতে না পাইলেও কহিল, "আমার এখন মনে পড়ছে, চিঠিখানাতে এমন কোন প্রমাণ নাই, যাতে স্পষ্ট বুঝায় যে আমি—আমি—।"

যমুনার জলে তপ্ত দেহ ঈষৎ শীতল করিয়া লইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিবানী বলিল, "কেমন করে আনবো মাসীমা, সে কোন্ দেশ! চিঠিখানা সেইখানে পড়ে আছে দেখলুম, কিন্তু খামটা ত দেখতে পেলুম না। জানি, আমার কোন্

আশাই নেই, তবু মাসীমা, ভয় করে, যদি তাঁর অকল্যাণ করে ফেলি!”

ভোরের আলোকে সিক্ত-বসনা মুক্তকেশী নব বিধবা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

যেদিন শ্রাবণের অবিশ্রাম ধারাবর্ষণের মধ্যে ঘনঘটার ঘোর আবির্ভাবের ভিতর একজন গৃহহারা শ্রান্ত পথিক আসিয়া তাহাদের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া বলিল, “কে আছ গো, আমায় এ রাত্রের মত আশ্রয় দাও,” সেদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি ছিলেন না, মাতঙ্গিনীর সহিত মথুরায় ঝুলন দেখিতে গিয়াছিলেন। বালিকা শিবানী প্রতিবেশিনী কৈবর্ত্ত-কন্যা হারাণের মার সহিত বাড়ির ভিতর একাকিনী। সে দেখিল পথিকের জামা কাপড় সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। নিংড়াইলে জল পড়ে। সে তাঁহাকে মায়ের একখানা থান আনিয়া দিল এবং হারাণের মা উপর হইতে কর্ত্রীর বিছানাটা আনিয়া নীচের ঘরে তক্তাপোষে পাতিয়া দিল। ঘরের গরুর দুধ আনিয়া অতিথিকে খাওয়াইল। ক্লান্ত অতিথি সে রাত্রে নূতন আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অনেক বেলা হইলেও অতিথি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল না। প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেঠ মন্দিরের ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। শিবানী বলিল, “হারাণের মা, দেখ দেখি মানুষটার অন্যায়! মা যদি এখনি এসে পড়েন ত বকুনি খেয়ে আমার প্রাণ যাবে। সকাল বেলা উঠেই ও কেন চলে গেল না?”

হারাণের মা, অতিথিকে বিদায় করিতে যাইতে উদ্যত হইলে শিবানী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না একটু দাঁড়াও, হারাণের মা, লোককে কি অমনি যেতে বলতে আছে? এক বাটি দুধ আর দুখানা বাতাসা নিয়ে যাও। আহা, ভাত দিতে পারলেই বেশ হত, কিন্তু কি করি, মা যদি এসে পড়েন, কাজ নেই।"

হারাণের মা গিয়া দেখিল, অতিথি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে! তাহার মুখ স্ফীত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

হারাণের মা দুধের বাটিটা তাহার নিকট নামাইয়া বলিল, "এই যে তুমি উঠেছ! তা দেখ বাপু, মুখ হাত ধুয়ে দুধটুকু খেয়ে নাও, তার পর যদি ইচ্ছা কর তা হলে এখন ত আপনি আসতে পার।"

অতিথি কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "অনেকক্ষণ হতেই যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আজ আর আমার দাঁড়াবার সাধ্য নাই, আমি যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যদি আজও আমায় অনুগ্রহ করে একটু স্থান দেন—"

হারাণের মা রাগিয়া বলিল, "তুমি ত ভাল লোক বাপু! খেতে পেলে যে শুতে চাও! না না, সে-সব হবে টবে না, গিন্নি যদি এসে পড়ে, তা হলে মেয়েটাকে আস্ত রাখবে না, নিজেও অপমান হবে, তার চেয়ে এই বেলা পথ দেখে নাও।"

অতিথি মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত অধরে কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লইল।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া শিবানী দ্রুতপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিল, তিরস্কার-পূর্ণ স্বরে হারাণের মাকে ডাকিয়া

বলিল, "ছি ছি হারাণের মা, রুগ্ন লোককে কি বিদায় করে দিতে আছে?" পরে প্রস্থানোদ্যত অতিথিকে মিনতির স্বরে কহিল, "না না, আপনি যাবেন না! ওর কথায় কিছু মনে করবেন না; বুড় মানুষ, ওর মাথার ঠিক নেই।"

অতিথি চমৎকৃত হইয়া বালিকার দিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, মৃদু কণ্ঠে কি যেন একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া পারিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িল। দিন রাত্রের মধ্যে আর একবারও সে চোখ চাহিল না। যদিও অতিথির কণ্ঠ হইতে তাহার বিশেষ চেষ্টাসত্বেও কোন শব্দ বাহির হয় নাই, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরস্থ কৃতজ্ঞতা সে সহজেই অনুভব করিয়াছিল। যদি অন্তরাল হইতে সে এই অসুখের কথাটা না শুনিতে পাইত! তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই হইত! মনে করিতেও যে গা কাঁপিয়া উঠে!

শিবানীর মা আসিয়া যখন পঞ্চমে বাঁধা কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া কন্যাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শিবানীর সজল চক্ষু বারবার তাহার অচেতন অতিথির রোগযাতনা-প্রকটিত মুখের উপর ফিরিতে লাগিল। আহা, সে যদি শুনিতে পায়! যদি বুঝিতে পারে! তাহা হইলে, এ অবস্থায়, তাহার মনে কতখানি আঘাত লাগিবে! মা কেন ইহার অসহায় অবস্থার কথা একটুও ভাবিয়া দেখিতেছেন না!

কিন্তু তখন আর সেই জ্ঞানশূন্য বিকারের রোগীকে বিদায় করিবার উপায় নাই। অগত্যা সিদ্ধেশ্বরী রাগে গরগর করিতে করিতে বোসেদের নূতন জামাইকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন— যদি হাঁসপাতালে পাঠাইবার সে কোন ব্যবস্থা করিতে পারে! শরৎ